পিএইচ.ডি-এর শিরোনাম

ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা

Social Freedom of women in Islam

(পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

জাভেদ আহমাদ

রেজি : ২৫/২০১১-২০১২

রেজি : ৭১/২০১৬-২০১৭ ইং (পুনঃ)

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, পিএইচ.ডি গবেষক জনাব জাভেদ আহমাদ-এর "ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা" শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমি গবেষণাকর্মটি আদ্যান্ত পড়েছি। এটি গবেষকের একটি মৌলিক রচনা। পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ড. মোহাম্মদ ইউছূফ)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

(জাভেদ আহমদ)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি : ২৫/২০১১-২০১২
(রেজি ঃ ৭১/২০১৬-২০১৭ইং (পুনঃ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে, যার একান্ত মেহেরবানীতে গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি, যাঁর আনীত আদর্শ মানুষের জন্য একমাত্র অনুসৃত মাইলফলক। স্মরণ করছি সে সকল মহামানবকে, যাঁরা সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা ছিল মুসলিম নারী-সমাজের প্রতি রাসূল (স)-এর জীবনের বাস্তব নমূনা চরিত বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট উপস্থার করার। এ বিষয়ে স্টাডি করে "ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা" এ শিরোনামে গবেষণার কাজ শুরু করি।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার গবেষণা-কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, যাঁর অধীনে আমি অভিসন্দর্ভটি আরম্ভ করে সম্পন্ন করতে পেরেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. ইউছুফ স্যারকে, যিনি বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে দিক্‌নির্দেশনা দিয়েছেন এবং গবেষণার শেষ মুহূর্তের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। আমার মাঝে কোনো প্রকার অলসতার লক্ষণ দেখতে পেলে তিনি আমাকে সস্নেহে বার বার গবেষণা-কর্মে মনযোগী হওয়ার তাগিদ দিতেন। তাঁর এই আন্তরিক সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞা জানাই আরবী বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা-কর্মে আমাকে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার চলার সাথি ও দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্কের বাঁধন ভাই ড. মোঃ মনিরুজ্জামানকে (সহকারী অধ্যাপক আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) যিনি আমাকে কথায়-কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। স্নেহ ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার মেয়ে ফারিহা, ছেলে ফারহাত ও আরাফাত এবং সহধর্মিণী হাফেজা শামছুন্নাহারকে (প্রভাষক, হাজী বেলায়েত হোসেন ডিগ্রি কলেজ, নারায়ণগঞ্জ), যারা আমাকে বাসায় বসে নিরিবিলি কাজ করার সুযোগ দানের পাশাপাশি গবেষণা কাজের উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিত।

আমার গবেষণা-কর্মে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও আল আরাফাহ লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে আমার সকল সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে গবেষণা-কর্মটির কবুলিয়াতের প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।

গবেষক

সংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ
(আ)	আলাইহিস-সালাম
ইং	ইংরেজী
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
খ্রি. পূ.	খ্রিষ্টপূর্ব
ড.	ডক্টর
তা. বি	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নং	নম্বর
পৃ.	পৃষ্টব্য
(র)	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(রা)	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুম/'আনহুন্না
(স)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
হি.	হিজরী
Adi.	Addition
art.	Article
Ed.	Edited by
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Voluam

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا - অ	ط - ত্ব	..... أ	يَـا - ইয়া
ب - ব	ظ - য	ا .....ا	ىِ - য়ি
ت - ত	ع -	و .....ۓ	يُـى - ইয়ু
ث - ছ	غ - গ	ىُ .....ا	يـو - ইউ
ج - জ	ف - ফ	اَ ..... আ	عَ - অ
ح - হ	ق - ক্ব	اَ - আ	عَـا - আ
خ - খ	ك - ক	اِىْ - ঈ	عِ - ই
د - দ	ل - ল	اُ - উ	عـىْ - ঈ
ذ - জ	م - ম	او - ঊ	عُ - ই
ر - র	ن - ন	و - ওয়া	عُـوْ - উ
ز - য/জ	و - ও	وِىْ - বী, ভী	
س - স	ه - হ	وُ - উ	
ش - শ	ء - ,	وُوْ - ঊ	
ص - স	ى - য়	يَ - ইয়া	
ض - দ/দ্ব	.....া		

ভূমিকা

আদিপিতা হযরত আদম ও আদিমাতা হযরত হাওয়া (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানবজাতির সূত্রপাত ঘটান। ক্রমান্বয়ে পৃথিবীজুড়ে মানবের বিস্তৃতি ঘটে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির এ বংশধারা অব্যাহত থাকবে।

মানবজাতির প্রায় অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। তাদের উভয়েই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নারী কিংবা পুরুষ যে কোনো একজনের অবর্তমানে মানবজীবন সম্পূর্ণরূপে অচল। তাই সভ্যতা রক্ষার জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই গুরুত্ব সমান। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবে তা একান্তই প্রকৃতিগত বিষয়।

নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টাতেই মানবসভ্যতার গতি সচল রয়েছে। পুরুষের জীবনে যেমন পুত্র, স্বামী, বাবা ইত্যাদি অধ্যায় রয়েছে। তেমনি নারীর জীবনে কন্যা, স্ত্রী, মা অধ্যায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে। প্রকৃতিগত কারণে পুরুষরা উপার্জনমুখী আর নারীরা সংসারের ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণকারিণী। সমাজে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্র সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ ও দায়িত্ব-বিভাজনকে সামনে রেখে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো মতবাদই কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনতে পারেনি। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা হচ্ছে। নিকট অতীতের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতবাদ অনুযায়ী ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশের কিছু কিছু দেশ এবং এশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং পেশা ও বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডের পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু দিন দিন ইউরোপীয় মতবাদের ভারসাম্যহীনতা অসমতা ও অসারতা প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তি ও যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে মানবরচিত মতবাদগুলোর অদূরদর্শিতা, ভারসাম্যহীনতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির আর্থিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাজন, আদর্শহীনতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে দেখা দিচ্ছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জরিপ ও প্রতিবেদনে নানামুখী সংকট, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠছে।

সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানবসমাজের প্রধান দুটি অঙ্গ নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। পুরুষরা অনেক সময় ভয়াবহ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলেও নারীকে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিকসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। কখনো-বা দেশ-আচারের যাঁতাকলে, আবার কখনো-বা ধর্মের নামে অধর্মকে চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে পিষ্ট করা হয়েছে।

মাতৃজাতির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘোর অমানিশার কালে দু-চারজন মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁদের কিছু মতবাদও রয়েছে বটে, তবে সেগুলো ছিল সাময়িক চিন্তাধারায় পুষ্ট অদূরদর্শী ব্যবস্থা মাত্র। যেমন স্বামীর মৃত্যুতে বৈধব্য জীবনের যাতনা থেকে বাঁচার জন্য সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি। কেউ আবার নারীকে সীমাহীন উচ্চতার আসনে বসিয়ে দেবী জ্ঞানে পূজা করেছে। আবার কেউ নারীকে ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেমন মযদাক মতবাদী লোকজন নারীকে সবার জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবহারের অধিকারভুক্ত বস্তু যেমন– আগুন, পানি, ঘাস ইত্যাদির মতো আখ্যা দিয়ে ইন্দ্রিয়াসক্তির পূজায় মত্ত হয়ে নারীসম্ভ্রমের চরম লঙ্ঘন ঘটিয়েছিল। তৎকালে প্রাচীন ইরানের মযদাক শাসনাধীন বিশাল অঞ্চলজুড়ে সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বস্তির মারাত্মক অবক্ষয় ঘটে চরম বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমানে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানকে অনেকটা সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার নারীশিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষা, কর্ম, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীতে কোনো ভেদাভেদ না রাখার প্রতি ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে নিয়ে অফিস-আদালতে, শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত রয়েছেন। তবে নারীরা মনে করে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা তাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন পাচ্ছে না। পুরুষদের তুলানায় তাদের মর্যাদা ও মূল্যায়নকে খাটো করে দেখা হয়। তাদেরকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তা ছাড়া তাদের সম্ভ্রম ও সম্মান প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে থাকে। এমনকি তাদের ওপর বর্বর আক্রমণের ঘটনাও ঘটে থাকে। এর সংখ্যা একেবারে কম নয়; বরং প্রতিনিয়ত তা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলছে।

সমাজের এ চরম নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারীরা অনেকটাই অসহায় হয়ে থাকে। জটিল আইনি প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক সংকট, চাকরি থেকে অপসারণ ইত্যাদি নানামুখী সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা অনেক সমস্যার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষাসহ অন্যান্য যোগ্যতায় পুরুষদের সমান কিংবা অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকার পরও তারা নিজেদেরকে অসহায় বোধ করে। বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, মাতৃজাতির সম্ভ্রমহানিতে উন্নত দেশই শীর্ষে অবস্থান করছে। এটি বিশ্বমানবতার জন্য চরম বেদনাদায়ক। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় তাদের গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরে বলেন, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের উন্নতির পথে অন্যতম বাধা হলো তাদের যথাযথ নিরাপত্তার অভাব।

প্রকৃতি যেভাবে চলে, তাকে সেভাবেই চলতে দেয়া উচিত। নদীর গতিরোধ করা, পাহাড় কেটে বসতি নির্মাণ করা, বনভূমি উজাড় করা, বায়ুমণ্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন ইত্যাদি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজের মাধ্যমে আমারা সাময়িক বাহ্য সুবিধা ভোগ করলেও তার পরিণতি হয় আত্মহননের মতো। কারণ, প্রকৃতির প্রতিশোধ বড়ই নিষ্ঠুর। প্রকৃতিকে রোধ করা অসম্ভব। তাই নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে উঠিয়ে দিয়ে যে সভ্যতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে, তাতে শত শত প্রাণ মারা পড়ছে। হাজারো পরিবার অশান্তির আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, এতে নারীরাই আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ভুক্তভোগী নারীরা সমাজে অপদস্থ হয়ে বড় করুণ অবস্থায় একপ্রকার নির্জীব পদার্থের মতো দিনাতিপাত করে থাকে। তাদের প্রতি বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার প্রসারও ঘটছে লজ্জাজনকভাবে। তাই সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা নিরন্তর তাদেরকে নিয়ে ভেবেই চলছেন।

সমাজে নারী ও পুরুষের সঠিক স্থান কী এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃত রূপ কী, তা নির্ধারণ করতে মানব রচিত প্রাচীনকালের মতবাদগুলো যেমন ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক তেমনই ব্যর্থ হয়েছে আধুনিক কালের মতবাদগুলোও। কাজেই, সমাজে নারী ও পুরুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যথার্থ রূপ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আজ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান দিতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই সমাজে নর-নারীর সঠিক স্থান এবং উভয়ের যথার্থ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র ইসলামই নর-নারীর সামাজিক বন্ধনের সঠিক ভিত্তি নিরূপণ করেছে। কেবল ইসলামই নারীকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে। যুগ যুগ ধরে নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীজাতিকে শুধুমাত্র ইসলামই দিতে পেরেছে সার্থক ও সম্মানজনক মুক্তির সন্ধান। কেবলমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করেছে মজলুম নারী সম্প্রদায়ের সঠিক মর্যাদা ও যথার্থ অধিকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আদর্শের মূল ভিত্তিদ্বয় তথা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমাজে নারীজাতির যথার্থ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করা এবং তাদেরকে সুশিক্ষার সঠিক দিক্‌নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমার অভিসন্দর্ভটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর নামকরণ করা হয়েছে “ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা”।

সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটিকে আমি একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ের তিনটি করে পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান

এ পরিচ্ছেদে ইয়াহুদি ধর্মে, খ্রিস্টধর্মে, হিন্দুধর্মে এবং বৌদ্ধধর্মে নারীর বিভিন্ন অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারীর অবস্থান

এ পরিচ্ছেদে জাহেলি যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থান, মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য, মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ সমান, শরিয়তের বিধি-বিধানে নর-নারীর সমতা, বাহ্য দৃষ্টিতে যেসকল ক্ষেত্রে নর-নারীর সাথে তারতম্য দেখা যায় তার একটি বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী স্বাধীনতার মর্ম

এ পরিচ্ছেদে নারী-স্বাধীনতার প্রকারভেদ, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতা, নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার মূল্যায়ন

এ পরিচ্ছেদে ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, নারীদের উচ্চশিক্ষা লাভে ইসলামের দিক নির্দেশনা, নবী করীম (স)-এর যুগে নারীশিক্ষা, সাহাবীদের যুগে নারীশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নারীদের অবদান সংক্রান্ত বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী শিক্ষায় আধুনিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এ পরিচ্ছেদে সহশিক্ষার অবক্ষয় ও তার প্রতিকার, সহাবস্থানের প্রকার, পাশ্চাত্য গবেষণায় প্রাপ্ত সহাবস্থানজনিত সমস্যাবলি, মুসলিম গবেষণায় প্রাপ্ত সহশিক্ষার সমস্যাবলি, সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনাসমূহ সম্পর্কে বিষদ উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও আধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

এ পরিচ্ছেদে নারীর কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা, গৃহের বাইরে নারীর উপার্জন প্রসঙ্গ, ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের মতে নারীর কর্মক্ষেত্র, নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য, নারী পুরুষের ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর স্বাধীনতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে প্রাপ্য অধিকার

এ পরিচ্ছেদে বিবাহের বিধান, নারীর প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা, বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে নারীর বিভিন্ন অধিকার এবং শরিয়ত কর্তৃক পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব করার রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

এ পরিচ্ছেদে স্বামীর নিকট স্ত্রীর তালাক চাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ, নারীর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, পুরুষের একাধিক বিয়েতে বাধা প্রদান, তাওরাতে বর্ণিত একাধিক বিবাহ, ইঞ্জিল কিতাবে একাধিক

বিবাহ, এবং ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তীকালে আরব সমাজে বিদ্যমান একাধিক বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুরুষের একাধিক বিয়েতে ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

এ পরিচ্ছেদে স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান, ইসলামি শরিয়তে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষের হাতে তালাকের ক্ষমতা রাখার কারণ, অবাধ্য নারীর ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত, যেসব পুরুষ স্ত্রীর অবাধ্য তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান এবং খ্রিস্টান সমাজে তালাক নিয়ন্ত্রণ করার একটি চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
নারীর পর্দা, পোশাক, সাজগোজ ও বিনোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : পর্দার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

এ পরিচ্ছেদে পর্দার পরিচয়, নারীর সতর ও বিভিন্ন পর্যায়, হিজাবের উদ্দেশ্য, যে সব মাহরামের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয়, যে সব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করা আবশ্যক এবং যে সকল অবস্থায় পুরুষদের জন্য নারীদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয এতদ সংক্রান্ত বিষদ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ

এ পরিচ্ছেদে মহিলাদের পোশাকের স্বরূপ, মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য, মুসলিম মহিলাদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে ইউরোপীয় কিংবা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ এবং মহিলাদের পোশাক পরিধানে ধর্তব্য বিষয়সমূহ নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর সাজসজ্জা ও বিনোদন

এ পরিচ্ছেদে মহিলাদের জন্য চোখে সুরমা ব্যবহার, ভ্রূ উপড়ানো, কৃত্রিম উপায়ে চেহারার রং পরিবর্তন করা, চোখে রঙিন লেন্স লাগানো, মাথার চুল মুণ্ডন করা এবং নখপালিশ ব্যবহার সংক্রান্ত শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
সমাজ সেবায় মুসলিম নারীর বহুমুখী অবস্থান, দায়িত্ব-কর্তব্য ও অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্নরূপে নারী

এ পরিচ্ছেদে সমাজে বিভিন্নরূপে নারী, কন্যারূপে নারীর মর্যাদা, স্ত্রী বা সহধর্মিনীরূপে নারী, নারী যখন মায়ের ভূমিকা পালন করে তার আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ পরিচ্ছেদে মা-বাবার প্রতি নারীর কর্তব্য, স্বামীর প্রতি কর্তব্য, স্বামীর খেদমতে মহিলা সাহাবীদের দৃষ্টান্ত, সন্তান ধারণ ও লালন-পালনে মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সন্তানের প্রতি মা-বাবার যৌথ দায়িত্ব, আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি নারীর কর্তব্য সংক্রান্ত বিষদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজ সেবায় মুসলিম নারীদের অবদান ও আত্মত্যাগ

এ পরিচ্ছেদে জিহাদে নারীর অবদান, প্রতিরক্ষায় উৎসাহ দান, সমাজের কল্যাণে সত্য প্রকাশ, শাসকদের প্রতি উপদেশ ও পরামর্শ, সামাজিক কল্যাণে নারীর পরামর্শ, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর পরামর্শ দান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সূচি-নির্দেশনা

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান ১৯

ইয়াহুদি ধর্মে নারী ১৯

খ্রিস্টধর্মে নারী ২১

হিন্দুধর্মে নারী ২৪

বৌদ্ধধর্মে নারী ২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারীর অবস্থান ৩০

জাহেলি যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থান ৩৩

মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য ৩৮

মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ সমান ৪০

শরিয়তের বিধি-বিধানে নর-নারীর সমতা ৪৪

বাহ্য দৃষ্টিতে যেসকল ক্ষেত্রে নর-নারীর সাথে তারতম্য দেখা যায় ৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী স্বাধীনতার মর্ম ৫৩

নারী-স্বাধীনতার প্রকারভেদ ৫৩

১. নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ৫৩

২. নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতা ৫৭

৩. নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ৬১

৪. নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ৬৪

৫. নারীর শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা ৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার মূল্যায়ন..৭১

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য **৭২**

নারীদের উচ্চশিক্ষা লাভে ইসলামের দিক নির্দেশনা ৭৬

নবী করীম (স)-এর যুগে নারীশিক্ষা ৭৯

সাহাবীদের যুগে নারীশিক্ষা ৮২

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নারীদের অবদান... ৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী শিক্ষায় আধুনিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৯২

সহশিক্ষার অবক্ষয় ও তার প্রতিকার...৯২

সহাবস্থানের প্রকার...৯৩

পাশ্চাত্য গবেষণায় প্রাপ্ত সহাবস্থানজনিত সমস্যাবলি ৯৮

মুসলিম গবেষণায় প্রাপ্ত সহশিক্ষার সমস্যাবলি..৯৯

সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনাসমূহ...১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও আধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান ১০৫

নারীর কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা ১০৫

গৃহের বাইরে নারীর উপার্জন প্রসঙ্গ..১০৬

ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের মতে নারীর কর্মক্ষেত্র ১০৯

নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য... ১১১

নারী পুরুষের ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য.. ১১১

আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান ১১৮

তৃতীয় অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর স্বাধীনতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে প্রাপ্য অধিকার ১২২

বিবাহের বিধান ১২২

নারীর প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা ১২২

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে নারীর বিভিন্ন অধিকার ১২৩

শরিয়ত কর্তৃক পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব করার রহস্য................ ১৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ১৫২

স্বামীর নিকট স্ত্রীর তালাক চাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ ১৫৬

নারীর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ১৫৮

পুরুষের একাধিক বিয়েতে বাধা প্রদান ১৬২

তাওরাতে বর্ণিত একাধিক বিবাহ ১৬৪

ইঞ্জিল কিতাবে একাধিক বিবাহ ১৬৫

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তীকালে আরব সমাজে বিদ্যমান একাধিক বিবাহ ১৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুরুষের একাধিক বিয়েতে ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি.......... ১৬৮

স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান.. ১৬৮

ইসলামি শরিয়তে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি........... ১৭২

পুরুষের হাতে তালাকের ক্ষমতা রাখার কারণ................................ ১৭৮

অবাধ্য নারীর ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত ১৭৯

যেসব পুরুষ স্ত্রীর অবাধ্য তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান................. ১৮২

খ্রিস্টান সমাজে তালাক নিয়ন্ত্রণ ১৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর পর্দা, পোশাক, সাজগোজ ও বিনোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : পর্দার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ১৯০

পর্দার পরিচয় ১৯০

নারীর সতর ও বিভিন্ন পর্যায় ১৯০

হিজাবের উদ্দেশ্য ১৯৩

যে সব মাহরামের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয় ২০৪

যে সব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করা আবশ্যক ২০৮

যে সকল অবস্থায় পুরুষদের জন্য নারীদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয ২১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ ২২২

মহিলাদের পোশাকের স্বরূপ ২২২

মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য ২২৩

মুসলিম মহিলাদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে ইউরোপীয় কিংবা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ.. ২৩৪

মহিলাদের পোশাক পরিধানে ধর্তব্য বিষয়সমূহ.. ২৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর সাজসজ্জা ও বিনোদন.. ২৩৭

মহিলাদের জন্য চোখে সুরমা ব্যবহার ২৩৮

ভ্রূ উপড়ানো.. ২৩৮

কৃত্রিম উপায়ে চেহারার রং পরিবর্তন করা.. ২৪০

চোখে রঙিন লেন্স লাগানো.. ২৪১

মাথার চুল মুণ্ডন করা ২৪৪

নখপালিশ ব্যবহার ২৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ সেবায় মুসলিম নারীর বহুমুখী অবস্থান, দায়িত্ব-কর্তব্য ও অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্নরূপে নারী ২৫০

সমাজে বিভিন্নরূপে নারী ২৫২

কন্যারূপে নারীর মর্যাদা ২৫২

স্ত্রী বা সহধর্মিনীরূপে নারী...২৫৫

নারী যখন মা ২৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৮১

মা-বাবার প্রতি নারীর কর্তব্য.. ২৮১

স্বামীর প্রতি কর্তব্য ২৮৬

স্বামীর খেদমতে মহিলা সাহাবীদের দৃষ্টান্ত... ২৯১

সন্তান ধারণ ও লালন-পালনে মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য.......................... ২৯১

সন্তানের প্রতি মা-বাবার যৌথ দায়িত্ব ২৯৩

আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ২৯৪

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য ২৯৫

সমাজের প্রতি নারীর কর্তব্য ২৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজ সেবায় মুসলিম নারীদের অবদান ও আত্মত্যাগ ৩০৪

জিহাদে নারীর অবদান...৩০৫

প্রতিরক্ষায় উৎসাহ দান...৩০৮

সমাজের কল্যাণে সত্য প্রকাশ...৩১০

শাসকদের প্রতি উপদেশ ও পরামর্শ ৩১১

সামাজিক কল্যাণে নারীর পরামর্শ... ৩১২

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর পরামর্শ দান ৩১৩

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ৩১৪

সারসংক্ষেপ ৩২৫

গ্রন্থপঞ্জি...৩৩১

এ্যাবস্ট্রাক্ট

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা
Social Freedom of women in Islam

৩৩৭ (তিনশত সায়ত্রিশ) পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ৫ (পাঁচ)টি অধ্যায়, ১৫ (পনের)টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে, এতে যে সমস্ত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

- বিভিন্ন ধর্মে তথা ইয়াহুদি ধর্মে, খ্রিস্টধর্মে, হিন্দুধর্মে, বৌদ্ধধর্মে এবং ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।
- ইসলামে নারী স্বাধীনতার মর্ম এবং নারী-স্বাধীনতার প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার মূল্যায়ন, নারী শিক্ষায় আধুনিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, সহশিক্ষার অবক্ষয় ও তার প্রতিকার, সহাবস্থানের প্রকার বিভিন্ন এবং সমীক্ষার রিপোর্ট তুলে ধরা হয়েছে।
- নারীর কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা, ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের মতে নারীর কর্মক্ষেত্র, নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- নারীর বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে প্রাপ্য অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, পুরুষের একাধিক বিয়েতে ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।
- পর্দার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা, পর্দার পরিচয়, নারীর সতর ও বিভিন্ন পর্যায়, হিজাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।
- মহিলাদের পোশাকের স্বরূপ, মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য, নারীর সাজসজ্জা ও বিনোদনে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্নরূপে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

(জাভেদ আহমাদ)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি : ২৫/২০১১-২০১২
(রেজি ঃ ৭১/২০১৬-২০১৭ (পুনঃ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান

মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ। মানুষকে তিনি প্রকৃতিগতভাবে দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন– নর ও নারী। উভয়ের সম্মিলিত অবদানে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে বিশ্বসভ্যতা। নর ছাড়া যেমন নারী চলতে পারে না, তেমনি নারী ছাড়াও নর চলতে পারে না। একজন আরেকজনের মুখাপেক্ষী। আর এই মুখাপেক্ষিতা মানব-প্রজন্মের ধারাবাহিকতার সুরক্ষা থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমভাবে পরিব্যাপ্ত। একজন আরেকজনের পরিপূরক। এদের কোনো চেষ্টা-সাধনায় কোনো শূন্যতা দেখা দিলে অপরজন তা পূর্ণ করে দেয়। এর পরও পৃথিবীর অনেক সমাজ ও সংস্কৃতিতে নর তথা পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পুরুষরা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। নারীরা পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের দুষ্টচক্রে বন্দি হয়।

আবহমান কাল থেকেই নারীরা সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে পুরুষের প্রধান সহযোগীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সকল সমাজে, সকল ক্ষেত্রে নারী তার যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতিতে উপেক্ষিত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও অধিকার-বঞ্চিত নারীজাতিকে একমাত্র ইসলামি জীবনবিধানই ভারসাম্যপূর্ণ মুক্তি দিয়েছে। নর-নারীর পবিত্র বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় স্বামী-স্ত্রীর স্বর্গীয় বন্ধন। নরনারীর জীবনের অনেক অধ্যায় থাকে বটে। কিন্তু তাদের জীবনের বৈবাহিক বা দাম্পত্য অধ্যায়টিই প্রধান ও সুদীর্ঘ। এক কথায় বলতে গেলে এই দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যেই মানব-মানবীর জীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। তাই মানবজীবনে দাম্পত্য জীবনকে ইহজগতে সকলের কাঙ্ক্ষিত জীবন বললে অত্যুক্তি হবে না। আর এই জীবনের প্রধান দুটি উপাদানের একটি হলো– মানব, যাকে বলা হয় স্বামী। আর অপরটি হলো স্ত্রী। মানব তার এই মানবী সঙ্গীকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গী। এই স্ত্রী কিংবা সহধর্মিণী নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মে বর্ণিত সহধর্মিণীর অবস্থান তুলে ধরা হলো।

ইয়াহুদি ধর্মে নারী

ইয়াহুদি-ধর্মমতে, মানবজাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ) জান্নাতে মহাসুখে জীবনযাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) তাঁকে প্রথমে আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে এমন একটি ফল খাওয়ান, যা খেতে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হন এবং তাঁর ভাগ্যলিপিতে কায়ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হয়।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ’? আদম বললেন, ‘আপনি আমার সঙ্গিনী হিসেবে যে স্ত্রী দিয়েছেন, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই আমি তা খেয়ে ফেলি।’ এরপর আল্লাহ হাওয়াকে বললেন, ‘আমি তোমার গর্ভবেদনা বৃদ্ধি করে দেব। তুমি সন্তান প্রসবকালে বেদনাতে আক্রান্ত হবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে। সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব খাটাবে।’[১]

যদি কোনো যুবতী কোনো পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অধীন হয় এবং এ অবস্থায় কোনো মানত করে অথবা ওষ্ঠনির্গত কোনো বাক্যে ব্রতের দ্বারা আপন প্রাণকে আবদ্ধ করে, অতঃপর স্বামী যদি শুনতে পায় এবং শোনার দিন তাকে কিছু না বলে, তবে সেই মানত বা ব্রত স্থির থাকবে। পক্ষান্তরে যদি শোনার দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে, তবে ঐ মানত বা ব্রত স্থির থাকবে না। কারণ তার স্বামী তা নাকচ করেছে। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্থির রাখতেও পারে অথবা তা নাকচও করে দিতে পারে। যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থানকারিণী কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এ-সকল আজ্ঞা করলেন। ইয়াহুদি-আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয় বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নেই।[২]

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইয়াহুদি-সমাজ এরূপ বিবাহবিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করে থাকে। স্বামী যদি স্ত্রীকে ‘গেট’ বা বিবাহবিচ্ছেদের সনদ না দেয়, তবে ধর্মীয় আইনে বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইয়াহুদি-আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ বৈধ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে এবং সেই বিবাহের ফলে প্রসূত সন্তানগণ বংশানুক্রমে ‘জারজ’ বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। ‘গেট’ তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইয়াহুদিদের বিশ্বাস– এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-কে দিয়েছিলেন।[৩]

ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– “তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে। তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ। তাই নিজেকে লুকাইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কী করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।”

এর অর্থ এই হয় যে, বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হওয়া আদম তথা মানবজাতির পক্ষে অভিশাপ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হলো আদমের স্ত্রী। এ জন্যে ইয়াহুদি-সমাজে স্ত্রীলোক চির লাঞ্ছিতা, জাতীয় অভিশাপ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ। এজন্য পুরুষ সব সময়ই নারীর উপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী। এ অধিকার আদমকে বিবি হাওয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর শাস্তিবিশেষ। যতদিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিন এ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

---

১. ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০), পৃ. ১৭।

২. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৮), পৃ. ২৪।

৩. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, (ঢাকা : আশরাফিয়া বইঘর ১৯৯৫), পৃ. ১৯।

ইয়াহুদি-সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও চাকরানীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করতে পারত। মেয়ে কখনো পিতার সম্পত্তি থেকে মিরাস লাভ করত না। করত কেবল তখন, যখন পিতার কোনো পুত্র সন্তান থাকত না।[৪]

ইয়াহুদি ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদিনা) ফিতুম নামক এক ইয়াহুদি বাদশাহ আইন জারি করেছিল, যে মেয়েকে বিয়ে দেয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার সঙ্গে এক রাতযাপন করতে হবে।[৫]

ইয়াহুদিরা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই অধিকার লাভ করে থাকে যে, তারা স্ত্রীদের হায়েয ও নেফাসের সময় অপবিত্র বলে মনে করে। এ সময় তারা স্ত্রীদের সঙ্গে উঠা-বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা, এমনকি তাদের হাতের তৈরি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম ও অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে।[৬]

ইয়াহুদি-সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে এটা ছিল একপ্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশি ছিল।[৭]

সামাজিক প্রার্থনায় দশ জন পুরুষের উপস্থিতি জরুরি ছিল। নয় জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[৮]

খ্রিস্টধর্মে নারী

নারীকে যতদূর নিচে নামানো সম্ভব ছিল, খ্রিস্টধর্ম তা করেছে। নারীদের সম্পর্কে এ ধর্মের অবস্থান তারতোলিয়ান যাজকের বর্ণনা থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়।

তারতোলিয়ান বলেন, 'নারী হলো মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ পুরুষকে বিস্মৃতকারী।'[৯]

'নারীরা হলো নরকের দরজা। নারীই প্রথমে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছে। নারীর কারণেই আদম পথভ্রষ্ট হয়েছে। নারীর কারণেই মানুষকে মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করতে হয়।'[১০]

১৮০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবনযাপন থেকে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত ছিল না। ফরাসি নাগরিক-আইনে নারী অবিবাহিতা হলে

---

৪. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯।
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৩), পৃ. ৬২।
৬. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মহানবী (স)-এর পরিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, (ঢাকা : ফরদাবাদী মহল ১৯৯৫), পৃ. ৬৫; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, (লাহোর : ইদারায়ে ইসলামিয়া তা. বি.), পৃ. ২৩।
৭. আবদুল খালেক, নারী, (ঢাকা : দ্বীনী পাবলিকেশন্স ১৯৯৯), পৃ. ৮।
৮. নারী, প্রাগুক্ত. পৃ. ৮।
৯. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
১০. Deborah E. Sawyer, Women and Religion in the First Christian Centuries, (New York : Routledge Publishing Company 1996), p.154.

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী, শিশু ও পাগল– এই তিন শ্রেণির মানুষ অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীদের স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়।[১১]

সেন্ট ক্রাইমস্টম বলেন, 'নারী একটি অনিবার্য পাপ এবং জন্মগত দুষ্টু প্ররোচনা। সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যে নারীর মতো ক্ষতিকর আর কিছুই নেই।' সেন্ট টমাস বলেন, 'নারী হচ্ছে বিকৃত পুরুষ।' সেন্ট পল বলেন, 'ঈশ্বরের প্রতি নারী যেমন অনুগত থাকবে, তেমনি অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি।' লুথার বলেন, 'নারী কখনো নিজের প্রভু নয়। ঈশ্বর তার দেহ তৈরি করেছেন পুরুষের জন্য, সন্তান ধারণের জন্য এবং তাদের লালন পালনের জন্য। নারীকে সন্তান প্রসব করতে করতে মরতে দাও। এজন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১২]

খ্রিস্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলের স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, নারীর এক বার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যত বড় অত্যাচারী ও জালিমই হোক না কেন বা স্বামী যত বড় অপরাধী ও পাষণ্ডই হোক না কেন, ঐ স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য এই নরপশু স্বামীর বিবাহবন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের শর্ত এই যে, ঐ পুরুষ ও নারী অবশিষ্ট জীবনে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। এ বিধানটি অযৌক্তিক বিধায় পরবর্তী কালে নব-সভ্য খ্রিস্টানগণ এটা পরিবর্তন করেছেন। এ পরিবর্তিত বিধানটির শর্ত এই যে, স্ত্রী যদি অত্যাচারী ও অপদার্থ স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে। এছাড়া বিচ্ছেদের আর কোনো পথ নেই। ইঞ্জিল গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, নারী মৃত্যুর চেয়েও অধিক তিক্ত ও ঘৃণিত। আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা কখনো নারীর গায়ে হাত লাগাবে না।[১৩]

এজন্য খ্রিস্টজগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রিস্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। এমনকি একে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করতেন না।[১৪]

নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়, "স্ত্রীরা স্বামীদের দাসী।"[১৫]

সাধু অগাস্টিনের মতে, "নারীরা পুরুষদের সাহায্য করতে পারবে না, কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল। সন্তান জন্মদান হলো নারীজাতির সৃষ্টির একমাত্র কারণ।"[১৬]

---

১১. ড. আশ শাইখ মুসতাফা আস্ সিবায়ী, আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন, অনুবাদ : আকরাম ফারুক, ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ১৪-১৫।

১২. নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬।

১৩. মহানবী (স)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; ইসলাম আওর আওরাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

১৪. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; klanser joseph. From jesus to paul. (London : 1994), p. 571-572.

১৫. Women and Religion in the First Christian Centuries, p. 154.

১৬. প্রাগুক্ত।

তারতুলী বলেন, "হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল, তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ-প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছ।"

সেন্ট পল তার একটি পত্রে লিখেন : "নারী পূর্ণ বশ্যতা শিক্ষা করুক। আমি পুরুষদেরকে উপদেশ দেবার কিংবা পুরুষদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নারীকে দিই না। তাকে মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ, প্রথমে আদমকে এবং পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম প্রবঞ্চিত হননি। কিন্তু হাওয়া প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়েন।"

তিনি অপর একটি পত্রে লিখেন- আমার ইচ্ছা এই, তোমরা যেন জানতে পার যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রিস্ট, স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ আর খ্রিস্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে পুরুষ মস্তক আবৃত করিয়া প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। আর যে স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসেনি, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। আর স্ত্রীর জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি, বরং পুরুষের জন্য স্ত্রীর সৃষ্টি হয়েছে।[১৭]

খ্রিস্টান সেন্টদের চোখে মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা। তারা নারীকে শয়তানের খেলার মাঠ বলে অভিহিত করেছে। বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলেন, "পুরুষ তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" নিওপ্লাটনিজমের প্রভাবে নিষ্কাম ভালোবাসার উপর জোর দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের যৌনমিলন এমনকি স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ককেও অশ্লীল ও অপবিত্র জ্ঞান করা হয়। নর-নারীর কৌমার্যই পাদরিদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিষয়। তাদের কাছে বিবাহিত জীবন প্রয়োজনীয় পাপাচার।"

প্রথম যুগের খ্রিস্টধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এসব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করত। তাই খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশি সম্মানার্হ। তারা ঘোষণা করলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা, নারীর সৌন্দর্য হলো বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেন : "নারী এক অনিবার্য আপদ, এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"

পঞ্চম শতাব্দীতে 'মাকোন একাডেমি' এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, নাকি তারও আত্মা আছে? গবেষণা শেষে একাডেমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোনো নারীই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।"

পাশ্চাত্যজগৎ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরিউক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি অমানুষ বলে বিবেচনা করা হবে? অবশেষে স্থির করা হয় যে, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির

---

১৭. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষদের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা! তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। কেননা এ যুগেও নারীকে অধিকারহীনা অবস্থায় থাকতে হয় এবং নিজের সম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হাত দিতে পারত না।[১৮]

বিশ্বকোষ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে

The asceticism of the early Church Fathers specially St. Paul's, affected the status of women for centuries to come .... On the otherhand, women were "at risk", throughout the middle Ages and beyond, to be burnt at the stake at witches. The number of women who fell victims to witch-hunts has been estimated at over 1,00,000.

"প্রাচীনকালের খ্রিস্টান লোকদের, বিশেষ করে সেন্ট পলের কঠোরতা-পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকারকে ভীষণভাবে খর্ব করেছে। মধ্যযুগে এবং তার পরে নারীদেরকে ডাইনি হিসেবে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত দগ্ধ করা হতো। যারা এভাবে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার শিকার হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখেরও উপরে।"[১৯]

হিন্দুধর্মে নারী

ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোনো দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সবসময় বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখানেও নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার জীবন থেকে মুক্তি পায়নি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন-রচয়িতা মুনজার নারী সম্পর্কে বলেন–

"নারী অপ্রাপ্তবয়স্কা, প্রাপ্তবয়স্কা বা বৃদ্ধা– যাই হোক না কেন, স্বাধীন যেন না হয়। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোনো সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।"

ব্রতপালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামীগ্রহণের কথা মুখে আনাও নারীর উচিত নয়; বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া উচিত।

জনৈক ব্রাহ্মণ, যিনি মহারাজ মনুজির মনুস্মৃতিকে বাচালতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের মূলনীতি হিসেবে কার্যকর ছিল, তিনি নারীজাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন–

"আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ, রাজপরিবার ও নারী– এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকতে হবে।"

"বন্ধু, চাকর ও নারীরা দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয়, তখনই তার কাছে ফিরে আসে।"[২০]

---

১৮. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
১৯. বিশ্বকোষ ব্রিটানিকা, ভলিউম-১০, পৃ. ৯১০।
২০. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন, "প্রাচীন বৈদিক সমাজে একজন পুরুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতো তার স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী। ঠিক যেমন গরু অথবা দাস-দাসীর সংখ্যা বেশি হলে কোনো ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।"[২১]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা অস্থিরচিত্তের অধিকারী। তাই পুরুষদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।[২২]

মনু আরো বলেন, "পান করা, খারাপ লোকের সঙ্গে মেশা, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, বেশি ঘুরাফেরা করা, অসময়ে ঘুমানো এবং অন্যের ঘরে থাকা– এই ছয়টি জিনিস নারীকে দূষিত করে থাকে।""[২৩]

এভাবে দেখা যায় মনুসংহিতায় নারীদের অনেক অশ্রদ্ধাপূর্ণ এবং অসম্মানজনক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।

মনুতে আরো বলা হয়, একজন চব্বিশ বছর বয়স্ক পুরুষের উচিত, একজন আট বছর বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করা। বিবাহের সময় বয়সের এই ব্যবধান থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।[২৪] অর্থাৎ বিয়ের সময় মেয়ের বয়স ছেলের বয়সের চেয়ে দ্বিগুণ কম হওয়া আবশ্যক।

নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখরযুক্ত জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মিথ্যা কথা বলা, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, আহমকি, লোভ, অপবিত্রতা এবং নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।

রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের নিকট থেকে মিষ্টভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা যায়।

বিয়ের সময় কন্যাকে স্বর্ণালঙ্কার দেয়া আবশ্যক। যদিও মনুতে বলা হয়, পিতার সামর্থ্য অনুযায়ী কন্যাকে উপহার দিতে হবে। এটি একপ্রকারের স্ত্রীধন এবং স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটি কন্যার প্রতি পিতার ভালোবাসার প্রতীক।[২৫] কিন্তু এর মাধ্যমে যৌতুকপ্রথার বীজ বপন করা হয়, যা পরবর্তী কালে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে কন্যাসন্তান ছিল খুবই অপছন্দনীয়। পিতামাতার মৃত্যু হলে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনা করার দায়িত্ব এবং অধিকার পেত পুত্রসন্তান। তাই কন্যাসন্তান ছিল অপ্রয়োজনীয়। মনুসংহিতায় বলা হয়, যে কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় সে পরিত্যাজ্য।[২৬]

হিন্দুসমাজে প্রচলিত ভাইফোঁটা (ভাইয়ের দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনায় যা পরা হয়), জামাইষষ্ঠী (জামাতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক অনুষ্ঠান) ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সবই পুরুষকেন্দ্রিক। অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন, "এই দেশে মেয়েরা জন্ম থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।"[২৭]

---

২১. Prof. Sukumari Bhattacharji, Women and Society in Ancient India, (Kolkata : Basumati Corporation Ltd.1994), p. 9.
২২. Banarjee, Dr. Manabendu, (eds.) Manushamhita, 1st Edition, (Kolkata : Swadesh Publishing Ltd. 2004), p. 380-381.
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।
২৭. Women and Society in Ancient India. p. 107.

প্রাচীনকালে হিন্দু-পণ্ডিতরা মনে করতেন, মানুষ পারিবারিক জীবন বর্জন না করলে জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হতে পারে না। মনুর বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার অধিকার নারীর নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে চিরবৈধব্যের জীবনযাপন করতে হয়। জীবনে কোনো আনন্দ-আহ্লাদ কিংবা উৎসবে অংশগ্রহণ করা তার জন্য চিরনিষিদ্ধ। মাথা নেড়ে করে, সাদা বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে তাকে জীবনযাপন করতে হয়।

"বিধবা মহিলাদের স্বামীর সম্পত্তির অংশীদারত্বের জন্য তাদেরকে দেবরের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো এবং পুত্র-সন্তানের জন্ম দিতে হতো।"[২৮]

প্রাচীন হিন্দু-ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে– মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প এবং আগুন– এর কোনটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।

যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি অথবা ধনদৌলত লাভের আশায় বলিদান করা হতো। একটি বিশেষ গাছের সামনে এভাবে নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সহমৃত্যুবরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হতো অনেক হিন্দু নারীকে।[২৯]

"হিন্দুধর্মে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে চূড়ান্তভাবে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদেরকে মানুষের কাতারে গণ্যই করা হয় না। পিতামাতার সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তালাকের ব্যাপারে তাদের কোনো অধিকারই দেয়া হয়নি। স্বামী যত বড় জালিম আর পিশাচই হোক না কেন, তার কাছ থেকে পরিত্রাণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর বয়স যত কমই হোক না কেন তার অন্যত্র বিবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই ঐ যুগে কোনো হিন্দু মহিলার স্বামী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলাও আত্মহত্যা করে এরূপ করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করত।"[৩০]

হিন্দু-আইনে নারীর কোনো মূল্য নেই। সে একটা অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। ধর্ম ও শিক্ষায় তার কোনো অধিকার নেই। সে বেদ পাঠ করতে পারে না। এমনকি পূজা-অর্চনা করা কিংবা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপের কাজ।[৩১]

হিন্দুধর্মে নারী-অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাজলে কন্যা নিক্ষেপের বিবরণ আজো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি। সেবাদাসীরূপে নারীত্বের চরম অবমাননার কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। পবিত্র ধর্মের নামে আজো বিধবা ও নারী-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। হিন্দুধর্ম বিধবাকে চিরকালের জন্য তার জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কন্যা-সন্তানকে বলি দিয়েছে, দিয়েছে গঙ্গায় বিসর্জন। কয়েক বছর আগে বিহারের জামশেদপুরের এক পাষণ্ড পিতা দেবীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে টুনমুর নামে তার চার বছরের কন্যাকে বলি দেয়।

---

২৮. A.S. Altekar. The Position of women in Hindu Civilization. (Motilal Banarsidass Publishares Pvt. Ltd. 1959.) p. 250.

২৯. আল মুসতাশার হাসান আল হাফনাভী, মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম, (মিশর : দারুল বাশীর তা. বি), পৃ ১৫; পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।

৩০. গাজী শামছুর রহমান, হিন্দু আইনের ভাষ্য, (ঢাকা : পল্লব পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, মার্চ ১৯৮৯), পৃ. ৯০৮; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪; ইসলাম আওর আওরাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩১. নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরেছে কত অসহায় নারী! এই তো সে দিনের কথা, রাজস্থানের রূপকনোয়ার নামে এক মহিলাকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হলো স্বামীর চিতায়। হিন্দুধর্মে বৈদিক যুগে নারীর অধিকার তুলে ধরে বিশ্বকোষ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে–

In India, subjection was a cardinal principle. Day and night must women be held by their protectors in a state of dependence, says Manu. The rule of inheritance was agnatic, that is descent traced through males to the exclusion of females.

“হিন্দুস্থানে পরাধীনতা ছিল নারীধর্মের মৌলিক তত্ত্ব, নারীজাতির মূল বৈশিষ্ট্য। ভগবান মনু বলছেন– নারীজাতিকে অভিভাবক কর্তৃক সদা-সর্বদা পরনির্ভরশীল করে রাখতে হবে। উত্তরাধিকার আইন ছিল পৈতৃক। অর্থাৎ পুরুষই পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। বংশানুক্রম নারী কর্তৃক নয়, বরং পুরুষ কর্তৃক চিহ্নিত হতো।”[৩২]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বেদবাণীতে নিম্নরূপে নারীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে– বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হতো না। তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকত। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকত না। এজন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টা করত। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিয়ে করত। এজন্যে স্বামীর ভ্রাতার নাম হয়েছিল দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বহু বিবাহ করত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল। ... কন্যা হরণ করেও বীরগণ বিয়ে করত। ... বিধবা হলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করে দেবরের আহ্বানে উঠে আসত ও পতির শবদাহ করত।[৩৩]

নিজের বিয়েতে নারীর অনুমতি দেওয়ার অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজীবনের সম্পর্ক অথচ বিবাহে তাদের সম্মতির দরকার হয় না। না হওয়ার যুক্তি সম্বন্ধে হিন্দু-আইনের সুবিখ্যাত লেখক গোপাল শাস্ত্রী মহাশয় বলেন– ‘মানুষ যখন নিজের পিতা-মাতা বা ভ্রাতা-ভগ্নিকে অথবা অন্য আত্মীয়কে নিজে নির্বাচন করে নিতে পারে না, সে অবস্থায় কেবল স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনের সময় তাকে এ অধিকার দেওয়া হবে কী কারণে? যখন অন্য প্রিয়জন ও নিকট-আত্মীয়দেরকে তার নির্বাচন ব্যতিরেকে মানুষ আপনার করে নিতে পারছে, তখন অন্যের নির্বাচিত স্বামী বা স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই আপনার করে নিতে পারবে।’

হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে তার চিতায় আরোহণে জ্যান্ত জ্বলে পুড়ে মরতে হতো। একেই বলা হতো সতীদাহ প্রথা। সতীত্ব রক্ষার নাম দিয়ে এই প্রথা, গঙ্গাজলে কন্যা নিক্ষেপ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা চালু করে হিন্দুধর্মে নারীত্বের চরম অবমাননা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের চাপে সতীদাহ প্রথার মতো লোমহর্ষক প্রথার উচ্ছেদ হলেও পবিত্র ধর্মের নামে আজো বিধবা ও নারী নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। বিধবা হলে হিন্দু নারীকে আমরণ অমানুষিক কঠোর বৈধব্য প্রথা পালন করতে হয়। তারা কখনও মাছ-মাংস খেতে পারে না। আতপ চাউলের ভাত ও শাক-সবজি খেয়েই আজীবন কাটাতে হয়। ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা কিংবা কোনো

---

৩২. The Encyclopedia Britannica, 11th ed. 1911, Vol, 28, p. 782.
৩৩. In Mace, David and Vera, Marriage : East and West, Dolphin Books, Double day and Co. Inc. N. Y. 1960.

রকম আমোদ-ফুর্তি করারও কোনো অধিকার তাদের থাকে না। এ ধর্মে বিধবার জন্য সুখ ভোগ করা বা দ্বিতীয় বার বিবাহিত হয়ে শয্যাসুখ উপভোগ করা অসম্ভব ব্যাপার। কত হিন্দু বিধবা নারী অল্প বয়স্কা, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুশাস্ত্রের অমানুষিক কঠোর বৈধব্যপ্রথা পালন করতে গিয়ে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কোটি কোটি বিধবা নারী তাদের স্রষ্টার দেওয়া মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। পাক-ভারত বিভাগের সময় হিন্দুসমাজে বিধবার সংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি।

প্রাকৃতিক, বাস্তব ও মানবীয় ধর্মের পরিপন্থী বলে বিধবা-বিবাহ চালু করতে, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রয়োজনবোধে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ভারতীয় বিধান-সভা হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে আইন পাস করলেও বাস্তবে এগুলোর প্রয়োগ ছিল বিরল।

পূর্বেই বলেছি, নারীজাতি শূদ্রানী বলে তাদের বেদপাঠ এবং পূজা-অর্চনা করার কোনো অধিকার নেই। এমনকি স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় শিবলিঙ্গের মতো একটা নিকৃষ্ট জিনিসের পূজা করারও তাদের অধিকার নেই। তবে এ লিঙ্গের পূজা তারা করতে পারে বিধবা হওয়ার পর।

স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় নারীরা শিবলিঙ্গের উপাসনা করতে পারে না। কারণ শাস্ত্র অনুযায়ী স্বামীই তাদের একমাত্র উপাস্য।[৩৪]

বৌদ্ধধর্মে নারী

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারীজাতির জন্য কিছুই করে যাননি। তাদের জন্য কোনো কিছু করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। একদিন যখন বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন, কেন নারীদের সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার দেয়া হবে না? তখন বুদ্ধ বলেন, 'নারীরা অল্পতেই রেগে যায়, নারীরা হিংসুটে, নারীরা বোকা।'[৩৫]

বৌদ্ধধর্ম আরো বলে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নিচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম।"

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্যই গৌতম বুদ্ধ বিয়ে-প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি লোকদের সংসারত্যাগী হওয়ার এবং সন্ন্যাসব্রতের প্রতি আহ্বান করে গেছেন।[৩৬]

---

৩৪. নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৫. Mcguire, Meredith B Religion the Social Context, (Wadsworth Publishing Company. 1997,) p. 126.

৩৬. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী ১৯৯৬), পৃ, ২১-২২; মুফতী আবদুল্লাহ ফারুক, ইসলামে রমণীর মান, (যশোর : আল ফারুক প্রকাশনী ১৯৯৮), পৃ ১৯২০।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westermark) বলেন–

Women are, of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

“মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলো ফাঁদ বিস্তৃত করে রাখা হয়েছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।”[৩৭]

পৃথিবীতে যত ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে, কেউই নারীকে যথাযথ সম্মান-মর্যাদা দেয়নি। তাই যুগে যুগে সহধর্মিণী হিসেবে নারী স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দুধর্মে কোনো নারীর জন্য তার পিতার সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। বিধবা-বিবাহের অনুমতি নেই। জীবদ্দশায় স্বামী-দেবতার সন্তুষ্টিই ছিল সহধর্মিণীর একমাত্র ধর্ম।

ইয়াহুদি-ধর্মমতে আদম বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পেছনে আদমের স্ত্রী হাওয়াই ছিল মূল কারণ। অতএব, চির অভিশপ্ত এ নারীর জন্য ধর্ম-কর্ম এবং ধনসম্পদে কোনো অধিকার নেই।

খ্রিস্ট-ধর্মমতে নারী শয়তানের দরজা। সে আদমকে বিপদগামী করেছে এবং আল্লাহর আইন ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনুচিত। তার সঙ্গে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করা পাপাচার।

বৌদ্ধ-ধর্মমতে পুরুষের জন্য নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারীর সঙ্গে মেলামেশা করা মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থি। সুতরাং তাকে সহধর্মিণীর সঙ্গ থেকে দূরে থেকে সংসারত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করাই উত্তম।

৩৭. Nazhat afza and khurshid Ahmaed. The posistion of women in islam. (kuwait : islamic Book publishers. 1982), p. 12-13.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারীর অবস্থান

ইসলাম নারীর সামাজিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সাধন করে তার স্বভাবজাত অধিকার রক্ষাপূর্বক তাকে উপযুক্ত মর্যাদায় আসীন করেছে। ইসলাম পূর্বকালে নারীর প্রতি যত প্রকারের জুলুম করা হয়েছে, তা সব দূর করে তার ন্যায্য অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক সাহায্য করেছে। ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার স্বাধীনতা দান করেছে। তার জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেছে। সর্বোপরি নারীর সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করেছে।

উম্মাতে মুসলিমা বা মুসলিম জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো রাসূলে করীম (স) ও তাঁর সাহাবীদের যুগ। এর পরে পর্যায়ক্রমে উত্তম যুগ হলো তাবেয়ীদের যুগ, এরপর তাবে-তাবেয়ীদের যুগ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

"আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার ও আমার সাহাবীদের যুগ। এরপর সাহাবীদের অনুসরণকারী তাবেয়ীদের যুগ, এরপর তাবেয়ীদের অনুসরণকারী তাবে-তাবেয়ীদের যুগ।"[৩৮]

রাসূলে করীম (স) বিশ্ববাসীকে হিদায়াত দানের ব্যাপারে সাহাবীদেরকে আকাশের নক্ষত্রমালার সাথে তুলনা করেছেন। রাতের বেলা দিকহারা মরুচারী যেমন নক্ষত্র দেখে পথের দিশা পায়, ঠিক তেমনি পথহারা মানুষও সাহাবীদের অনুসরণ করে সৎপথের সন্ধান পেয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اوحى الله الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضهم فوق بعض ولكل نور.

মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমার সাহাবীরা আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই আলোকপ্রাপ্ত। তবে এদের কেউ কেউ অপরের তুলনায় উজ্জ্বলতর। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও বলেন–

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলেই তোমরা হিদায়াত পেয়ে যাবে।"[৩৯]

তবে সাহাবীদের মধ্যে সর্বোপরি মর্যাদার অধিকারী হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তাঁদেরকে অনুসরণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলে করীম (স) বলেন–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

"তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতের ওপর অধিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করে চলবে।"[৪০]

---

৩৮. ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.), পৃ. ৫১৫।

৩৯. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.), পৃ. ৫৫৪।

৪০. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাত, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.), পৃ. ৬৩৫।

তদানীন্তন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও দেশে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। ধর্মগুলোর প্রকৃত শিক্ষা হয়েছিল বিস্মৃত আর মানব-সমাজের অবস্থা হয়েছিল বিকৃত। ফলে নারী হয়েছিল সহায়হীনা ও অধিকার-বঞ্চিতা। বিশ্বমানবতা তখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত। সর্বত্রই প্রবাহিত হচ্ছিল গোমরাহীর সয়লাব। বিশ্ব সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরণ করলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে মানব-জাতিকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির নিবিড় তিমির থেকে উদ্ধার করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বিশ্বনবীর ওপর নাযিল করলেন সর্বলোকের এবং সর্বকালের পথের দিশারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করল–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا.

"মহান আল্লাহ সঠিক হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠালেন তাঁর রাসূলকে। এ উদ্দেশ্যে যে, প্রচলিত সকল দীনের ওপর তিনি এ দীনকে জয়যুক্ত করবেন। এ ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।"[৪১]

ভ্রান্তি ও গোমরাহির বেড়াজালে আবদ্ধ মানব-জাতিকে জানানো হলো–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ.

মহান আল্লাহ উম্মী সম্প্রদায়ের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠালেন। যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন; তাদেরকে পূত-পবিত্র করে তুলবেন এবং তাদেরকে মহাগ্রন্থ কুরআন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন। যদিও ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।[৪২]

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো (নিজেদের কর্মদোষে) একেবারে জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছেছিলে। তখন তিনি তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি বিশ্লেষণ করে থাকেন, যাতে তোমরা সৎপথের সন্ধান পেতে পার।[৪৩]

প্রফেসর আক্কাদ বলেন, নারী চিরকাল ভুল করে এবং তার শরীর ঘৃণ্য বস্তু– এ দুটি অপবাদ থেকে ইসলাম নারীকে রক্ষা করেছে। শয়তান নারী-পুরুষ দু'জনকেই প্রতারিত করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেদেন।

---

৪১. সূরা আল ফাতহ : ২৮।

৪২. সূরা আল জুমু'আ : ২।

৪৩. সূরা আলে ইমরান : ১০৩।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ.

“শয়তান তাদের দু’জনকে পদস্খলিত করে তাদের আবাস থেকে বের করে দিয়েছে।”[৪৪] শয়তান প্রতারণা করে হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে জান্নাতের আবাস থেকে বের করে দেওয়ার পর উভয়ে নিজ নিজ গুনাহ স্বীকার করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন–

قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

তাঁরা দু’জন বললেন, হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের ওপর অবিচার করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা এবং দয়া না কর, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[৪৫]

হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার বিচ্যুতির জন্য তাদের বংশধররা দায়ী নন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“যে জাতি চলে গেছে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী আর তোমরা তোমাদের কর্মফল পাবে। তোমরা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না।”[৪৬]

আল্লাহ তায়ালা নারীকে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে মর্যাদাবান করেছেন। নারীকে পার্থিব সুখসামগ্রী ভোগ করার অধিকার দিয়ে তার স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন। অপরদিকে পাশবিকতা ও শয়তান নারীর স্থায়ী সঙ্গী– এ অপবাদ থেকেও তাকে মুক্তি দিয়েছেন।[৪৭]

ইসলাম পুরুষকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তি ও সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছে, তেমনি তা নারীকেও দিয়েছে। অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত নারী অন্যের ওপর কর্তৃত্ব ও কারো পক্ষে তদারকি করতে এবং উকিল হতেও বাধা নেই। ইসলামের বিধানমতে স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ সরবরাহ করতে বাধ্য। ইসলামের এ সকল নীতিমালা চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম চিরবঞ্চিত নারীকে কতটা সম্মান প্রদর্শন করেছে।

জাহেলি সমাজের নিগৃহীত নারী ইসলামে এসে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন হয়েছে, মানুষের কাতারে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নারীকে পুরুষের ন্যায় অভিভাবক ও বন্ধু ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

“মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়।”[৪৮]

---

৪৪. সূরা আল বাকারা : ৩৬।
৪৫. সূরা আল আরাফ : ২৩।
৪৬. সূরা আল বাকারা : ১৪১।
৪৭. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, আল মারআতু ফিল কুরআন, (মিশর : দারুল হিলাল, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ৫৮।

জাহেলি যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থান

জাহেলি যুগে আরব সমাজে নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর বলে মনে করত। কন্যা-সন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য দুঃখ ও মনঃকষ্টের কারণ। তাই কন্যা-সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে−

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যায়। এবং সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এই দুঃসংবাদের কারণে সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করে চলতে থাকে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে কি জীবিত থাকতে দেবে, না মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? আহা! কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর তাদের বিচার-বিবেচনা।"[৪৯]

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কারো ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্ম হলে ঐ ঘরটিকে সে একটি অলক্ষুণে ঘর মনে করে তা পরিত্যাগ করত। এর চেয়েও বড় কথা এই যে, কন্যাসন্তানের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার অনুভূতিই ছিল না। তা না হলে নিজের সন্তানকে জীবিত দাফন করা কখনো সম্ভব হতো না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ নিষ্ঠুরতা কোনো কোনো সময় এমন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকেও প্রকাশ পেত, যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালোবাসার উৎস বলে মনে করা হতো। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনাও বর্ণিত আছে, যা শোনামাত্রই হৃদয় কেঁপে ওঠে।[৫০]

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে তার জাহেলী যুগের কাহিনি শুনিয়ে বলল : "আমার একটি মেয়ে ছিল। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম, তখনই সে বড়ই খুশি মনে আমার কাছে দৌড়ে আসত। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে দৌড়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম। কূপের পাশে গিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার করছিল।" ঘটনাটি শুনে নবী করীম (স)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভিজে গেল। এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত-দুটি আপন সন্তানের জন্য হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো।[৫১]

---

৪৮. সূরা আত তাওবা : ৭১।

৪৯. সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯।

৫০. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫১. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ দারেমী, সুনানুদ দারেমী, (করাচী : কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

কায়েস ইবনে আসেম নামক এক ব্যক্তি জাহেলি যুগে তার দশটি কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করেছিল।[৫২] জাহেলি যুগে আরবরা কন্যা সন্তান লাভ করাকে ক্ষতি ও অপমানের কারণ মনে করত। আর পুত্র সন্তান লাভ করাকে মনে করত সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়। তাই কন্যা-সন্তানের পরিবর্তে সর্বদা তারা পুত্র-সন্তান কামনা করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এ হীন মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে–

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.

"আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে তারা কন্যাসন্তানকে স্থির করত অথচ তিনি (সর্ব প্রকার সন্তান গ্রহণ থেকে) পূত-পবিত্র কিন্তু তাদের নিজেদের বেলায় তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য (পুত্রসন্তানকে) স্থির করত।"[৫৩]

এজাতীয় ঘৃণ্য আচরণের কারণ

১. জাহেলি যুগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তাই শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য পুরুষের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। ফলে পুরুষদেরকে নারীদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো। মেয়েদেরকে গনীমতের মালের অংশ দেওয়া হতো না। কেননা তারা ঘোড়সওয়ার হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারত না।

২. তারা মনে করত মেয়েরা জীবিত থাকলে তাদেরকে অন্যের সাথে বিয়ে দিতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল লজ্জাকর বিষয়। কারণ মেয়েকে বিয়ে দিলে বাপকে শ্বশুর হতে হয়। আর শ্বশুর হওয়াকে তারা অপমানজনক মনে করত।

৩. তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কন্যা সন্তান জীবিত রাখাটাই ক্ষতিকর। কারণ পুত্র সন্তানদেরকে লালন-পালন করতে যে পরিমাণ অর্থকড়ি খরচ করতে হয়, কন্যা সন্তানদেরকে লালন-পালন করতেও ঠিক ঐ সমপরিমাণ অর্থকড়িই প্রয়োজন হয়। অথচ ছেলেরা পিতার জন্য যেরূপ উপকারী হয়ে থাকে মেয়েরা তদ্রূপ হয় না। অতএব, মেয়েদের জন্য খরচ করা একটা বড় রকমের ক্ষতির ব্যাপার।

৪. সন্তান হত্যার আর একটি কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে যারা সন্তানদেরকে হত্যা করত তারা দুই শ্রেণির লোক। এদের এক শ্রেণি প্রকৃতই দরিদ্র ছিল। তাদের পক্ষে সন্তান লালন-পালন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই তারা কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার পথ বেছে নিয়েছিল। ঐ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ.

"তোমরা দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।"[৫৪]

---

৫২. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০১৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭।
৫৩. সূরা আন নাহল : ৫৭।
৫৪. সূরা আল আনআম : ১৫১।

আর অপর এক শ্রেণির লোকেরা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ছিল না। কিন্তু তারা মনে করত যে, আমরা যদি অনর্থক মেয়েদের লালন-পালনের জন্য ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকি তাহলে এমন একদিন আসবে যখন আমরা দরিদ্র হয়ে যাব। সুতরাং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা মেয়েদেরকে হত্যা করত। এদের প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.

"দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।"[৫৫]

৫. কন্যা-সন্তান হত্যা করার এই নিষ্ঠুর রেওয়াজটি প্রথমে গোত্রসর্দার, ধর্মযাজক এবং গণকদের থেকে শুরু হয়। তারা নিজেরাও এ অপকর্মে লিপ্ত হতো আর জনসাধারণকে এ কাজের জন্য প্ররোচিত করত। তারা বলত যে, তোমরা মেয়েদের জীবিত রেখ না। কেননা এরা অপমানের কারণ। তাদের দেখাদেখি এবং পরামর্শে অনেকেই উৎসাহিত হয়। এমনকি এই নিষ্ঠুর প্রথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ.

"বহুসংখ্যক মুশরিকদের নিকট তাদের প্রভুরা সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে তুলে ধরেছিল, যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংস করার প্রেরণা লাভ করতে পারে।"[৫৬]

তারা সন্তানদেরকে হত্যা করার জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করেছিল। প্রথমত সহজ পন্থা হিসেবে তারা সাব্যস্ত করেছিল যে, জন্মের পর তাদেরকে জীবিতই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। তাই কখনো কখনো তারা মেয়ের জন্মের পরেই কালবিলম্ব না করে তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলত। আবার কোনো কোনো সময় মেয়েকে লালন-পালন করে পাঁচ বছর বয়স হলে একদিন তাকে জীবিতই কবর দিত। তাদের এই আচরণের কথা কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ.

"সন্তানকে লাঞ্ছনা সহ্য করে কি কিছুদিন জীবিত রাখবে, নাকি সঙ্গে সঙ্গেই মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে?"[৫৭]

হত্যার জন্য তারা দ্বিতীয় পন্থা এভাবে অবলম্বন করত যে, মেয়েকে নিয়ে তারা উঁচু কোনো পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে সেখান থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিত। এভাবেই তার মৃত্যু হতো।[৫৮]

---

৫৫. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১।
৫৬. সূরা আল আন'আম : ১৩৭।
৫৭. সূরা আন নাহল : ৫৯।
৫৮. আল্লামা মালিক রাম; আওরাত আওর ইসলামী তা'লীম, অনুবাদ : মাহমূদা বেগম নেকু, নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭), পৃ. ১-৫।

সে যুগে স্ত্রী হিসেবেও নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করত। পুরুষদের বিয়ের কোনো সীমা ছিল না। তারা যত সংখ্যক ইচ্ছা নারীকে বিয়ে করত। ইসলাম কবুল করার সময় ওয়াহাব আসাদী (রা)-এর দশ জন স্ত্রী ছিল।[৫৯] গাইলান সাকাফী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁরও দশ জন স্ত্রী ছিল।[৬০]

আরবদের মধ্যে তালাকের ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষেরা যখন ইচ্ছা তখন এবং যতবার খুশি ততবার স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই খেয়ালখুশিমতো তাকে ফিরিয়ে আনত অথবা প্রত্যাহার করত।[৬১] এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপমান করার উদ্দেশ্য বলল– "আমি তোমাকে সাথেও রাখব না আবার পরিত্যাগও করব না। তার স্ত্রী জানতে চাইল, তা সে কীভাবে করবে? সে বলল : আমি তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই আবার রুজু করব। এরপর আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই পুনরায় রুজু করব।[৬২]

অত্যাচারী স্বামীদের কবল থেকে স্ত্রীদের মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ ছিল না। ঘরে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্বামী অন্যান্য নারীর সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। কিন্তু স্ত্রীদের এর প্রতিবাদ করার কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীরা দীর্ঘদিন মন না চাইলে স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করত না আবার তালাকও দিত না। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর উপার্জন করত।[৬৩]

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী তার অধীনে থাকত। স্বামীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার বিধবা স্ত্রীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করত। তারা নিজেরা কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত। আবার তাকে আদৌ বিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের স্বাধীনতা ছিল।[৬৪]

বিধবার সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা থেকে বঞ্চিত করত। অনেক সময় কোনো অল্পবয়স্কা শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিধবার পুনর্বিবাহ স্থগিত রাখা হতো, যাতে ঐ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারে।[৬৫]

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার স্ত্রী তথা সৎমাকে বিয়ে করাও আরবদের কাছে কোনো দূষণীয় ব্যাপার ছিল না। আবু বকর জাসসাস (র) লিখেন–

وقد كان نكاح امرأة الاب مستفيضا شائعا فى الجاهلية.

---

৫৯. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

৬০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.), পৃ. ২১৪।

৬১. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

৬২. আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, আল মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড, (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.), পৃ. ২৮০।

৬৩. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, (ঢাকা : আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ১১।

৬৪. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৬৫. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫।

"জাহেলি যুগে পিতার স্ত্রী সৎমাকে বিয়ে করা বহু প্রচলিত ছিল।"[৬৬]

ঐ যুগে গর্ভধারিণী মাকেও ছেলেদের অধীন হয়ে জীবন কাটাতে হতো। ছেলেদের ইচ্ছানুযায়ী তাকে চলতে হতো। তার নিজের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না।

কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কয়েকটি প্রথা চালু ছিল। তার মধ্যে একটি প্রথা এই ছিল যে, মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সংবাদ প্রচার করা হতো। এরপর বিভিন্ন পুরুষ এসে ঐ মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। যদি কারো পছন্দ হতো তাহলে সে মেয়েটিকে বিয়ে করত। আর যাদের পছন্দ হতো না, তারা সরে পড়ত। নারীদের সতীত্ব, আত্মমর্যাদার কোনো মূল্য ছিল না। তাদের এ ধরনের ঘৃণিত ও অভিশপ্ত জীবন থেকে আত্মরক্ষার পথ একমাত্র মৃত্যুই ছিল।[৬৭]

ইয়াতীম মেয়েদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ ছিল। ঘটনাক্রমে কোনো সুন্দরী ও সম্পদশালী ইয়াতীম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেত, তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করত। কিন্তু ঠিকমত মহর দিত না।[৬৮]

সে যুগের নারীরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী ও অন্য আত্মীয়দের সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। তাদের কেউ কখনো কারো ধন-সম্পত্তির অংশীদার হতো না। তারা যদি কোনোভাবে কোনো সম্পদ উপার্জন করত, অবস্থাভেদে তার মালিক হতো তার পিতা, ভাই অথবা স্বামী। কোনো উপায়ে যদি কোনো কিছু স্ত্রীর হস্তগত হতো, যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা অন্য কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো উপঢৌকন, তাহলে তার মালিক হয়ে বসত তার স্বামী। মোটকথা, নারী কোনো অবস্থায়ই আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো না এবং অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সম্পদেরও মালিক হতে পারত না।

সাবিত ইবনে কায়স (রা)-এর স্ত্রী রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এসে এই মর্মে অভিযোগ করলেন যে, উহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী সাবিত শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর দুটি মেয়ে আছে। কিন্তু সাবিতের ভাই তাঁর পুরো সম্পদই হস্তগত করেছে। তাঁর দুই মেয়ের জন্য সামান্য সম্পদও রাখেনি। এখন আপনিই বলুন, তাদের বিয়ে হবে কীভাবে?

কেউ যদি কারো সন্তানকে পোষ্যপুত্র হিসেবে লালন-পালন করত তাহলে তাদের একজন অপরজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো। অথচ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেও কোনো কন্যাসন্তান তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[৬৯]

ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়। তারা নবী করীম (স)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, নারী কি অর্ধেকের হকদার? অথচ সে না জানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে আর না পারে আত্মরক্ষা করতে।[৭০]

---

৬৬. আবু বকর আল জাসসাস, আহকামুল কুরআন, (লাহোর : সুহায়েল একাডেমী, ১৯৯১), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

৬৭. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

৬৮. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আন নিসা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৮।

৬৯. কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৭০. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

জাহেলি যুগের নারীদের সকল দুর্দশার প্রতি ইঙ্গিত করে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন–

والله انا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم.

“আল্লাহর শপথ! জাহেলি যুগে নারীদেরকে আমরা কোনো মর্যাদাই দিতাম না। এরপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন। তাদের ব্যাপারে যা নির্দেশ দেবার তা দিলেন এবং তাদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করার ছিল তা করলেন।”[৭১]

জাহেলি যুগে নারীদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাদেরকে শৈশবে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে ছেলেদের অধীনে জীবন-যাপন করতে হতো। জীবনের এ তিনটি পর্যায়ের কোনো সময়েই তাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। সারাজীবনই তারা পুরুষ অভিভাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য ছিল। কখনো তাদের ইচ্ছার কোনো মূল্য দেওয়া হতো না।

আলোচ্য আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। তারা পুরুষদের ভোগের সামগ্রী বলে বিবেচিত হতো। তাদেরকে পণ্যদ্রব্য বলে মনে করা হতো। পুরুষেরা খেয়ালখুশি মতো নারীদের গ্রহণ ও বর্জন করত। সর্বপ্রকার অধিকার থেকে নারীরা ছিল চির বঞ্চিত। এমনকি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিল না।

মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য

এ পৃথিবী সৃষ্টির মূলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ.

“প্রত্যেক বস্তুকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।”[৭২]

মানুষসহ সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু ও বস্তুনিচয়কে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলত সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের মিলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই দুটো জিনিসের মিলন সাধিত হয়, তখনই তা থেকে তৃতীয় একটা জিনিসের উদ্ভব ঘটে। এটা সৃষ্টির অমোঘ বিধান। সৃষ্টিলোকের কোনো কিছুই এ বিধানের বহির্ভূত নয়। তাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ.

“পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিলোকের সব কিছুই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন– মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি, মানবজাতি এবং সেই সব জিনিস, যেগুলো সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।[৭৩]

৭১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তালাক, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১।
৭২. সূরা আয যারিয়াত : ৪৯।
৭৩. সূরা ইয়াসীন : ৩৬।

আরো বলা হয়েছে–

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ.

"তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর চতুষ্পদ জন্তুও জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তিনি তোমাদের বিস্তৃতি ঘটান (বংশবিস্তার করেন)।"[৭৪]

মানবজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ প্রথমে এক জোড়া মানুষ সৃষ্টি করেন। সর্বপ্রথম তিনি একজন নরকে সৃষ্টি করলেন। তিনি হলেন মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম (আ)। এরপর তিনি আদম (আ) থেকেই তাঁর সঙ্গিনী এক নারীকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মানবজাতির আদিমাতা হযরত হাওয়া (আ)। এই দম্পতি থেকে বহু ছেলেমেয়ে জন্মলাভ করে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বসতি স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমেই মানবজাতির বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। সুতরাং সারা বিশ্বের সকল মানুষই এই এক জোড়া মানুষের বংশধর। মানব-সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

"হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর এই দু'জন থেকেই তিনি অসংখ্য নর ও নারী সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[৭৫]

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। রাসূলে করীম (স) বলেন–

ان المرأة خلقت من ضلع.

নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭৬]

মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তিনি বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

"আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।"[৭৭]

---

৭৪. সূরা আশ শুরা : ১১।

৭৫. সূরা আন নিসা : ১।

৭৬. মিশকাতু মাসাবীহ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০; মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯১।

৭৭. সূরা আত তীন : ৪।

আর মান-মর্যাদার দিক দিয়েও আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টিলোকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا.

"আমি বনী আদমকে মহাসম্মান দান করেছি। জলে ও স্থলে চলার জন্য তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র রিজিক দিয়েছি এবং বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৭৮]

মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ সমান

সকল নারী-পুরুষ হযরত আদম (আ) থেকে সৃষ্টি। কাজেই সৃষ্টিগতভাবে কেউ কারো ওপর প্রাধান্য দাবি করতে পারে না। একসময় নারী পুরুষ দাম্পত্য বন্ধনে জড়িয়ে যায়, সেখানে তারা পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, থাকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে অনেক নারী পুরুষ ছড়িয়েছেন।[৭৯]

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.

তিনি ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে, যেন সে তার কাছে প্রশান্তি পায়।[৮০]

আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষের মাঝে মর্যাদাবান ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

---

৭৮. সূরা বনী ইসরাইল : ৭০।
৭৯. সূরা আন নিসা : ১।
৮০. সূরা আল আরাফ : ১৮৯।

হে মানব-সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও বংশে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার; নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।[৮১]

শায়খ মুহাম্মদ আবাসিরী বলেন, উল্লিখিত আয়াতগুলো সম্পর্কে গবেষণা করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

১. মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি তাদের অস্তিত্ব, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দান করেছেন। মানুষ এ সত্য বুঝতে সক্ষম হলে নির্দ্বিধায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

২. আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর থেকে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর উভয় থেকে পৃথিবীর তাবৎ নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। মূলত সৃষ্টিতে নারী পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্রে। তারা পরস্পরের পরিপূরক, পৃথক সত্তা নয়। উভয়কে নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সমাজ বিনির্মাণের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর হলো পরিবার। পরিবার গড়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী যোগ্যতা দান করেছেন।

৩. মানুষ এক ব্যক্তির বংশধর। সকল মানুষের উৎস যেহেতু একজন, কাজেই তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সহায়-সম্পদ, মান-সম্মান ও শিক্ষা-দীক্ষায় তারা সকলেই সমান অধিকার রাখে। মানুষ বর্ণ ও জাতীয়তায় বিভিন্ন হলেও তারা সকলে আদম (আ)-এর সন্তান। তাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অধিক সম্মানী হলো মুত্তাকী ব্যক্তি। এছাড়া সকল মানুষ সমান। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে يَا أَيُّهَا النَّاسُ (হে মানুষ) বলে সম্বোধন করেছেন। নারী পুরুষ সকলেই এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত। কাজেই প্রমাণিত হয়, নারী পুরুষ আল্লাহর নিকট সমান।

নবী করীম (স)-এর যুগের সকল মানুষ, মক্কাবাসী এবং অন্যরা এ সম্বোধনে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটি নাযিলের সময় যারা ছিল এবং পরবর্তী কালে যারা আসবে, সকলে এ আয়াতের সম্বোধনে অন্তর্ভুক্ত।

ড. বাহী খাওলী বলেন, সূরা আন নিসার উপরিউক্ত আয়াতে তিনটি বাক্য সংযুক্ত রয়েছে।

প্রথম বাক্য يَا أَيُّهَا النَّاسُ এ সম্বোধন মানবজাতির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টির মাঝে মানব শ্রেণিকে বিশেষ করে সম্বোধন করা হয়েছে। ناس তথা মানুষ শব্দের মাঝে নারী পুরুষ উভয় শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বাক্য خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ (তোমাদের এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন), এ বাক্যাংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষ এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্ট।

৮১. সূরা আল হুজুরাত : ১৩।

তৃতীয় বাক্য وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিণীকে সৃষ্টি করেছেন), এ অংশ দ্বারা বোঝা যায়, সকল মানব সন্তান ও তাদের মা বাবা এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাদের উৎস একজন।

এ তিনটি বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পরের সহোদর সহোদরা। সুতরাং সকলেই সমান। তাদের উৎস আদি পিতা হযরত আদম (আ)

রাসূলে করীম (স) মক্কা বিজয়ের ভাষণে বলেছিলেন– الناس من ادم وادم من تراب.

"মানবজাতি আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে তৈরি।"

এরপর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও তিনি বলেন– كلكم من ادم وادم من تراب.

"তোমরা সবাই আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে।"[৮২]

অতএব বুঝা গেল যে, নর-নারী নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাপ ও পুণ্যের বিচারে নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইসলামে নারী-পুরুষের অর্জিত সম্পদের মালিকানা-স্বত্বেও কোনো প্রকার ভেদাভেদ রাখা হয়নি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

"পুরুষদের জন্যে তাদের উপার্জনের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর মহিলাদের জন্যেও তাদের উপার্জনের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৮৩]

নর-নারীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে ইসলামে কোনো ভেদাভেদ নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার আছে, তদ্রূপ পুরুষদের ওপর নারীদেরও ন্যায়সংগতভাবে অধিকার রয়েছে।"[৮৪]

নবী করীম (স) বলেছেন– ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا۔

"নিশ্চয় নারীদের ওপর তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তদ্রূপ তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।"[৮৫]

দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রেও ইসলাম নর ও নারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখেনি। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

"হে জ্ঞানীগণ, দণ্ডবিধানে তোমাদের জীবনাধিকারের নিশ্চয়তা রয়েছে।"[৮৬]

নবী করীম (স) বলেছেন– ان الرجل يقتل بالمرأة۔

---

৮২. আল্লামা শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : প্যারাডাইস লাইব্রেরী ১৯৭৫), পৃ. ১৪৫।
৮৩. সূরা আন নিসা : ৩২।
৮৪. সূরা আল বাকারা : ২২৮।
৮৫. সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৮৬. সূরা আল বাকারা : ১৭৯।

"কোনো পুরুষ লোক যদি অন্যায়ভাবে কোনো মহিলাকে হত্যা করে, তবে শাস্তিস্বরূপ সেই পুরুষকেও হত্যা করতে হবে।"[৮৭]

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছে– নারীর চোখ, কান বা কোনো অঙ্গ জখম করলে অপরাধী পুরুষের নিকট হতে অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে।[৮৮]

একবার জনৈক ইয়াহুদী একটি স্ত্রী লোককে হত্যা করেছিল। বিচারে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

হযরত ওমর (রা) খেলাফত আমলে একজন স্ত্রীলোকের হত্যাকাণ্ডে কয়েকজন পুরুষের জড়িত থাকার বিষয় প্রমাণিত হলে তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।[৮৯]

মিরাস বা উত্তরাধিকার আইনে নর-নারী উভয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কেবল ইসলামই নজীরবিহীনভাবে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মহিলাদের জন্যেও পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ রয়েছে। সম্পদের পরিমাণে কমবেশি যাই হোক না কেন তাতেই উভয়ের জন্যে অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।"[৯০]

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও ইসলামে নর ও নারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৯১]

মহানবী (স) বলেন– طلب العلم فريضة على كل مسلم۔

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।"[৯২]

জ্ঞানার্জনকে শুধু পুরুষের জন্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি বরং পুরুষের ন্যায় নারীকেও জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফিকহবিদ ও হাদীসবিদের সকলেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

ইসলাম নর ও নারী উভয়ের জন্যে সমান অনুসরণীয় জীবন বিধান অনুমোদন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

---

৮৭. আহমাদ ইবনুল হুসাইন আবু বকর আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, (মক্কা : মাকতাবাতু দারুল বায), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৮৮. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪।
৮৯. আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
৯০. সূরা আন নিসা : ৭।
৯১. সূরা আল আলাক : ১।
৯২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

“মুমিন পুরুষ বা মহিলা যে-ই হোক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো নির্দেশ দেন, এ ব্যাপারে কারোই কোনো এখতিয়ার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করবে সে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে।”[৯৩]

পর্দারক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ইসলাম নরনারীকে সমভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

“হে নবী, আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম পন্থা। তারা যা-কিছু করে, আল্লাহ সে ব্যাপারে অবহিত আছেন। আর ঈমানদার মহিলাদেরকেও বলুন, তারাও যেন দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে।”[৯৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট এ বিষয়টি নিগূঢ়ভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সকল ক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নারী-পুরুষের মাঝে ইসলাম সমতা বজায় রেখেছে। তাদের মাঝে মোটেও বৈষম্য আচরণ করা হয়নি।

শরিয়তের বিধি-বিধানে নর-নারীর সমতা

যেসব বিধান একান্তই পুরুষসুলভ বা নারীসুলভ নয় সে সকল ক্ষেত্রে নর-নারী উভয়েরই সমান বিধান রাখা হয়েছে। যেমন ইসলামের পাঁচ রোকন– তাওহীদ, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ যেমন পুরুষের জন্য ফরয, তেমনই নারীর জন্যও ফরয। মানুষের মাঝে তাকওয়াবানগণই আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ রাখেননি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

“পুরুষ হোক আর নারী হোক যেই নেক কাজ করবে যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।”[৯৫]

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

“যে কেউ পাপাচারে লিপ্ত হলে তার কর্মের অনুরূপ সাজা পাবে আর নর নারীর মধ্য থেকে যেই সৎকর্ম করবে যে যদি মুমিন হয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অফুরন্ত রিযিক দান করা হবে।”[৯৬]

---

৯৩. সূরা আল আহযাব : ৩৬।
৯৪. সূরা আন নূর : ৩০-৩১।
৯৫. সূরা আন নিসা : ১২৪।
৯৬. সূরা মুমিন : ৪০।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ, মুমিন ব্যক্তি সে নর হোক বা নারী হোক, সে যদি সৎ আমল করে তবে আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব, আর তাদের কাজের অতি উত্তম প্রতিদান দেব।[৯৭]

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নারীর মর্যাদার বিষয় ফুটে ওঠেছে। সৎ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন মর্মে উক্ত আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরূপ ভালো কাজের জন্যে পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্যে তিরস্কার সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষকে সমান স্তরে রেখেছেন। তিনি বলেন

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ.

অর্থাৎ, তাদের প্রভু তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কারো আমলই বিনষ্ট করব না। সে নর হোক বা নারী হোক তোমরা পরস্পরের অংশ।[৯৮]

ইমাম নিশাপুরী তাঁর 'আসবাবুন নুযূল' গ্রন্থে এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় বলেন, 'হযরত উম্মে সালামা (রা) একবার নবী করীম (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ তায়ালা তো নারীদের হিজরত করা প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

এভাবে দ্বীনদারী ও ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতটি খুবই স্পষ্ট ও দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থাৎ নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী ও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী ও অনুগত পুরুষ ও নারী; সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী– আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে রেখেছেন ক্ষমা ও বিপুল প্রতিদান।[৯৯]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) বলেন, নবীপত্নীদের পরে ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে অন্যান্য নারী কর্তৃক পুরুষের সমান হওয়ার বিষয় আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নারীকে পুরুষের পাশাপাশি উল্লেখ করে নর-নারীর সমমর্যদার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে উভয়কে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। চাই তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয় হোক বা ইবাদত, বা পার্থিব জীবনপদ্ধতির বিষয় হোক।

---

৯৭. সূরা আন নাহল : ৯৭।
৯৮. সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।
৯৯. সূরা আল আহযাব : ৩৫।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলামে নারী পুরুষের মর্যাদা সমান, তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, যে সকল ক্ষেত্রে নারীদের নারীসুলভ বাধা রয়েছে যে সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্যে ইসলাম বিশেষভাবে ছাড় দিয়েছে। যেমন ঋতুকালে সালাত আদায় করতে হয় না এবং ঋতু অবস্থায় রোযা না রেখে পরবর্তী কোনো সময়ে তা কাযা করতে হয়।

ঋতুকালে হজ আদায় করা শুদ্ধ তবে এসময় তাওয়াফ করতে হয় না। কারণ তাওয়াফ সালাতের মতো। তাতে বাহ্য পবিত্রতার বাধ্যবাধকতা আছে। অপবিত্র অবস্থায় সালাত যেমন শুদ্ধ নয়, তেমনি এসময়ে তাওয়াফও শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

عن عائشة (رضـ) ان فاطمة بنت ابى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى ﷺ فقال ذلك عرف وليست بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاعتلى وصلى.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা বিনতে জাহশের ইস্তেহাযা রোগজনিত স্রাব হতো। তিনি এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি রগ থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। হায়েয হলে সালাত পড়বে না। হায়েয চলে গেলে গোসল করে সালাত আদায় করে নেবে।"[১০০]

হযরত মুয়াযা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন যে, আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর কি সালাত কাযা করবে? তিনি বললেন, তুমি কি হারুরী (খারেজী)। রাসূল (স)-এর যুগে আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হলে তাকে সালাত কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো না।[১০১]

ইমাম নভবী বলেন, যদি ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে নামায কাযা করা ওয়াজিব হতো, তাহলে রাসূল (স) ঐ নারীকে সে ব্যাপারে আদেশ করতেন।

শায়েখ আব্দুল্লাহ বিসাম বলেন, খারেজীরা নামায-রোযার মাঝে পার্থক্য করে না। অর্থাৎ তাদের মতে ঋতুবতীর নামায রোযা উভয়ই কাযা করতে হবে।

ঋতুবতী নারী তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় কাজ করতে পারবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে হজ আদায় করতে বের হয়ে সারেফ নামক স্থানে পৌঁছলে নবী করীম (স) আমার কাছে আগমন করেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আমার মনে হয় এ বছর হজ্জ করতে পারব না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার ঋতু শুরু হয়েছে। আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি আল্লাহ আদম কন্যাদের জন্যে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি হাজীদের মতো আমল করতে থাক। অবশ্য পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ করবে না।[১০২]

আলোচ্য হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, ইসলাম নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার ওযরকে শরয়ি ওযর হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্যে বিশেষ ছাড় দিয়েছে।

কর্মের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নর-নারীর মাঝে কোনো প্রকার ভেদাভেদ রচনা করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

---

১০০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
১০১. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
১০২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

"যেসব মুমিন ব্যক্তি চাই সে পুরুষ হোক বা নারী হোক সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি মোটেও অবিচার করা হবে না।"[১০৩]

নারীর নাগরিক অধিকার

অন্যান্য অধিকারের মতো নাগরিক অধিকারে ইসলাম নর-নারীর মাঝে কোনো প্রভেদ রাখেনি। শায়খ মুহাম্মদ শারাবী বলেন, নারীর নাগরিক অধিকার দ্বারা লেনদেন করার ক্ষমতা, ক্রয় বিক্রয়, মালিকানা স্বত্ব অর্জন এবং নিজের মালিকানা অন্যকে দান করা, ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রফেসর রশিদ রেযার মতে সম্পদ রক্ষা করার অধিকার নারীর নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। শায়খ আবাসিরী বলেন, নারী স্বীয় সম্পদে লেনদেন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। তার এ ক্ষমতায় কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

ড. আব্দুল ওয়াহিদ নারীর নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বলেন, নারী বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক, সর্বাবস্থায় তার নাগরিক অবস্থান, চুক্তি করা এবং মালিকানা অর্জনের ক্ষমতার কোনোরূপ হেরফের হবে না। তার সম্পদ স্বামীর সম্পদ থেকে আলাদা থাকবে, তার মালিকানায় কারো হস্তক্ষেপ চলবে না। এমনকি স্বামীও তার মালিকানাধীন সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অপর স্ত্রীকে রাখতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তার কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না। তোমরা কি মিথ্যা ও সুস্পষ্ট পাপ গ্রহণ করতে চাও? তোমরা তা কীভাবে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একজন অপরজনের সাথে মেলামেশা করেছ। আর তারা (নারী) তোমাদের (পুরুষ) থেকে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।"[১০৪]

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নিতে পারবে না। নারী যে পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কোনো কিছু দান না করবে, সে পর্যন্ত পুরুষের জন্যে নারীর সম্পদ গ্রহণ করা মোটেও বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

অর্থাৎ, তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে নারীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদের কিছু দেয়, তবে তা তৃপ্তির সাথে খেতে পারো।[১০৫]

---

১০৩. সূরা আন নিসা : ১২৪।
১০৪. সূরা আন নিসা : ২০।
১০৫. সূরা আন নিসা : ৪।

পূর্বের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ করলে একথা বোঝা যায় যে, সমাজিক কাজ-কারবার, লেনদেনের স্বত্বমালিকানা প্রভৃতিতে নর-নারীর সমান অধিকার রয়েছে। ইসলাম নারীকে এ মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো জীবন ব্যবস্থায় নারীকে এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়নি।

বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে বলতে গেলে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের বিধিবিধান পালিত না হওয়ার কারণে অন্যান্য সমস্যার মতো নারীদের অধিকারও অনেক ক্ষেত্রে খর্ব হয়ে থাকে। এর ফলে স্থূলদর্শী কিছু লোকজন বলে থাকে যে, ইসলামে নর-নারীর মাঝে সমতার বিধান করা হয়নি। তাদের একথা মারাত্মক ভুল ও সত্যের অপলাপ। কারণ, ইসলামি আইন না মানার ও তা না কার্যকর করার কারণেই এমনটি ঘটেছে। বৃটিশ আইন কিংবা মানব রচিত আইনের কুফলেই এমনটি ঘটছে। এজন্যে ইসলামের বিধি-বিধান যথাযথ অধ্যয়ন করা ও তা কার্যকর করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়।

বর্তমানে মুসলিম দুনিয়ার প্রতি তাকালে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, তাদের দেশ ও সমাজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, ইসলাম দয়া, ক্ষমা ও সৌন্দর্যের ধর্ম, এখানে নারীর-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা সুরক্ষিত। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখলে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সুতরাং মুসলিম জাতির অবস্থা পরিবর্তন করা দরকার। আর এ পরিবর্তন তাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই সর্বাগ্রে হতে হবে। সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে পরিবর্তিত হতে হবে। কারণ ব্যক্তির সংশোধন হয়ে গেলে সমাজ সংশোধিত হবে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ঐ সময় পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে।[১০৬]

আমরা যদি সত্য কথা প্রকাশ না করে চুপ থাকি, তাহলে ক্রমেই আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। পদে পদে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

অর্থাৎ, আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছ করি তখন ঐ সম্প্রদায়ে ধনীদের সৎকাজ করার আদেশ করি। কিন্তু তারা অন্যায় করায় তাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়, অতঃপর আমি তাদের ধ্বংস করে দেই।[১০৭]

বাহ্য দৃষ্টিতে যেসকল ক্ষেত্রে নর-নারীর সাথে তারতম্য দেখা যায়

মহাজ্ঞানী আল্লাহ সমাজে শৃঙ্খলা বিধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কারো ওপর কাউকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

---

১০৬. সূরা আর রা'দ : ১১।
১০৭. সূরা আল ইসরা : ১৬।

"মহান আল্লাহ যে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এ ব্যাপারে তোমরা অন্য কিছু কামনা করো না।"[১০৮]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণা হতে জানা যায় যে, আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ-লাবণ্য, বিবেক-বুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্র, মায়া-মমতা, শৌর্য-বীর্য, স্বর-সুর, ভাব-ভঙ্গি, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদিতে নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতি ও জীব জন্তুর জীবন প্রণালিতেও নর ও মাদীর সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক প্রভেদ দেখা যায়। আর এমনটি একান্তই স্বাভাবিক। যেমন নর তালগাছে তাল ধরে না। পক্ষান্তরে মাদী তালগাছে তাল আসে। এভাবে সিংহের শক্তি-সামর্থ্য চালচলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সিংহীর তফাৎ রয়েছে। তদ্রূপ বাঘ বাঘিনী মোটকথা সকল নর-নারীর প্রজাতির মতোই এরূপ তারতম্য আছে। তবে তা একান্তই সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত; অধিকারগত নয়। আমাদের মানব সমাজের নর-নারীর মাঝেও এমন তফাত রয়েছে। কুরআন ও হাদীসেও নর-নারীর ঐ তফাতের কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণভাবে নর-নারীর মধ্যকার তফাতের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন– وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ "নর নারীর মতো নয়।"[১০৯]

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষদেরকে পরিবার ও সমাজের ওপর নেতৃত্ব দান করেছেন। তিনি বলেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"পুরুষগণ মহিলাদের অভিভাবক ও পরিচালক; এই নীতি অনুসারে যে, আল্লাহ কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; আর এ কারণেও যে, পুরুষরা মহিলাদের ভরণ-পোষণের জন্যে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে থাকে।"[১১০]

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত قَوَّامُونَ শব্দটির মূলজাত অর্থ হলো সুপ্রতিষ্ঠিত, অটলভাবে দণ্ডায়মান, তত্ত্বাবধানকারী, প্রভু, প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক, সংরক্ষক ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

"মহিলাদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।"[১১১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেন, নারীদের ওপর পুরুষদের প্রাধান্যের কারণ হলো, তারা স্ত্রীদেরকে মহর দান করে, তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে আদেশ করে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং নামাযের জামায়াত, জুমার নামায, ঈদের নামায, জিহাদ ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্যে তাকিদ করে থাকে।[১১২]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যে আলোচ্য আয়াতে পুরুষকে অভিভাবক হিসেবে মহিলাদের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এর জন্যে নারীর মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। কারণ, এটি

---

১০৮. সূরা আন নিসা : ৩২।

১০৯. সূরা আলে ইমরান : ৩৬।

১১০. সূরা আন নিসা : ৩৪।

১১১. সূরা আল বাকারা : ২২৮।

১১২. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬; মুহাম্মদ ইজ্জাহ দারুজা, আল মারআতু ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, (বৈরূত : আল মাকতাবাতুল ফিকরিয়া ১৯৮০), পৃ. ২২৬; মুহাম্মদ খায়রাত, মারকাযুল মারআতি ফিল ইসলাম, (মিশর : দারুল মাআরিফ, ১৯৭৫), পৃ. ১০৮; Masumeh Raghibi Byat, Women Victim or Victor, Dhaka : A B. Publications, 1995. P.58.

একান্তই সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগত বিষয়ের চাহিদা বিবেচনায় বিধিবদ্ধ হয়েছ। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও আমরা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজন প্রকৃত ঈমানদার এবং নেক আমলের অধিকারী পুরুষকে এই অধিকার দিয়েছেন। তা কোনো অপ্রকৃতিস্থ বোধহীন কিংবা বদমেজাজী ও অনুকম্পাহীন পুরুষকে প্রদান করা হয়নি।

মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে নর-নারীর অধিকারের ক্ষেত্রেও যৌক্তিক তারতম্য আছে। যেমন কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন একজন পুরুষ দুজন মহিলার অংশের সমান অংশ প্রাপ্য হবে।[১১৩]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) লিখেন– পুরুষরা স্ত্রীদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা এমনভাবে করে, ঠিক যেমনভাবে শাসকগণ দেশের জনসাধারণের দেখাশোনা করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা দুটো কারণে স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একটি কারণ আল্লাহর সৃষ্টিগত বিশেষ দান, আর অপরটি পুরুষদের নিজস্ব অর্থ। আল্লাহর দান হলো, জ্ঞান-বুদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুরুতর কার্য সম্পাদনা, বিপুল কর্মশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে পুরুষেরা স্বভাবতই প্রাধান্যের অধিকারী। এজন্যেই নবুওয়ত, নেতৃত্ব, শাসন-ক্ষমতা, জিহাদ, বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে। আর এই অধিকার দায়িত্বের কারণেই মীরাসে পুরুষের অংশ বেশি দেওয়া হয়েছে। আর পুরুষের অধিক হওয়ার কারণ হলো, মহরানা প্রদান করা, ভরণপোষণ এবং পারিবারিক যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে।[১১৪]

(খ) পুরুষ নিজেই মিরাস পাওয়ার অধিকারী, তবে মহিলারা তার ভাই অথবা চাচাত ভাইয়ের সাথে মিরাস পাবে।

(গ) স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেক স্বামী পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান-সন্তুতি না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে এক চতুর্থাংশ পাবে। অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে এক অষ্টমাংশ পাবে।

মীরাস বণ্টনে নর ও নারীর তারতম্য সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, বাহ্যত মহিলাদের প্রাপ্য এক্ষেত্রে কম বলে মনে হলেও অন্যদিক দিয়ে পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের বিধান মোতাবেকই স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মহরানা পায়। পক্ষান্তরে পুরুষ এই ধরনের কিছু কারো কাছ থেকে পায় না। আবার বিয়ের সময় বর কনেকে যে অলংকার ও পোশাকাদি দেয়, তার মালিকও এককভাবে কনেই হয়ে থাকে। এছাড়া পুরো পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব শুধু পুরুষের দায়িত্বেই ন্যস্ত। নারী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মেয়েরা বিয়ের পূর্বে অভিভাবকের এবং বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে ভরণপোষণ পেয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দান সুবিচার নয় বরং অবিচার বলে বিবেচিত হবে। আর ইসলাম সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বপ্রকারের অবিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[১১৫]

---

১১৩. সূরা আন নিসা : ১১।

১১৪. কাজী নাসীরুদ্দীন আবু সাঈদ উমর আল বায়জাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, (ভারত : দারুল ফিরাস লিন নাশর, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

১১৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নারী, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৩৩-৩৪।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কেবল পিতা-মাতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের ঐ বিশেষ আইনটি (অর্থাৎ কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে) প্রযোজ্য। কিন্তু পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় ইচ্ছা করলে পুত্র ও কন্যাসন্তান উভয়কে তাঁর সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারেন।

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন–

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

"তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী রাখ।"[১১৬]

সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

أليس شهادة المرء مثل نصف شهادة الرجل؟

মহিলার সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়?"[১১৭]

১. যদি কোনো হত্যা সংঘটিত হয়, তখন পুরুষরা যেমন– দীয়াত রক্তপণ পায়। তেমনি মহিলারাও পাবে। তবে মহিলাদের দীয়াত পুরুষদের অর্ধেক। তেমনিভাবে আহত হলেও তার দীয়াত অর্ধেক।
২. মহিলারা যেমন– হজ ও ওমরাহর জন্যে ইহরাম বাঁধে, তেমনিভাবে পুরুষরাও বাঁধে। তবে মহিলারা যে পোশাক পরিধান করে থাকে তা দ্বারাই ইহরাম বাঁধতে পারে, হোক তা সালোয়ার কামিজ অথবা অন্য যে কোনো পোশাক। আর পুরুষরা দুটি সেলাই বিহীন চাদর পরিধান করবে ও মাথা খালি রাখবে, কিন্তু মহিলারা মাথা ঢেকে রাখবে।
৩. পুরুষদের যেমন– কাফন পরিধান করানো হয়, মহিলাদেরও তেমনি কাফন পরিধান করানো হয়। তবে মহিলাদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়াই হচ্ছে মুস্তাহাব। পুরুষদের কাফন দিতে হয় তিন কাপড়ে।
৪. পুরুষরা যেমন– সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে তেমনিভাবে মহিলারাও তা করে। তবে যখন সে হায়েয ও নিফাস অবস্থায় থাকে, তখন সালাত আদায় ও সিয়াম পালন করা তার জন্যে নিষিদ্ধ। আর সে তখন মসজিদেও প্রবেশ করতে পারে না।

   রাসূল (স) বলেছেন– أليس إذا حاضت (المرأة) لم تصل ولم تصم.

   "যখন মহিলা হায়েয অবস্থায় থাকে, তখন তারা না সালাত আদায় করতে পারবে, আর না সিয়াম পালন করতে পারবে।"[১১৮]

   অন্য হাদীসে রয়েছে– لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب.

   "হায়েয অবস্থায় ও বড় নাপাকী অবস্থায় মসজিদে ঢোকা জায়েয নয়।"[১১৯]

---

১১৬. সূরা আল বাকারা : ২৮২।
১১৭. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
১১৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪।
১১৯. আল্লামা শাইখ নিযাম, আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ ২০০৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

৫. পুরুষরাও যেমন– সাধ্যমত কাজ করে, তেমনি মহিলারাও। তবে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র আলাদা। মহিলারা কাজ করে পুরুষদের থেকে দূরে তাদের চোখের আড়ালে, যাতে তাদের সাথে মেলামেশা না ঘটে।

৬. পুরুষরা মহিলাদের জন্যে খরচ করে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের ওপর খরচ করে না। কারণ, তারা এ ব্যাপারে অসমর্থ।

৭. মহিলারা পুরুষদের পিছনে সালাত আদায় করে। কিন্তু পুরুষরা মহিলাদের পিছনে সালাত আদায় করে না।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে মহিলারা যে পুরুষদের থেকে আলাদা তা শরিয়তে সাবিত (প্রমাণিত) আছে। তাই মহিলাদের-এর বাইরে চলে যাওয়ায় কোনো অধিকার নেই। আর পুরুষদের কোনো অধিকার নেই এদের মধ্যে প্রবেশ করার। কারণ, এটাই হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ পাকের বিধান। আর দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত-এর ওপর চলার মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা ও শৃংখলা।[১২০]

একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহধর্মিণীকে তার স্বামীর কাছে মর্যাদামণ্ডিত করেছে। পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পোশাকতুল্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে তা অন্যান্য ধর্মে বিরল।

---

১২০. মাহবুবা বেগম, নারীর ভূষণ (ঢাকা : আল-কুরআন গবেষণা সেন্টার, জুলাই ১৯৯৯), পৃ. ৪৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী স্বাধীনতার মর্ম

স্বাধীনতা শব্দটির দুটো অংশ আছে। একটি হলো স্ব অপরটি হলো অধীনতা। স্ব শব্দের অর্থ হলো নিজের। অধীনতা শব্দের অর্থ হলো আজ্ঞানুবর্তিতা বা বাধ্য হওয়া। সুতরাং স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হলো– নিজের মর্জি বা আজ্ঞা অনুযায়ী কোনো কিছু করা অথবা স্বীয় ইচ্ছামাফিক চলাফেরা করা, সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি।

প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা, পছন্দ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী চলতে চায়। অন্যের অধীনতা ও বশ্যতা সবার কাছেই অপ্রিয়। এভাবে কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই নিজের ক্ষতি ও অমঙ্গলকে মেনে নিতে চায় না। বাস্তব জগতের প্রতি আমরা যখন দেখি, তখন দেখতে পাই যে, প্রায় সব লোকই কারো না কারো অধীন। কেউবা চাকরি করছে তার পদস্থ কর্মকর্তার অধীনে, কেউবা মিল-কলকারখানায় কাজ করে মহাজনের অধীনে, কেউবা দিনমজুরি খাটছে জমিদারের অধীনে।

বাস্তব জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো এই যে, কোনো কাজ বা কোনো ব্যাপারে সকলের কাছেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তিসংগত ও পরিজ্ঞাত স্বাধীনতাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এর সীমারেখাও স্বাভাবিকভাবেই সকলের নিকট স্পষ্ট থাকে। ফলে সকল ক্ষেত্রে তা সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবপরও হয়ে উঠে না।

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম, তাই মৌলিকভাবে কোনো ব্যক্তিই কারো দাস নয়। মানুষ মানুষের দাসত্ব করতে পারে না। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, পুরুষ হোক বা নারী, সাবলক হোক বা নাবালক। তাই স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষেরই জীবন-স্পন্দনতুল্য। মানুষের জীবনের বৃহৎ অংশের স্বাধীনতাকে শ্রেণিবদ্ধ করা সম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য ও প্রধান কয়েকটি স্বাধীনতার প্রকার উল্লেখ করা যায়। বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় নারী-প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এগুলোকে নারী-স্বাধীনতার প্রকার বলে উল্লেখ করা হলো, যদিও তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য ও গুরুত্ববহ।

নারী-স্বাধীনতার প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-স্বাধীনতা কয়েক প্রকারের হতে পারে। যথা–

১. নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা।
২. নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতা।
৩. নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা।
৪. নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা।
৫. নারীর শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রকারগুলো ছাড়া ইসলামে নারী স্বাধীনতার আরো কয়েকটি প্রকার আছে। তবে এগুলোই প্রধান, বহুল প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ।

১. নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা

ইসলামে স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাধীনতা। ব্যক্তি যে কাজ বা বিষয়কে সঠিক মনে করবে, তা বিশ্বাস করার ও বলার স্বাধীনতা তার রয়েছে। কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত সে তার দৃষ্টিতে যা ভালো মনে করবে, তা করতে পারবে। কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ইচ্ছার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যে সমাজে তার বসবাস, সেখানে সে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। মানুষের স্বাধীনতা বলতে এ বিষয়কেই

বোঝানো হয়ে থাকে।[১২১] প্রফেসর তাওফীক ওহাবা বলেন, মানুষ জন্মের পর থেকে স্বাধীন। আল্লাহ ছাড়া কেউ তার মালিক ও মনিব নয়। জনৈক মিসরী গোলাম হযরত আমর বিন আস (রা) কর্তৃক জুলুমের শিকার হওয়ার অভিযোগ দাখিল করলে হযরত ওমর (রা) হযরত আমর বিন আস (রা) ও তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ করে বলেন, 'কেন তোমরা মানুষকে দাসে পরিণত করেছ, অথচ তাদের মা স্বাধীন অবস্থায় তাদের ভূমিষ্ঠ করেছে!'[১২২]

উল্লিখিত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ কারো দাস নয়, ব্যক্তিরও নয়, রাষ্ট্রেরও নয়। সে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, সমাজের অন্যদের সাথে তারও সমান অধিকার রয়েছে।

সুতরাং মৌলিকভাবে কোনো নারীই কারো দাসী, অধীনা বা আশ্রিতা হতে পারে না। অন্যদের মতো নারীও যুক্তিগ্রাহ্য, বিবেকসম্মত স্বাধীনতার অধিকারিণী। এতে কারো হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। ইসলাম নারীকে যে বিবেকসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে তাতে সামান্যতম তারতম্য রচনা করার অধিকার কারো নেই। এর ব্যতিক্রম করলেই তা সীমালঙ্ঘনের আওতায় পড়বে। আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন–

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে সে নিঃসন্দেহে জালিম।

ইসলাম মানুষকে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। কেউ তার এ অধিকার হরণ করার ক্ষমতা রাখে না। কারো প্রতি কেউ বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"যে তোমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার ওপর ততটুকু সীমালঙ্ঘন করো, যতটুকু সে করেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"[১২৩]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়– ইসলাম মানবাধিকার, মানব-মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব বজায় রাখার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। কারো বেঁচে থাকার অধিকারের ওপর আগ্রাসন চালানো এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, যে মুসলমান এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমি আল্লাহর রাসূল। তা হলে তাকে তিন কারণের মধ্য থেকে অন্তত কোনো একটি কারণ পাওয়া ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয়– ১. বিবাহিত হওয়ার পরও ব্যভিচার করলে, ২. কাউকে হত্যা করলে, ৩. দ্বীন ত্যাগ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহী হলে।[১২৪]

তাইসীর গ্রন্থপ্রণেতা এ তিন প্রকারের ব্যাখ্যায় বলেন–

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবাহের মাধ্যমে সচ্চরিত্রতা রক্ষা করার সুযোগ করে দিয়ে করুণা করেছেন। তথাপি সে যেনা করে সম্ভ্রম ও সচ্চরিত্রতার প্রতি অবিচার করেছে। পবিত্রতার সীমা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে।

---

১২১. তানযীমুল ইসলাম লিল মুজতামায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১২২. তাওফীক আলী ওয়াহবা, হুকূকুল ইনসান বাইনাল ইসলাম ওয়ান নাযমিল আলমিয়্যাহ, (আল মাজলিসুল 'আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ ১৯৯২), পৃ. ৫৭।

১২৩. সূরা আল বাকারা : ১৯৪।

১২৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু কাওলিল্লাহি আন্নান নাফসা বিন নাফসি, হাদীস নং ৬৮৭৮।

২. কাউকে হত্যার মাধ্যমে সে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর আমোঘ আইনকে ভঙ্গ করেছে।

৩. যে ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের বিদ্রোহী সাব্যস্ত হয়, তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা সে দ্বীনের স্বাদ আস্বাদনের পর তা ত্যাগ করে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহিতার পতাকা উত্তোলন করেছে তাই, তার বেঁচে থাকার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।[১২৫]

উক্ত তিন শ্রেণির লোককে দ্বীন ও শরীয়তের সম্মান রক্ষার স্বার্থে হত্যা করা যাবে।

উক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করা যাবে না। অন্যথায় তা অন্যায়ভাবে হত্যা বলে সাব্যস্ত হবে। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করলে দুনিয়ার শাস্তির পাশাপাশি পরকালীন শাস্তিরও হুঁশিয়ারি রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত। তিনি তার প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য চরম শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[১২৬]

আলোচ্য আয়াতে হত্যার শাস্তি হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন– জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়া, আল্লাহর ক্রোধ ও লানতের শিকার হওয়া এবং জাহান্নামে চরম শাস্তি ভোগ করা। অন্যান্য শাস্তির ক্ষেত্রে সাধারণত তওবার পর গুনাহ মাফের কথা উল্লেখ থাকে, কিন্তু হত্যার শাস্তির পর গুনাহ মাফের কোনো উল্লেখ নেই। বিষয়টা এখানেই সীমিত নয়; বরং একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য সতর্ক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

"আমি বনি ইসরাঈলের ওপর ফরয করে দিয়েছি– যে ব্যক্তি কাউকে কোনো জীবনের (অর্থাৎ হত্যার) বিনিময় ব্যতীত হত্যা করল বা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি তাকে জীবিত রাখল, সে যেন সকল মানুষকে জীবিত রাখল।"[১২৭]

মানুষের জীবন আল্লাহর কাছে অতি মূল্যবান। এ জীবন বিনষ্ট করার অধিকার কারো নেই। জীবন রক্ষা ও জীবনের গুরুত্ব বুঝাতে আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত বিধানাবলি আরোপ করেছেন। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তথাপি রাসূল (স) সুস্পষ্ঠভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন– ان الرجل يقتل بالمرأة "স্ত্রীলোককে হত্যার দায়ে পুরুষকে হত্যা করতে হবে।"[১২৮]

হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে একজন স্ত্রীলোকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।[১২৯]

---

১২৫. আবদুল্লাহ আল বাস্‌সাম, তাইসীরুল আল্লাম শরহু উমদাতিল আহকাম, (মিশর : মাকতাবাতুত তাবেয়ীন, ১০ম প্রকাশ ২০০৬), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।

১২৬. সূরা আন নিসা : ৯৩।

১২৭. সূরা আল মায়েদা : ৩২।

১২৮. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১২৯. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা রক্ষার প্রতিও বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই গীবত-পরনিন্দা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মন্দ নামে ডাকাডাকি ইত্যাদিকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন−

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ.

"হে মুমিনগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে ঠাট্টা না করে। হতে পারে ওরা তাদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও যেন পরস্পরকে উপহাস না করে। হতে পারে ওরা তাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ করবে না।"[১৩০]

অহেতুক কারো প্রতি কুধারণা করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটিও এক প্রকারে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপতুল্য। এতে ব্যক্তির প্রতি অবিচার হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন−

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় তথ্য খুঁজো না। কারো পশ্চাতে তার নিন্দা করো না। কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণাই করবে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু।"[১৩১]

সমাজে ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই ব্যভিচারের মতো জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকা সকল সমাজ ও সকল ধর্মে স্বীকৃত। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করে তা পরিহার করার প্রতি কড়াকড়ি আরোপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন−

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হবে না। কেননা এটি অশ্লীলতা ও মন্দ পন্থা।"[১৩২]

ড. আহমদ ওমর হাশেম বলেন, সম্মানহানি তথা যেনার অপরাধ মারাত্মক। এ রোগ সমাজে ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি এমন অপরাধ, যা আরো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে যেমন করে অবৈধ স্থানে জীবন-বারি সিঞ্চন করা হয়, তেমনিভাবে এ অপরাধের ফলে আগত সন্তানের জীবন নষ্ট করা হয়, তার বংশ ধ্বংস করা হয় এবং তাকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন থেকে বঞ্চিত করা হয়।[১৩৩]

---

১৩০. সূরা আল হুজুরাত : ১১।

১৩১. সূরা আল হুজুরাত : ১২।

১৩২. সূরা বনি ইসরাঈল : ৩২।

১৩৩. ড. আহমদ ওমর হাশিম, আল ইসলামু ওয়া ইকরারুল আমনি, (মিশর : ইসলামী গবেষণা সংস্থা) পৃ. ৫৫।

কারো প্রতি অপবাদ দেয়াকে ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষত কোনো সতী নারীর প্রতি অনৈতিকতার অপবাদ দেয়াকে ইসলাম জঘন্যতম পাপ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং অপবাদকারীকে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"আর যারা সতী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়, অতঃপর চার জন সাক্ষী হাজির করতে পারে না। তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর। আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারা হলো পাপাচারী।"[১৩৪]

রাসূল (স) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন–

عن ابى هريرة ﷺ عن النبى ﷺ قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বিরত থাক। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, জাদু করা, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল গ্রাস করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, অবলা মুমিন সতী-সাধ্বী নারীদের অপবাদ দেওয়া।"[১৩৫]

ইসলামে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। নারীর অধিকার, নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে।

২. নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতা

আল্লাহ তায়ালা বিবেক-বুদ্ধি প্রদানের মাধ্যমে মানবজাতিকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। জ্ঞান-বুদ্ধির উপস্থিতিতে শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়, এর মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারে। সুস্থ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য। রাসূল (স) বিবেকের মূল্য তুলে ধরে বলেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বিবেক সৃষ্টি করেছেন। তারপর বললেন, সামনে এসো। সে সামনে এলে তাকে বললেন। পেছনে যাও। সে পেছনে চলে গেল। তারপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমার চেয়ে মর্যাদাবান আর কিছুই সৃষ্টি করিনি। তোমার কারণে আমি জবাবদিহি করি, তোমার কারণে কল্যাণ দান করি, তোমার কারণে সাওয়াব দিই, তোমার কারণে শাস্তি দিই।

---

১৩৪. সূরা আন নূর : ২৪।

১৩৫. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, বাবু মা-জাআ ফিত্তাশদীদি ফী আকলি মালিল ইয়াতীম, হাদীস নং ২৮৭৪।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

"আমি জাহান্নামের জন্য অনেক মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে বটে। কিন্তু এর দ্বারা তারা কিছু উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে বটে। কিন্তু এর দ্বারা তারা দেখতে পায় না। তাদের কান আছে বটে। তবে এর দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা চতুষ্পদ পশুর মতো। বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই হলো উদাসীন।"[১৩৬]

উক্ত আয়াতের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে না লাগিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত, তারা আল্লাহর কাছে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

ইসলাম মানুষের জ্ঞান-বিবেককে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিয়েছে। তাদেরকে চতুষ্পার্শ্বের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছে। এতে সে আল্লাহর ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

"নিশ্চয় আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে, দিবারাত্রির পরিবর্তনে ও সমুদ্রে চলমান নৌযানের মাঝে মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় রয়েছে। আর আল্লাহ আসমান থেকে যে বৃষ্টি অবতরণ করেন, তা দ্বারা অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করেন এবং তিনি তাতে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন, বায়ুর চলাচল ও আসমান-জমিনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১৩৭]

স্বাধীনভাবে চিন্তা-গবেষণা করার এ উদাত্ত আহ্বান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নারীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাই সৎকাজের প্রতিদান কিংবা অসৎকাজের শাস্তি উভয়ই তারা পাবে, যেমন পুরুষরাও পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ.

"আমি তোমাদের কারও আমল বিফল বা নষ্ট করি না, সে নরই হোক আর নারীই হোক।"[১৩৮]

---

১৩৬. সূরা আল আরাফ : ১৭৯।

১৩৭. সূরা আল বাকারা : ১৬৪।

১৩৮. সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন–

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

"পুরুষই হোক আর নারীই হোক, যে-ই নেক কাজ করবে, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।"[১৩৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"পুরুষ অথবা নারী যে-ই হোক নেক কাজ করবে, সে যদি ঈমানদার হয়, তা হলে তাকে এ দুনিয়াতে সম্মানের সাথে জীবন-যাপন করাব। আর পরকালে তাদের কৃতকর্মের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দান করব।"[১৪০]

আরো এক স্থানে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"কেউ পাপাচারে লিপ্ত হলে সে তার কর্মের অনুরূপ সাজাই পাবে। আর নর ও নারীর মধ্যে থেকে যে-ই সৎকর্ম করবে, যে যদি মুমিন হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অফুরন্ত রিযিক দান করা হবে।"[১৪১]

মানুষের চারপাশের পরিবেশে অসংখ্য সৃষ্টি-উপাদান রয়েছে, যেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশ-প্রকৃতির এমনই কয়েকটি উপাদান নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশে গভীরভাবে চিন্তার পরোক্ষ আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

"তিনিই ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। আর এগুলোকে করেছেন জোড়া জোড়া। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই

১৩৯. সূরা আন নিসা : ১২৪।
১৪০. সূরা আন নাহল : ৯৭।
১৪১. সূরা আল মুমিন : ৪০।

গবেষকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ভূমির অংশ পরস্পর সংলগ্ন। এতে আছে আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত্রে একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ। ওদের একই পানি দেওয়া হয় এবং ফলের দিক দিয়ে কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।”[১৪২]

পবিত্র কুরআনে এরকম অসংখ্য আয়াতে সৃষ্টির নানা রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর ক্ষমতা বোঝার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বস্তুত তিনি বান্দার অন্তরকে জাগ্রত করতে এবং তার স্বভাবজাত অনুভূতিকে কাজে লাগাতে চান, যেন তারা আল্লাহর নেয়ামতরাজি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে স্বীয় বিবেক ও স্বভাবের পথ ধরে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে পারে এবং তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

যে কোনো ব্যক্তি চাই সে নারীই হোক কিংবা পুরুষ বিশুদ্ধচিত্তে সুগভীরভাবে যদি তার চারপাশের প্রকৃতি, বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য, জীবজগতের জীবনপ্রক্রিয়া এমনকি তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও চিন্তা-গবেষণা করে তবে মহান সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় সৃষ্টি-কুশলতার সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে সশ্রদ্ধে মাথা নত করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। এমনকি তোমাদের মাঝেও রয়েছে। তথাপি কি তোমরা ভেবে দেখবে না?[১৪৩]

আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বিবেকবানকে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তাঁর একত্ববাদকে তথা তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে স্বীকার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উপলব্ধি শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন– لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্ম গ্রহণে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ নেই।

কারণ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ অর্থাৎ, সত্য ও ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ড. আমীন রাশেদ বলেন, ইসলাম জোর করে কাউকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করেনি। মানুষকে তার অপছন্দের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বলেনি। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলক ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা হলে সেই ঈমান নড়বড়ে হয়ে থাকে।[১৪৪] বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করানো হলে তাতে ইসলামি আবেগ সৃষ্টি হয় না। যাকে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়, ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ অনুরূপ সৃষ্টি না হয়ে বরং বিপরীত ফল দেখা দেয়। যাকে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়, সে ইসলাম অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। কাজেই ধর্মীয় বিশ্বাস অন্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য এমন পরিবেশ দরকার, যেখানে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিস্বাধীনতার আবহ থাকবে। চিন্তার স্বাধীনতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাও থাকবে, যেন তা মন-মননের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

---

১৪২. সূরা আর রাদ : ৪।

১৪৩. সূরা আয-যারিয়াত : ২০-২১।

১৪৪. ড. আমীন রাশেদ, দিফাউন আনিল ইসলাম দাফউ শুবুহাতিন ওয়া দাহদু মুফতারায়াতিন, (মিশর : দারুন নাহদা, ১৯৮৭), পৃ. ২।

এ কারণে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কোনোরূপ জবরদস্তি ব্যতীত মানুষকে দ্বীন গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। ব্যক্তিকে সঠিক চিন্তা-ভাবনা সহকারে নিজের পছন্দ অনুযায়ী দ্বীন গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। কাজেই বিবেকের দাবির বিপরীত কাজ করতে ইসলাম বাধ্য করে না। বিশ্বাসের উপাদান তিনটি। যথা–

১. কোনোরূপ আবেগ-অনুরাগ, পূর্বে পোষণকৃত ধ্যান-ধারণা এবং কারো অন্ধ অনুসরণ ব্যতীত স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করা।

২. কোনো নির্দিষ্ট আকিদা-বিশ্বাস গ্রহণে জবরদস্তি না করা।

৩. আকিদা-বিশ্বাসের দাবি ও দ্বীন অনুযায়ী আমল করা।

ইসলাম এ তিনটি উপাদান রক্ষা করেছে এবং অনুকরণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে চিন্তা ভাবনা করা ও আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলির তত্ত্ব জানার আহ্বান জানিয়েছে।

৩. নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা

নিজের মত প্রকাশ করা যে কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার সমপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলামে পুরুষের ন্যায় নারীকেও তাদের মত প্রকাশের ও পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনেই ইসলাম তার মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

বিয়ে-শাদি, খোলা-তালাক ইত্যাদি নারীদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, কেনো ব্যক্তি কন্যার উপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। এসব বিষয়ে সব কিছুই করতে হবে তাদের মত, সম্মতি ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন–

لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

"বিবাহিতা নারীকে (বৈধব্য বা তালাকপ্রাপ্তির পর) তার পরামর্শ ছাড়া পুনরায় বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না।"[১৪৫]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে– لاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن.

"ইয়াতীম মেয়েদের সাথে পরামর্শ না করে তাদের বিয়ে দিও না।"

রাসূলে করীম (স) আরো বলেন– استشيروا النساء فى بناتهن.

"মহিলাদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।"[১৪৬]

মোটকথা, জীবনের যেসব ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, সে সব ব্যাপারে তো তাদের মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মহিলাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল নবী করীম (স)-এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি এবং স্থায়ী রীতি। এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র) বলেন–

كان النبى صلعم يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالتى يأخذ به.

---

১৪৫. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১১।

১৪৬. ইমাম আলী ইবনে উমার আদ দারে কুতনী, সুনান দারে কুতনী, (বৈরুত : দারু ইহইয়াত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

"রাসূলে করীম (স) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোনো কোনো সময় তারা এমন মতামত পেশ করত যা তিনি গ্রহণ করতেন।[১৪৭]

মহিলাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোনো বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে তাদের মতামত ও পরামর্শ নেয়া হতো। তাতে কোনো দিকই বাদ পড়ত না।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল এমন– 'এই বছর মুসলমানরা উমরা না করেই ফিরে যাবে।' তাই রাসূলে করীম (স) সাহাবীদেরকে হুদাইবিয়াতেই ইহরাম খুলে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। সন্ধির এই শর্তে সাহাবীগণ খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা নবী করীম (স)-এর নির্দেশ পালনে ইতস্তত করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) আফসোস করে ঘটনাটি হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট বললেন। তিনি সাহাবীদের মানসিকতা লক্ষ করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে রাসূলে করীম (স)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কাউকে কিছু না বলে যা কিছু করার নিজেই করতে শুরু করুন। তারপর দেখবেন তারা সবাই আপনার অনুসরণ করতে থাকবে। নবী (স) তা-ই করলেন। সাহাবীরা সবাই তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। সুতরাং উম্মে সালামা (রা)-এর পরামর্শে উপস্থিত অচলাবস্থার অবসান হলো।[১৪৮]

আরো একটি ঘটনা। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযা নামায পড়া হয়, ইসলামে প্রথম দিকে সেভাবে পড়া হতো না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খ্রিস্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখতে পান। তিনি এ নিয়মে জানাযা পড়ার পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[১৪৯]

রাসূলে করীম (স)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইবনে সিরীন হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন–

ان كان عمر ليستشير فى الامر حتى ان كان ليستشير المرءة فربما ابصر فى قولها او الشيء يستحسنه فيأخذه.

"হযরত উমর (রা) যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। এমনকি মহিলাদের সাথেও পরামর্শ করতেন। সেই পরামর্শে কোনো কল্যাণকর দিক দেখতে পেলে অথবা তাতে কোনো ভালো জিনিস থাকলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।"[১৫০]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র) হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা) সম্পর্কে বলেন–

اسلمت الشفاء قبل الهجرة فهى من المهاجرات وبايعت النبى صلعم وكانت من عقلاء النساء فضلاتهن وكان عمر يقدمها فى الرأي ويرضيها ويفضلها.

---

১৪৭. ইবনে কুতাইবা, ইয়ূনুল আখবার, ১ম খণ্ড, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৯৬), পৃ. ২৭।

১৪৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০; আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী, আররাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ : খাদিজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন : ১৯ বেকটিড রোড, ফরেস্ট গেইট, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ৩৮১।

১৪৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবু ইবনে সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির, ২০১০), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

১৫০. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

"শিফা (রা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে বাইয়াতও হয়েছিলেন। তিনি বিবেক-বুদ্ধি ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং অন্যদের তুলনায় বেশি মর্যাদা দিতেন।[১৫১]

প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থে হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও একই নীতি অনুসরণের বিবরণ দেখা যায়। এমনকি খলীফা নির্বাচনের সময়ে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। হযরত উসমানের পর কাকে খলীফা বানানো হবে এই মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ গোত্রের নেতা আহনাফ এ ব্যাপারে মতামত ও পরামর্শের জন্য হযরত তালহা (রা) হযরত যুবায়ের (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যান। তাঁরা তিন জনেই হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাইয়াত হন।[১৫২]

এককথায় বলা যায়, ইসলাম নর-নারীকে তাদের মত প্রকাশে সম অধিকার প্রদান করেছে।[১৫৩]

শুধু মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই নয় বরং অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (তোমরা অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বারণ করো)-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে সোনালি যুগের মুসলিম নারীগণ শাসক শ্রেণির লোকদের প্রতি প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দান করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এবং নিঃস্বার্থভাবে এ কাজ করতেন। সাধারণ জনতা তো বটেই, রাষ্ট্রের প্রশাসকরাও তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করতেন। তাঁদের সমালোচনাকে তারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এ দ্বারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতেন।

একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন, যা আমি চিরদিন সামনে রেখে চলতে পারি। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে নবী করীম (স)-এর বাণীটি লিখে পাঠালেন–

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس.

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকেন। মানুষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। মানুষ তখন তার সাথে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে থাকে।[১৫৪]

---

১৫১. আল্লামা ইবনে আবদুল বার, আল ইসতিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, (বৈরূত : দারুল জাইল, ২০১০), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬৮-৬৯।

১৫২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, ৫ম খণ্ড, (বৈরুত : দারুস সাওদায়েস, তা.বি.), পৃ. ১৯৭।

১৫৩. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Lahore : The Ahmadiyyah anjuman Isha'at Islam, 1950, p. 643.

১৫৪. মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, সুনান আত তিরমিযী, (বৈরূত দারুল গারব আল ইসলামী, ১৯৯৮), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৯; মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিব্বান, (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১।

একবার বিখ্যাত মহিলা সাহাবী খাওলা বিনতে ছালাবা (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-কে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়ে বললেন–

"হে উমর, আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছি। তুমি ডান্ডা হাতে নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখাতে। তখন তুমি খুব ছোট। তাই সবাই তোমাকে উমায়ের বলে ডাকত। এরপর যৌবনে উপনীত হলে লোকেরা তোমাকে উমর বলতে শুরু করল। এখন তুমি আমীরুল মু'মিনীন। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তোমাকে কোথায় থেকে কোথায় এনেছেন। জনসাধরণের সাথে কঠোর ব্যবহার কর না। আল্লাহকে ভয় কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাবকে ভয় করে, সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। যার মৃত্যুর ভয় আছে, সে বেপরোয়া জীবন-যাপন করতে পারে না। বরং সে সবসময় নেক আমল করার সুযোগ সন্ধান করে।"

জারুদ আবদী তখন হযরত উমর (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি খাওলাকে বললেন, তুমি তো দেখছি আমীরুল মু'মিনীনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপদেশ দিতে শুরু করেছ! হযরত উমর (রা) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে বলতে দাও। তুমি জান না, ইনি হলেন খাওলা বিনতে ছালাবা।[১৫৫]

কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুসলিম মহিলারা দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। একবার একজন মহিলা হযরত উমর (রা)-এর নিকট জনৈক সরকারি কর্মচারীর জুলুমের অভিযোগ করলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করার ফরমান পাঠিয়েছিলেন।[১৫৬]

৪. নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা

ইসলাম নারীকে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারীর প্রকৃতি, সমস্যা, সামর্থ্য, যোগ্যতা, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও বিবেচনাপ্রসূত দূরদর্শী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোনো নিরপেক্ষ গবেষণা প্রমাণ করে যে, নারী রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগ করে।

খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলাম নারীকে বলেনি যে, স্ত্রীলোকেরা মসজিদে চুপ করে থাকুক। কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি।

বাইবেল অদ্যবধিও গির্জায় নারীকে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেয়নি। বাইবেলে বলা হয়েছে–

.... স্ত্রীলোকেরা মন্ডলীতে চুপ করিয়া থাকুক, কারণ কথা বলিবার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নাই। ......[১৫৭]

খৃষ্টধর্ম অনুসারে বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকায় আরো বলা হয়েছে– Women were excluded from all public affairs.(জনসম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডে স্ত্রীলোকের অংশগৃহণ নিষিদ্ধ)।[১৫৮]

---

১৫৫. আল ইসতিয়াব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩১।
১৫৬. নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
১৫৭. ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ১৪ : ২৩।
১৫৮. ভলিউম ১৯, পৃ. ৯০৯, ১৯৭৫ সংস্করণ।

অথচ ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

অর্থাৎ, নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়ক, সমর্থক ও সাহায্যকারী। সহায়ক শুধু সামাজিকভাবেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও তারা একে অপরের সহায়ক। আসলে তাদেরও অধিকার আছে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করার।

ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে নারী জাতিকে ভোটাধিকার দিয়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। কুরআনে ইসলামের ইতিহাস ও এর অনেক নজির আমরা দেখতে পাই। নারীরা তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। খাওলা বিনতে সালাবা (রা) তাঁর স্বামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূলের সাথে বাদানুবাদ করেছিলেন। এ প্রেক্ষাপটেই কুরআনের সূরা মুজাদালার কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, নারীর অধিকার ও মর্যাদা আদায় করার জন্য আরো দেখা যায় যে, একজন নারী দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মত অগ্নিপুরুষের সাথে মসজিদে বিতর্ক করেছিলেন।[১৫৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[১৬০]

নারীদের থেকে আনুগত্যের শপথ বার বার নেয়া হয়েছিল, এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও তাদের কাছ থেকে শপথ নেয়া হয়েছিল। ডা. যাকির নায়েক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– আনুগত্যের শপথ করার অর্থ অঙ্গীকার করা এবং ভোট দেয়া। আনুগত্যের দ্বারা মেনে নেয়া বা মতামত প্রকাশ করা বর্তমানকালে ভোট দিয়ে নির্বাচন করার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিসংগত। হযরত মুহাম্মদ (সা) শুধু আল্লাহ পাকের রাসূলই ছিলেন না, তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানও ছিলেন। নারীদেরকে মতামত প্রকাশের অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার দেয়া হলো। হযরতকে মেনে নেয়ার

---

১৫৯. শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, নারী অধিকার, (ঢাকা : মাহবুব প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০০) পৃ. ২৫৫-২৫৬।
১৬০. সূরা আল মুমতাহিনা : ১২।

অধিকার পেয়ে নারীরা রাসূলরূপে হযরতের কাছে অঙ্গীকার করলেন (এবং রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁকে মেনে নিলেন) নারীরা বুঝতে পারলেন যে, তাদের মতামতেরও মূল্য আছে। তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণঅধিকার আছে। ইসলাম তাদেরকে মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। অর্থাৎ পদের প্রার্থী হিসেবে যোগ্য হলে "হ্যাঁ" এবং অযোগ্য হলে "না" বলা অধিকার আছে। কিন্তু এখানে 'না' বলার কোনো অবকাশ ছিল না। কারণ আল্লাহর নবীর চেয়ে যোগ্য ও সৎ মানুষ আর একজনও দুনিয়াতে নেই।

আলোচ্য আয়াতে নেতাকে মানার জন্য ভালো কাজকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ভালো কাজে নেতার অবাধ্যতা করা চলবে না। কোনো খারাপ কাজে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো কাজে কারো আনুগত্য করা চলবে না, জায়েয নয়। সুতরাং যারা আল্লাহর আদেশের বিপরীত কাজ করবে বলে যদি জানা যায়, তবে এমন প্রার্থীকে ভোট দেয়া জায়েয নেই।[১৬১]

নারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সংরক্ষণ করার জন্য অন্য নারীদের সমর্থনে তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। যেমন– আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) রাসূল (স)-এর দরবারে এসে বললেন–

হে আল্লাহর নবী! আমি মুসলমান নারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকটে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আপনাকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা নারীসমাজ আপনার উপর এবং আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা ঘরের কোনো পর্দার আড়ালে থেকে শুধু পুরুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকি, তাদের সন্তানদেরকে গর্ভে ধারণ করে থাকি। অথচ এসব সত্ত্বেও পুরুষরা অনেক সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে। তারা জুমার নামাযে শরীক হয়, জামাতে নামায আদায় করে, রোগীদের দেখাশুনা করে, জানাযায় শরীক হয়, হজের পর হজ করে, সর্বোপরি তারা জিহাদ করে থাকে। আর তারা যখন হজ-ওমরা করে বা জিহাদে গমন করে তখন আমরা তাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ করি, তাদের জন্য কাপড় বুনি, তাদের সন্তানসন্ততিদের লালন-পালন করে থাকি। আমরা কি সওয়াবের বেলায় পুরুষদের সমান অংশীদার হতে পারি না? মহানবী (সা) সাহাবাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি ধর্মের ব্যাপারে এই মহিলার চেয়ে উত্তম প্রশ্নকারী আর কাউকেও দেখেছ?

সাহাবীরা বললেন, একজন নারী যে এ রকম প্রশ্ন করতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

অতঃপর নবী (স) হযরত আসমার দিকে লক্ষ করে বললেন– মনোযোগ দিয়ে শুন, ভালো করে বুঝে নাও এবং যাদের প্রতিনিধি হয়ে তুমি এসেছ তাদেরকে গিয়ে বলো, স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি লাভ করা উল্লিখিত সমস্ত সওয়াবেরই সমুতুল্য। এ কথা শুনে হযরত আসমা আনন্দচিত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।[১৬২]

নারীকে ইসলাম যথার্থ ও সার্থক গণতন্ত্র চর্চার পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। হযরত উমর (রা)-এর শাসন আমলে, আরবদের প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানরা বিয়েতে মোটা অঙ্কের মহর ধার্য করতে শুরু করে দেয়। এতে যুবকরা বিয়ে করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। ওমর (রা) বিষয়টির প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ

---

১৬১. নারী অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
১৬২. নারী-অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

করলেন। মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনা এ ব্যাপারে কেমন হওয়া উচিত তার প্রতি তিনি দিক্‌নির্দেশনা দান করেন। তিনি মহরের সর্বোচ্চ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি একদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন– মুসলমানরা! বিয়েতে মোটা অঙ্কের মহর ধার্য করো না। কেননা, এই দুনিয়া সামান্যতম সম্মান ও গৌরবের বিষয় হলে এবং আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে এর কোনো গুরুত্ব থাকলে নবী করীম (সা) সকলের চেয়ে বেশি এরূপ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা মোটা অঙ্কের মহর ধার্য করতে পারতেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তিনি নিজের বিয়েতেও বারো ওকিয়ার (আউন্স) বেশি মহর ধার্য করেননি।

ওমর (রা)-এর এই বক্তব্য শুনে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পিছনের আসন থেকে দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের একটি আয়াত পাঠ করে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। আয়াতটি হলো–

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং মোহরানাস্বরূপ তাদেরকে বিপুল সম্পদ দিয়ে থাক তবে তার কিছুই নেবে না। তোমরা কি তা অপবাদ দিয়ে এবং স্পষ্ট পাপ করে (ফেরত) নিতে চাচ্ছ?[১৬৩]

মহিলাটি বললেন : আল্লাহ কুরআন শরীফে মহরের কোনো সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি। তা হলে উমর সীমা নির্ধারণ করার কে?

উমর (রা) উপস্থিত লোকদের সামনে বলতে বাধ্য হলেন যে, একজন নারীর দাবিই সত্য, ওমরের প্রস্তাব ভুল। হযরত ওমর (রা) আরো বললেন– সকলেই উমর অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী, এমনকি বৃদ্ধারাও। এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে কড়াকড়ি করা থেকে বিরত রইলেন।[১৬৪]

এই মহিলা ছিলেন একজন সাধারণ নারী। তিনি একজন বিখ্যাত মহিলা হলে নিশ্চয়ই তার নাম হাদীসে উল্লেখ থাকত। একজন সাধারণ মহিলা একজন রাষ্ট্র প্রধানের প্রস্তাবের উপর অনাস্থা আনতে পারে। এভাবে একজন সাধারণ নারী হয়ে অর্ধেক পৃথিবীর বাদশাহ, সিংহপুরুষ খলিফা হযরত উমরের উপর নিজের দাবিতে জয়ী হলেন।

কুরআন শরীফ হলো মুসলমান জাতির সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সকলের মতামত নিয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে ফেকাহবিদরা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতেন। যেহেতু এই নারী কুরআন শরীফ থেকে একটা দলিল হিসেবে পেশ করে ওমর (রা)-এর আনীত প্রস্তাব বা বিলের উপর অনাস্থা আনয়ন করলেন। এতে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম নারীকে আইন প্রণয়নেও অংশ নেয়ার অধিকার দিয়েছে।

উক্ত আলোচনায় সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, চির নির্যাতিত, অবহেলিত, মর্যাদা ও অধিকার বঞ্চিত নারীজাতিকে একমাত্র ইসলামই পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। কন্যা, স্ত্রী, মা গৃহকর্মী এবং সমাজ সদস্যা হিসেবে তাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রে এবং

---

১৬৩. সূরা আন নিসা : ২০।
১৬৪. নারী-অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

সকল ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের সম অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। নারীদের সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়েছে। নর-নারীর সম্পর্ক, সমতা এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করে পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিরাপত্তাহীনতা এবং পরাধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করে নারীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাধীন জীবন যাপনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদের নিয়ম-কানুন এবং পর্দার বিদান প্রবর্তন করে নারীর মান-সম্মান এবং শালীনতা সুনিশ্চিত করেছে। এককথায় নারী জাতির যা কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার ছিল, ইসলাম তাদেরকে তা পূর্ণমাত্রায় দান করেছে।

৫. নারীর শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা

ধর্ম-কর্ম-নর্ম, মানবজীবনের প্রধান তিনটি নিয়ামক। নারী-পুরুষ সকলে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু-সুন্দর উপায়ে ইহজীবনে ব্যক্তিক, সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জন করা। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে পুণ্যফল লাভের পূর্ণ আস্থা রাখা-উপযোগী দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের উপযুক্ত মানসিকতাও ইহজগতের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া কাম্য।

পুরুষের মতো নারীকেও ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলাম প্রয়োজনসাপেক্ষে সকল কাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানলাভের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা, চিকিৎসা, কারিগরি, রান্নাপ্রণালি, চারুকলা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যা নারীকে অর্জন করতে হবে। রাসূল (স)-এর যুগে এবং তৎপরবর্তী ইসলামী সোনালি যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

নিজের সন্তান অসুস্থ হলে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অবশ্যই মায়ের থাকা উচিত। মহিলা হাসপাতালে সেবা দেয়ার জন্য মহিলা ডাক্তার ও নার্সের প্রয়োজন। খাদ্যপুষ্টি ও রান্নাপ্রণালির জন্য রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। গৃহসজ্জা ও সুকুমারবৃত্তির জন্য চারুকলা বা ফাইন আর্টস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। কাজেই মহিলাদের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রও পুরুষদের মতোই বিস্তৃত। অবশ্য তা সবসময়ই প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, মাতৃজাতির সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষাসাপেক্ষে। এজন্য সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

নারী সাহাবীরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য-কাব্যও চর্চা করতেন। বিখ্যাত মহিলা সাহাবী কবি খানাসা (রা) সাহিত্য চর্চায় এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, বিদগ্ধ কবি লবীদও তাঁর অসামান্য কাব্য-প্রতিবার প্রতি সম্মান দেখাতেন। কাব্য-প্রতিভা ও আরব-ইতিহাস সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা স্বীকার করে হযরত উরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন–

ما رأيت احدا من الناس اعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة.

"আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা-বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখিনি।"[১৬৫]

---

১৬৫. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, ২০১০), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

আরবী কাব্য ও সাহিত্যে উরওয়া ইবনে যাবায়র (রা)-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করতেন।[১৬৬]

মূসা ইবনে তালহা বলেন– ما رأيت احدا افصح من عائشة "আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।"[১৬৭]

ধর্ম, কাব্য ও ইতিহাসের পাশাপাশি চিকিৎসা, গণিত প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

একবার ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমরা আপনার কাব্যপ্রতিভা ও বাগ্মিতা দেখে আমরা চমৎকৃত হই না। কারণ, আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাগ্মিতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কীভাবে শিখেছেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করত। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[১৬৮]

গণিত শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসয়ালা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[১৬৯]

রাসূল (স)-এর যুগে এবং সাহাবীদের যুগেও মুসলিম মহিলারা প্রয়োজনে ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, হস্তশিল্পও প্রস্তুত করতেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমার খালাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলেন। ইদ্দত পালনকালেই তিনি ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডাল কেটে এনে তা বিক্রি করার জন্য নবী করীম (স)-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন–

اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خيرا-

"বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়তো দান-খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোনো ভালো কাজও করতে পারবে।"[১৭০]

খাওলা বিনতে ছা'লাবার স্বামী একবার অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে বলে ফেললেন, আজ থেকে আমার কাছে তুমি আমার মায়ের মতো। পরে তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে জানার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যান। এ বিষয় সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই নবী করীম (স) নির্দেশ দিলেন যে, অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকবে। তার এ কথা শুনে স্ত্রী বলল–

يا رسول الله ما له من شيء وما ينفق عليه إلا أنا-

"হে আল্লাহর রাসূল, তার ব্যয়নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি ছাড়া তার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য আর কেউ নেই। কাজেই এ অবস্থায় সে কীভাবে জীবনযাপন করবে?"[১৭১]

---

১৬৬. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৬৭. আহমদ ইবনে হাজার আল আসকালানী, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬০।
১৬৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাকেম, আল মুসতাদরাক, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বর্ধিত সংস্করণ, ২০১০), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১।
১৬৯. প্রাগুক্ত।
১৭০. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

কায়লা নামের এক মহিলা সাহাবী রাসূল (স)-এর কাছে আরজ করলেন–

إني امرأة أبيع وأشترى-

আমি একজন মহিলা। আমি নানা রকমের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। অর্থাৎ আমি ব্যবসা করি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জেনে নিলেন।[১৭২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নিজের স্বামী এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি রাসূল (স)-এর নিকট এসে বললেন–

إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لى ولا لزوجي ولا لولدي شيء-

"আমি কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী একজন মহিলা। আমি কারুপণ্য বিক্রয় করি। এছাড়া আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। তিনি জানতে চাইলেন যে, তিনি কি তাদের জন্য এসব ব্যয় করতে পারবেন? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার এবং এজন্য তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারিণী হবে।"[১৭৩]

আমারা বিনতে তারীখ (রা) বলেন, একবার আমি দাসীকে সাথে নিয়ে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করে থলেতে রাখলাম। মাছের মাথা ও লেজ থলের বাইরে বেরিয়ে রইল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা) তা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম দিয়ে কিনেছেন? মাছটি তো বেশ বড় এবং সুন্দর। পরিবারের সবাই তৃপ্তির সাথে খেতে পারবে।[১৭৪]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে আসমা বিনতে মাখরা (রা)-কে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাত। তিনি ঐ আতরের ব্যবসা করতেন।[১৭৫]

সাহল ইবনে সা'দ (রা) আরেকজন মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। তার কৃষি জমি ছিল। তিনি তার জমির চার পাশে গাজরের চাষ করতেন। সাহল ইবনে সা'দ ও অন্য সাহাবীগণ জুমুআর দিন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁদেরকে গাজর ও আটার তৈরি একপ্রকার হালুয়া খেতে দিতেন।[১৭৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৈষয়িক সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষায় মুসলিম নারীদের সমান দখল ছিল। সুতরাং সকল যুগে প্রয়োজনসাপেক্ষে মুসলিম নারীদের আবশ্যিক বৈষয়িক শিক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা, আচরণবিধি ও পবিত্রতা রক্ষা অপরিহার্য। যেমনটি আমরা সোনালি যুগের মুসলিম রমণীদের ক্ষেত্রে দেখেছি।

আম্মাজান আয়েশা (রা), হাফসা (রা), উম্মে হাবীয়া (রা)-সহ নবীপত্নীগণ, হযরত আমারা (রা), খানাসা (রা), যয়নাব (রা), ফাতেমা (রা), সাইয়েদা যয়নব বিনতে আলী, রাবেয়া বসরিয়া (র), জোবায়দা, কারীমা, লুবনা উন্দুলুসি, যয়নাব বিনতে আহমদ আরওয়াযী, উমিয়া বাগদাদী, সুলতান রাজিয়া, যিবুন নিসা, বিনাতুন নিসা, খায়রুন নিসা, গুলবদন বানু, বেগম রোকেয়া, কবি ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

---

১৭২. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-২৫।
১৭৩. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১২।
১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।
১৭৫. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২।
১৭৬. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-২৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার মূল্যায়ন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষাকে ইসলাম গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। ইসলামে নারী জাতির শিক্ষাকে উপক্ষো করা হয়নি। শিক্ষার অধিকার নারী-পুরুষ সকলের সমান। এক্ষেত্রে ইসলাম ভেদ-বৈষম্যের প্রাচীর দাঁড় করায়নি। শিক্ষার প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। ঈমানের পূর্বশর্তই হলো জ্ঞান ও শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর সৃষ্ট জগতকে জানা-বোঝার নামই শিক্ষা। আর এ জানা-বোঝার মাধ্যমেই মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, অংশীদারহীনতা, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও কুদরত ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হবে। অতঃপর সেই উপলব্ধির মাধ্যমেই ঈমানের প্রতি মানুষের বিবেক তাড়িত হবে। এ উপলব্ধি জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঈমান-আকীদার মূলেই রয়েছে শিক্ষা। তাই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হলো শিক্ষা।

পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি হলো নারী। নারী হলো মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি অপরিহার্য উপাদান। শুধু তা-ই নয় নারী ও পুরুষ মিলে মানব-সভ্যতা এবং জগত-সংসার রচিত হয়েছে। মানব-সভ্যতার নির্মাণ কার্যের অর্ধেক হলো নারী। তাই নারীকে উপক্ষো করার মানে হবে অর্ধেক জনশক্তিকে উপক্ষো ও অকেজো করে দেওয়া।

নারী-শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। নারীর কোলজুড়ে আসে মানব বংশের উত্তরাধিকারীগণ। মাতৃক্রোড়ে শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। শিক্ষিত নারীই পারে শিক্ষিত উত্তরাধিকার গড়ে তুলতে।

অনৈসলামিক শক্তি অন্যান্য অপপ্রচারের মতো এক্ষেত্রেও একটি অপপ্রচার চালিয়ে থাকে এবং তারা বলে যে ইসলাম নারী-শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেছে, নারীদেরকে ইসলাম চার দেয়ালের মাঝে বন্দি করে রেখে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব তাদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচার মাত্র। ইসলাম কখনও নারী-শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেনি; বরং নারী-শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান কেবল ইসলাম রেখেছে ।

ইসলামের শাশ্বত বিধানমতে নারীর শিক্ষা হবে তাদের নিজস্ব উপযুক্ত পরিমণ্ডলে। শিক্ষার নামে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশা এবং সহশিক্ষার নামে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীদের নির্লজ্জবাদকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়নি। নারী-পুরুষ আলাদা পরিমণ্ডলে থেকে লেখাপড়া করবে। যখন এ সত্য কথা বলা হয়, তখন এক শ্রেণির লোকেরা একে অপব্যাখ্যা করে এবং একে নারী-শিক্ষার প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, সহশিক্ষার বিরোধিতা মানে নারী-শিক্ষার বিরোধিতা নয়।

ইসলামের সোনালি যুগে সাহাবায়ে কেরামের পাশাপাশি নারী সাহাবীগণ নবী (স)-এর কাছ থেকে পুণ্যময় ইসলামী জ্ঞান অর্জনে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা হাদীস, কুরআন, তাফসীর, আরবি সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (র)-এর মতো পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবী হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন– "আমরা (রাসূল স.-এর সাহাবীগণ) কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতাম। তাঁর কাছ থেকে আমরা ঐ সমস্যার সমাধান পেতাম।"

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখনিসৃত বাণী শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। তিনি রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষজন তাঁর নিকট থেকে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে। অনেক বিধি-নিষেধ ও শিষ্টাচার তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, শরিয়তের এক-চতুর্থাংশ হুকুম-আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষার নির্দেশ নারী-পুরুষ সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। তদ্রূপ শিক্ষাকে শুধু পুরুষের জন্যও বিশেষিত করা হয়নি। বরং শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো প্রভেদ রাখা হয়নি।

আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থ : 'তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে।'[১] এখানে اقرأ শব্দটি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে এসেছে– تعلموا العلم وعلموه الناس "তোমরা বিদ্যার্জন কর এবং মানুষদের তা শিক্ষা দাও।"[২] এখানেও تعلموا শব্দটি পুরুষবাচক যা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। সকল হাদীস বিশারদ, মুফাসসির ও ফকীহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসের সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– اقيموا الصلوة واتوا الزكوة অর্থ : তোমরা নামায পড় এবং যাকাত দাও।[৩] এখানে اقيموا ও اتوا দুটি ক্রিয়াপদই আদেশসূচক পুরুষবাচক। অথচ এ নির্দেশ নর ও নারী উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া নর-নারী উভয়ের জন্য ফরয।

অতএব, আলোচ্য নিবন্ধে নারীশিক্ষা সম্পৃক্ত আলোচনা কুরআন ও হাদীসের এরূপ সাধারণ নির্দেশাবলির ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

ক. শিক্ষা সম্পর্কে আল কুরআন

যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধির মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। অজানা বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। মানবকল্যাণে সে অনেক কিছু আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে। অতএব,

---

১. সূরা আল আলাক : ১।
২. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩২।
৩. সূরা আল বাকারা : ১১০।

আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টিরাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পাখি, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর মগজে আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম-সন্তানেরা তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে থাকে। শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর ।[৪] এ মর্মেই মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

"আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-কে সবকিছুর নামসমূহ শিক্ষা দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে তা পেশ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক; তা হলে আমার কাছে এ এসব জিনিসের নাম বল দেখি! ফেরেশতারা বললেন, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তার বাইরে আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।"[৫]

বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের আদেশ দান করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর, আর জেনে রাখ যে, তোমার প্রভু মহামহিম, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনি মানুষকে ঐসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"[৬]

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসূলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাঁদের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, হযরত মুহাম্মদ (স)। মহান আল্লাহ তাঁকে, কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচিও আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো, মানুষকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এ মর্মে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

---

৪. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৫. সূরা আল বাকারা : ৩১-৩২।
৬. সূরা আল আলাক : ১-৫।

"তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি উম্মী লোকদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেন।"[৭]

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (স)-কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন–

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

"এটা একটি কিতাব, যা আমি আপনার কাছে নাযিল করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, এর মাধ্যমে আপনি মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে আনবেন।"[৮]

নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য লেখাপড়া করা, বিদ্যা শিক্ষা করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা অপরিহার্য। কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সুতরাং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি, তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

"আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জ্ঞান দান করেন। যাকে জ্ঞান দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়ে থাকে।"[৯]

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর কুরআন নাযিল করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা বান্দার প্রতি তাঁর অপার করুণার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

الرَّحْمَنِ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْإِنسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"পরম করুণাময় আল্লাহ! তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে ভাষাও শিক্ষা দিয়েছেন।"[১০]

যারা বিদ্যা শিক্ষা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, কেবল তারাই সৃষ্টিরাজ্যের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। তারা অজানা বস্তুকে জানতে পারে। আর যারা বিদ্যা শিক্ষা করে না, তারা সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই বিদ্বান ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি কখনও সমান হতে পারে? বুদ্ধিমানেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"[১১]

---

৭. সূরা আল জুমু'আ : ২।
৮. সূরা আল ইবরাহীম : ১।
৯. সূরা আল বাকারা : ২৬৯।
১০. সূরা আর রহমান : ১-৪।

খ. শিক্ষা সম্পর্কে আল হাদীস

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন– طلب العلم فريضة على كل مسلم.

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয বা অপরিহার্য।"[১২]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তদ্দারা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।"[১৩]

একটি হাদীসে কুদসীতে আছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন–

من سلك مسلكا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة.

"যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দিই।"[১৪]

কাসীর ইবনে কায়েস (র) বলেন, হযরত আবু দারদা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলে কারীম (স)-কে বলতে শুনেছি–

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।"[১৫]

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

من طلب العلم فادركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان كفل من الأجر.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তা পেয়ে যায়, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। যদি সে তা না-ও পায়, তথাপি সে পূর্ণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।"[১৬]

হযরত মাখবারা আযদী (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

من طلب العلم كان له كفارة لما مضى.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, তার অতীতের গুনাহরাশি মাফ হয়ে যায়।"[১৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

كلمة الحكمة ضالة الحكيم- فحيث وجدها فهو احق بها.

"জ্ঞানপূর্ণ কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। অতএব, সে যেখানেই তা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[১৮]

---

১১. সূরা আয যুমার : ৯।
১২. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল কাযবীনী, সুনান ইবনে মাজাহ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০১০), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
১৩. আহমদ ইবনে হোসাইন আল বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, বাবু ফী তালাবিল ইলম, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।
১৪. শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।
১৫. শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।
১৬. সুনানুদ দারেমী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
১৭. সুনান তিরমিযী, (সৌদি আরব : দারুল মুগনী, প্রথম প্রকাশ ২০০০), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩।
১৮. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন– من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

“মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি ‘ইলম’ দান করেন।”[১৯]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع.

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই থাকে, যতক্ষণ না (সে তার বাসগৃহে) ফিরে আসে।”[২০]

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

نعم الرجل الفقيه فى الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه.

“ধর্মবিষয়ক জ্ঞানী ব্যক্তি কতই না উত্তম! যদি কেউ তাঁর শরণাপন্ন হয়, তবে তিনি তার উপকার করেন। আর কেউ তাঁর সাহায্য না চাইলেও তিনি নিজেই তো কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।”[২১]

নারীদের উচ্চশিক্ষা লাভে ইসলামের দিক নির্দেশনা

শিক্ষাকে আরবী ভাষায় ‘ইলম’ বলা হয়। ‘ইলম’ অর্থ জ্ঞান, বিশ্বাস, কোনো জিনিসকে তথ্যসহকারে জানা ইত্যাদি। ‘ইলম’ চার প্রকার। ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ ও হারাম। ফরয আবার দু প্রকার, ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। যা নর ও নারী প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য, তা হলো ফরযে আইন। যেমন ঈমান, নামায, রোযা প্রভৃতির ‘ইলম’। বালেগ হওয়ার পরই প্রত্যেকের জন্য কালেমা ও ঈমান-সম্পর্কীয় জরুরি বিষয়গুলোর ‘ইলম’ অর্জন করা ফরয। অতঃপর যখনই দ্বীনের যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক হবে, তখন সে বিষয়ের ‘ইলম’ লাভ করা ফরয। আর যে ‘ইলম’ অনেকের মধ্য থেকে কতক লোকে শিক্ষা করলেই চলে, তা ফরযে কিফায়া। যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান বের করার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের ওপর ব্যাপক ‘ইলম’ লাভ করা। এছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে সকল বিদ্যার প্রয়োজন, তা অর্জন করাও ফরযে কিফায়া। যেমন চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি আবশ্যকীয় শিল্প, ইত্যাদি বিদ্যা। আবার ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এমন বিদ্যার ক্ষেত্রে সময়, সুযোগ ও সুবিধা থাকলে আবশ্যিকতা দেখা দেয়ার পূর্বেই সে সম্পর্কে ইলম অর্জন করা মুস্তাহাব। আর যে বিদ্যার মধ্যে ভালো দিকও নেই, মন্দ দিকও নেই, তা অর্জন করা মুবাহ। আর যে সমস্ত বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে, তা অর্জন করা হারাম। যেমন– যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি ইত্যাদি।[২২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

العلم ثلثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل.

“বিদ্যা তিন প্রকার। ১. আয়াতে মুহকামাহ অর্থাৎ কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানাবলি। ২. সুন্নাতে কায়েমাহ। অর্থাৎ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাতসমূহ। ৩. ফরীযায়ে আদিলাহ। অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদি। এছাড়া অন্যান্য বিদ্যা অতিরিক্ত।[২৩]

---

১৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬।
২০. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩।
২১. আবু সুজা আদ-দায়লামী, আল-ফিরদাউস, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৮৬), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১।
২২. মেশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২৩. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

ইলম বলতে এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা উদ্দেশ্য। 'ইলম' শব্দটি আলামত থেকে নির্গত। আলামত বলতে الدلالة ও الاشارة-কে বুঝানো হয়। 'দালালাহ' শব্দের অর্থ হলো– কোনো বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝানো। আর 'ইশারাহ' শব্দের অর্থ হলো– কোনো জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা। পরিভাষায় ইলম দ্বারা ইসলাম-সম্পর্কিত জ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে জরুরি 'ইলম' অর্জন না করে কোনো ব্যক্তি ইসলাম পালন করতে পারে না। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না।[২৪]

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে মুসলিম চিন্তাবিদদের অভিমত

ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং পুরুষের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীর শিক্ষা-দীক্ষাকেও তদ্রূপ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবেয়ীসহ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রসহ ধর্মীয় আচারাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। উভয়ের অধিকার সমান।[২৫]

নবী করীম (স)-এর কাছ থেকে পুরুষগণ যেমন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত, নারীগণও তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করত। তবে নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হতো এবং সেই সময়ে তারা নবী (স)-এর নিকট থেকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতো। নবী (স)-এর সহধর্মিণীগণ বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবী করীম (স) আদেশ করেছেন।

অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকার-প্রকৃতিতে পার্থক্য অনিবার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, যা এই ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন, যা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপরও কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়, তা হলে ইসলাম তার মোটেও পথে প্রতিবন্ধক নয়। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থাতেই সে শরীয়তে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চশিক্ষা লাভে ব্রতী হতে হবে।[২৬]

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে যেমন– হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে ওমর প্রমুখ (রা)। তাবেয়ীগণের মধ্যে

---

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস শরীফ, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৯৭।
২৫. নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ০৪৩-৪৬।
২৬. পর্দা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৫।

যেমন– হযরত হাসান বসরী, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মোহাম্মদ ইবনে সীরিন, ইমাম যয়নুল আবেদীন প্রমুখ (র)। তাবে তাবেয়ীনের মধ্যে যেমন– সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মাসরুক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম জা'ফর সাদেক প্রমুখ (র)। মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেমন ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, হারেস মোহাসেবী প্রমুখ (র)। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যেমন– ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, দারা কুতনী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, আবু দাউদ প্রমুখ (র)। মাশায়েখের মধ্যে যেমন– হযরত জোনায়েদ বাগদাদী, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, ইমাম গাজালী, ইমাম শা'রানী, মুঈনুদ্দীন চিশতী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ (র) মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, হযরত কারীমা বিনতে মিকদাদ, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) ও হযরত রাবেয়া বসরী (র)-এর মতো মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন ও জাতির খেদমতের উদ্দেশ্যে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎরূপে জাতির সেবায় ব্রতী হতে পারে।[২৭]

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূলে কারীম (স) থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি নারী সাহাবীগণও নিঃসংকোচে 'ফিকহ্ ফিদ্দীন' অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী মুফতী। হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা, হযরত হাফসা (রা) প্রমুখ নারী সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

عن أبى موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ﷺ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما

"আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।"[২৮]

বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবাত্মার মধ্যে সুপ্ত ও লুক্কায়িত মৌলিক জ্ঞানকে বিকশিত করা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর দুনিয়ায় আর কোনো নবী আসবেন না। উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমদের মাধ্যমেই কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দীন জারি থাকবে। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীন জারি রাখা। এছাড়া মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের যাবতীয় নেয়ামত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতির বিপুল সম্পদ আবিষ্কার করে সেগুলোকে তাদের ব্যবহারোপযোগী করতে পেরেছে। বলাবাহুল্য প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বিদ্যাশিক্ষা ও

২৭. নবী (স)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯-৮১।
২৮. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭।

জ্ঞানচর্চারই অবদান। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনকে সুখী, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ করা।[২৯]

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারীজাতিকে কেবল সুযোগই দেয়নি বরং তাদের জন্যও বিদ্যার্জনকে আবশ্যক (ফরয) ঘোষণা করেছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী করীম (স)-এর নিকট 'ইলমে দীন' শিক্ষা লাভ করত, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইলমে দীন শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। নবী করীম (স) ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায় এনেছেন, যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারীশিক্ষার জন্য ইসলামে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগেও নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে নারীদের মধ্যে বড় বড় বিদুষী, বিজ্ঞানী ও হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত উম্মে দারদা, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের 'ইলমী' যোগ্যতা ও ইসলামী আইন সম্পর্কে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির কথা তাবাকাতে ইবনে সাদ ও মুসনাদে আহমদে পাওয়া যায়।

হযরত অমিয়া বাগদাদী নামের এক মহিলা মদীনাতে ইমাম মালেক (র)-এর নিকট ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও তাসাউফের বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। "মাদখাল" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ওলী ও ইমামের জন্ম হয়, যাঁদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দুর্লভ।

বর্তমানে পুরুষদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে, পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মতো মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষাপদ্ধতি থাকা দরকার। উপমহাদেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিদগ্ধ আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন– "এ সকল ফেতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।" সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম-বিরোধী তথা মানবতা-বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরীয়তের নীতি অনুসারে মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো একান্ত দরকার।[৩০]

নবী করীম (স)-এর যুগে নারীশিক্ষা

মহানবী (স) যখন একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যস্ত, তখন মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো যে, কোনো মহিলা যদি এ সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হতে চায়, তা হলে তার কাছ থেকে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে–

---

২৯. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আখলাকে ইসলাম, (ঢাকা : পুস্তক ঘর, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ৫৯ এবং ৯৮; মাওলানা এ. কে এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামের নারী ও মানবাধিকার, (ঢাকা : মা প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯১।

৩০. মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী, উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব, (ঢাকা : আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৩৪-৩৬।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"হে নবী! ঈমানদার মহিলারা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জেনেশুনে অপবাদ রটাবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তা হলে আপনি তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[৩১]

এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তারা কোনো সৎকাজে রাসূলে করীম (স)-এর অবাধ্য হবে না। এ কথাটি দ্বারা তাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

মহান আল্লাহ নবী করীম (স)-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞানচর্চার নির্দেশ দান করে বলেন–

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.

"তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা পঠিত হয়, তোমরা তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।"[৩২]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে নারীসমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত থাকত। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারত না।

আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين.

"আনসারী মহিলারা কতই-না ভালো। দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরমও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।"[৩৩]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নের উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়–

كانت تنزل علينا الاية فى عهد رسول الله ﷺ فنحفظ حلالها وحرامها وامرها وزاجرها ولا نحفظها.

"নবী করীম (স)-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ করে রাখার মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলোকে স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[৩৪]

---

৩১. সূরা আল মুমতাহিনা : ১২।
৩২. সূরা আল আহযাব : ৩৪।
৩৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।
৩৪. ইবনে আবদি রাব্বিহি, আল-ইকদুল ফরীদ, (মিশর : মাতবায়াতু লাজনাতিত তালীক, ১৯৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

ইবাদত ও জ্ঞান-চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করত। খাওলা বিনতে কায়েস আল জাহনিয়া (রা) নবী করীম (স)-এর সুউচ্চ কণ্ঠের কথা উল্লেখ করে বলেন–

كنت أسمع خطبة رسول الله ﷺ يوم الجمعة وأنا فى مؤخر النساء.

"জুমুয়ার দিনে আমি নবী (স)-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[৩৫]

হারিসা ইবনে নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেন–

ما حفظت ق الا من في رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমুয়ার খুতবাতে এটি পড়তেন।"[৩৬]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (স) নিজেও বিশেষ লক্ষ রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায়নি, তা হলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন–

فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة.

"তিনি (রাসূল স.) মনে করলেন যে, তিনি তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"[৩৭]

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী করীম (স) সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে–

قال النساء للنبي ﷺ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوم نفسك فوعدهن يوما يأتيهن فيه فوعظهن وأمرهن.

"মহিলারা নবী করীম (স)-কে বলল, আপনার কাছে (প্রতিদিনই) পুরুষদের আধিক্য থাকে। তাই আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী (স) তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।"[৩৮]

অনেক সময় নবী করীম (স) মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠাতেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, মদিনায় এসে রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্র করে নসীহত করার জন্য হযরত উমর (রা)-কে পাঠালেন। তারপর তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরাও তাঁর সালামের জবাব দিলাম। এরপর তিনি বললেন–

---

৩৫. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৩৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫।

৩৭. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম, (ঢাকা : এশা রাহনুমা, সাইন্স ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮), পৃ. ৭২-৭৬।

৩৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن وأمرنا بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا. ونهانا عن اتباع الجنائز.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তিনি আমাদের যুবতী এমনকি ঋতুমতী মেয়েদেরকেও দু'ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে, আমাদের জন্য জুমার নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করলেন।"[৩৯]

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষালয় হলো বাসগৃহ। তাই পিতামাতা কন্যাদেরকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখাবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইসলাম এ দিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৪০]

হযরত আলী (রা) এ আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন–

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم.

"তোমরা নিজেরা শিক্ষালাভ কর এবং পরিবারকেও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং আদব-কায়েদা শিক্ষা দাও।"[৪১]

মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (স)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন–

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم.

"তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[৪২]

সাহাবীদের যুগে নারীশিক্ষা

নবী করীম (স)-এর তিরোধানের পর সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন, তাতে পুরুষদের সাথে নারীরাও থাকত।

আয়েযা নামের জনৈক মহিলা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বলেন–

رأيت ابن مسعود يوصى الرجال والنساء ويقول من أدرك منكم من امرأة أو رجل فليستمسك الاول.

---

৩৯. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
৪০. সূরা আত তাহরীম : ৬।
৪১. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, (দারু ইবনে কাসীর, ২০১০), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।
৪২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই ফেতনার যুগের মুখোমুখী হবে, সে যেন নবী (স)-এর সাহাবীদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।"[৪৩]

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনার ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল, এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়াল। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন সেই জগতে তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

হযরত আয়েশা (রা)-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন–

ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة.

"আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল-হারাম, কাব্য-সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা-বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর কাউকে দেখিনি।"[৪৪]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[৪৫]

মূসা ইবনে তালহা বলেন– ما رأيت أحدا افصح من عائشة.

"আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।"[৪৬]

লোকজন হযরত আয়েশা (রা)-এর কাব্য ও সাহিত্য-বিষয়ক জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা-বিষয়ক অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মিতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ, আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাগ্মিতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা-বিদ্যা কীভাবে শিখেছেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করত। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[৪৭]

গণিত-শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসয়ালা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৪৮]

আমারা বিনতে আব্দুর রহমানও হযরত আয়েশা (রা)-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে হাযম হাম্বলী (র) নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন–

الفقيهة الفاضلة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية نشأت فى حجر عائشة فأكثرت الرواية عنها وهى العدل الضابطة لما يؤخذ عنها.

---

৪৩. সুনান দারেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৪৪. তাযকিরাতুল হুফফাজ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।
৪৫. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
৪৬. আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬০।
৪৭. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১।
৪৮. প্রাগুক্ত।

বিজ্ঞ ফিকহবিদ আমারা বিনতে আব্দুর রহমান মহিলা আনসারী ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর নিকট থেকে তিনি অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন বলে তাঁর বর্ণিত হাদীসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।[৪৯]

ইবনে হাব্বান (র) তাঁর সম্পর্কে লিখছেন– كانت من أعلم الناس بحديث عائشة.

"তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।"[৫০]

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র) ইমাম যুহরীকে (র) বললেন, আমি তোমার মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা লক্ষ করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী (র) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, 'আমারা বিনতে আবদুর রহমানের মজলিস কখনো ত্যাগ করো না। কারণ, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমারা বিনতে আবদুর রহমানের খিদমতে হাজির হয়ে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[৫১]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উম্মে সালামা (রা) সম্পর্কে লিখেছেন–

كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب.

"উম্মে সালামা (রা) পরমা সুন্দরী হওয়ার পাশাপাশি পরিপক্ব বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকারিণী ছিলেন।"[৫২]

হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কন্যা যয়নব (রা) সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার (র) বলেন–

كان من أفقه أهل زمانها.

"তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন।"[৫৩]

আবু রাফে' সায়িগ (র) বলেন–

كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة.

"যখনই আমি ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদিনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যয়নব বিনতে আবু সালামার কথা মনে পড়ে যায়।"[৫৪]

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহত করতেন।[৫৫]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) সম্পর্কে ইমাম নববী (র) বলেন– كانت عاقلة من عقلاء النساء.

"তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারিণী একজন মহিলা ছিলেন।"[৫৬]

---

৪৯. আবদুল হাই আল হাম্বলী, শাজারাতুয যাহাব, (বৈরুত : আল মাকতাবাতুত তিজারী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪।
৫০. ইবনে হাজার আল আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.) ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৯।
৫১. তাযকিরাতুল হুফফাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
৫২. আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।
৫৩. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৫৫।
৫৪. আল ইসাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
৫৫. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।
৫৬. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, (মিশর : ইদারাতুত তারআতিল মুনীরিয়াহ, তা. বি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

হযরত আবু দারদা (রা)-এর স্ত্রী উম্মু দারদা (রা)-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ে ছিল যে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর আমলকে সহীহ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণস্বরূপ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন–

كانت أم الدرداء تجلس فى صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة.

"উম্মু দারদা (রা) নামাযে পুরুষের মতো করে বসতেন। তিনি ফকীহ ছিলেন।"[৫৭]

كانت من فضلاء النساء وعقلائهن وذوات الرأي منهن مع العبادة والنسك.

"তিনি মহিলাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী বলে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার ও মুত্তাকী।"[৫৮]

ইমাম নববী (র) বলেন, তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেন–

واتفقوا على اوصافها بالفقه والعقل والفهم والجلالة.

"তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।"[৫৯]

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসয়ালার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত উমর ও হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ফাতিমা বিনতে কায়েসের মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) লিখেছেন–

كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.

"তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।"[৬০]

হযরত আনাস (রা)-এর মা উম্মে সুলাইম (রা) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন–

ومناقبها كثيرة شهيرة.

"তাঁর মর্যাদা ও গুণ অসংখ্য। তা সর্বজনবিদিত।"[৬১]

তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র) বলেন– كانت من فاضلات الصحابيات.

"তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী একজন মহিলা সাহাবী।"[৬২]

হযরত উম্মে আতিয়া (রা) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র) লিখেছেন–

وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات منهن مع رسول الله ﷺ.

---

৫৭. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
৫৮. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩৫।
৫৯. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।
৬১. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২।
৬২. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

"তিনি উচ্চমর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছিলেন।"[৬৩]

হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়া (রা)-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বারো বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাশিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন–

ما أذكرت أحدا أفضله على حفصة.

"আমি এমন কোনো লোক দেখিনি, যাকে আমি হাফসা বিনতে সিরীনের ওপর প্রাধান্য দিতে পারি।"[৬৪]

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন সাঈদ-তনয়া তার স্বামীকে লক্ষ করে বলল–

اجلس أعلمك علم سعيد.

"আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন, তা আমিই আপনাকে শিখিয়ে দেব।"[৬৫]

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রকে বলতেন–

ارجع فالغلط معك.

"তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।"[৬৬]

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একটি মাসয়ালা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়াকুব নামক বনী ইসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন–

لقد قرأت ما في المصحف فما وجدته.

"আমি পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসয়ালা বর্ণনা করলেন, তা কোথাও পাইনি।"[৬৭]

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নারীদের অবদান

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টির বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক্‌নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র) বলেন–

والذين حفظت عنهم الفتاوى من أصحاب رسول الله ﷺ مأة ونيف وثلاثون نفسا من بين رجل وامرأة.

রাসূলে করীম (স)-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে, তাঁদের সংখ্যা এক শ ত্রিশের কিছু বেশি হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

---

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।
৬৪. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।
৬৫. ইবনুল হাজ্জ, আল মাদখাল, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।
৬৬. প্রাগুক্ত।
৬৭. সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।

তাঁদের মধ্যে আবার সাত জনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশি যে, আল্লামা ইবনে হাযম (র)-এর মতে তাঁদের ফতোয়াগুলোকে পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাত জনের মধ্যে হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতো ব্যক্তিত্বের সাথে হযরত আয়েশা (রা)-ও আছেন।

ফতোয়াদানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর মতো মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়াদানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীর মধ্যে হযরত হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা), হযরত আবু যার (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে হযরত উম্মে আতিয়া (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে হাবীবা (রা), হযরত সাফিয়া (রা), লায়লা বিনতে কায়েস (রা), আসমা বিনতে আবু বকর (রা), উম্মে শরীফ (রা), খাওলা বিনতে আওতীত (রা), উম্মে দারদা (রা), হযরত মায়মূনা (রা), হযরত ফাতিমা (রা), ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা), যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা (রা), উম্মে আয়মান (রা), উম্মে ইউসুফ (রা) প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[৬৮]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, কাছের-দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর এসব মহীয়সী নারীরা তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করত, আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা বুঝা যায়। তিনি বলেন–

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে লোকজন আসত।"[৬৯]

হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) অনেক সময় হযরত উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়ের সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফেজ ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-ও ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার দুই শ দশটি। হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আনাস (রা) ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[৭০]

হযরত আবূ মুসা আশয়ারী (রা)-এর মতো পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতো আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন–

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ﷺ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.

---

৬৮. ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওজিয়া, ইলামুল মুয়াককিয়ীন, (কুর্দ : মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হি:), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১১।

৬৯. ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৪), পৃ. ৩৮২।

৭০. শাজারাতুয যাহাব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

"আমরা অর্থাৎ, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।"[৭১]

মদিনার বিখ্যাত ফকীহ উরওয়া ইবনে যুবায়ের ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রা) সম্পর্কে ইবনে হাযম হাম্বলী (র) লিখেছেন।

كانا من الاخذين عن عائشة الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها.

"যারা হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন, এঁরা দু'জনও (ওরওয়া ও কাসেম) তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা)-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না। বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকেই মাসয়ালা উদ্ভাবন করতেন।"[৭২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন–

وقد حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده قريبا خمسين سنة - فأكثر الناس أخذوا عنها ونقلوا عنها من الأحكام والاداب شيئا كثيرا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها.

"হযরত আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী (স)-এর ইনতিকালের পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। ফলে অগণিত মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ বিধানাবলি তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।"[৭৩]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) অন্য এক স্থানে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী আটাশি জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তি ছাড়াও বিপুলসংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল 'আস (রা), আবু মুসা আশয়ারী (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর মতো রাজনীতিবিদ সাহাবী এবং আবু হুরায়রা (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর মতো মুহাদ্দিস ও ফকীহ সাহাবী। এঁদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়িবের মতো খ্যাতনামা তাবেয়ী ও আলকামা ইবনে কায়েসের মতো নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[৭৪]

হযরত আয়েশা (রা)-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) বলেন–

لو جمع علم الناس كلهم وعلم أزواج النبي ﷺ فكانت عائشة أوسعها علما.

"যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবী করীম (স)-এর অন্যান্য পত্নীর জ্ঞান একত্র করা হয়, তা হলে এককভাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞানের পরিধি হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।"[৭৫]

---

৭১. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭।
৭২. শাজারাতুয যাহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৭৩. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৩।
৭৪. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।
৭৫. আল ইসতিয়াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; নিয়ায ফতেহপুরী, আস সাহাবীয়াত, অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মহিলা সাহাবী, (ঢাকা : আল ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ৬৩।

ইমাম যুহরী (র) অন্যত্র বলেছেন–

كانت عائشة أعلم الناس يسئلها الأكابر من أصحاب النبي ﷺ.

“আয়েশা (রা) সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী করীম (স)-এর বড় বড় সাহাবীও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।”[৭৬]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা হলো– “অন্য সাহাবায়ে কেরামের মোকাবেলায় হযরত আয়েশা (রা)-এর ভিন্নমতসমূহ।” কিতাবের নাম দিয়েছেন– আল ইজাবাহ লিঈরাদি মুস্তাদরাকাতহু আয়িশা আলাস সাহাবাহ। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব বিষয় সংকলিত করেছি, যে ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা নিজ মতের ভিত্তিতে অন্যদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলেমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলেমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আবাবস (রা) এবং এঁদের মতো ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী (রা)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা) বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা উনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

‘আল ইজাবাহ’ কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলেম সাঈদ আল-আফগানী বলেছেন, “আমি কয়েক বছর যাবৎ হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনসংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি, যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মতো। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মধ্যে যে জ্ঞানেরই সংস্থান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ-তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে রীতিমতো হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্বতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স আঠারো বছর অতিক্রম করেনি।”[৭৭]

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রা)-এর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মুসলিম উম্মাহ কী পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন– হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদিনায় গিয়ে হযরত সাফিয়া (রা)-এর খিদমতে হাজির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর নিকট বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

---

৭৬. আত তাবাকাত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মাওলানা সাঈদ আনসারী ও মাওলানা আবদুস সালাম নদভী, হায়াতুস সাহাবীয়াত, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল ওয়াহাব, মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ, (ঢাকা : নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, চকবাজার, তা. বি.), পৃ. ৪৮।

৭৭. আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ, ১ম খণ্ড, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মুনয়েম, আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মাওলানা মুনওয়ার হোসাইন, (ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ষ্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল অব ইসলামিক থট্‌স, ১৯৯৫), পৃ. ২৬৩

এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এভাবে কত জায়গার কত মানুষ যে তাঁর নিকট থেকে শত শত মাসয়ালা জেনে নিয়েছে, তার সীমা নেই।[৭৮]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশ জন রাবীর নাম-ধাম বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন– এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সব বর্ণনাকারীর মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় শ্রেণির লোকই রয়েছেন।[৭৯]

মারওয়ানের একটি জরুরি বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেন–

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي ﷺ.

"নবী করীম (স)-এর পবিত্র পত্নীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কীভাবে? তাই তিনি লোক মারফত হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সমাধান করে দেন।"[৮০]

সাহাবীগণের 'ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী করীম (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন–

وقد كانت الصحابة يختلفون فى الشيء فتروى لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي ﷺ شيئا فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له.

"সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী করীম (স) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।"[৮১]

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওয়ায (রা) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসয়ালা জানার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কখনো কখনো তাঁর নিকট হাজির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[৮২] হযরত রুবায়্যি নবী করীম (স) থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, নাফে', উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) প্রমুখ রয়েছেন।[৮৩]

ফাতেমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা), উরওয়া

---

৭৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

৭৯. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।

৮০. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭; ইবনে হিশা, আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, (মিশর : দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৯০) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

৮১. ইবনুল কাইয়্যুম আল জাওজিয়া, যাদুল মা'আদ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২২১।

৮২. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩৭।

৮৩. আল্লামা ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৪৫২।

ইবনে যুবায়ের (রা) ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা)-এর মতো সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সালমান বিন ইয়াসির ও শা'বীর মতো উচ্চ মর্যাদার তাবেয়ীগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।[৮৪]

হযরত উম্মে আতিয়া (রা) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। ইলম ও ফযীলতের দিক থেকে তিনি অতি উঁচু মর্তবায় সমাসীন ছিলেন। তিনি একচল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াতের দিক দিয়ে তাঁকে পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্যে চতুর্থ তবকায় গণ্য করেছেন। মাইয়্যিতের গোসল দেয়া, মহিলাদের জানাযায় যাওয়া এবং ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীস বিশেষ গুরুত্ব রাখে।[৮৫]

উম্মে আতিয়া (রা) সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র) লিখেছেন–

وشهدت غسل ابنة رسول الله ﷺ وحكت ذلك واتقنت وحديثها أصل في غسل الميت- وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ولها عن النبي ﷺ أحاديث روى عنها أنس بن مالك ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين.

"তিনি রাসূলে করীম (স)-এর কন্যার (মৃত্যু পরবর্তী) গোসল দেয়াতে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা ও বসরার তাবেয়ী আলেমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার বিধান বর্ণনা করেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন ও হাফসা বিনতে সিরীন (রা) রাসূল (স)-এর বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[৮৬]

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা (রা)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালেক, আইয়ূব সাখতিয়ানী ও হাকাম ইবনে উতায়বার মতো ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[৮৭]

ইমাম শাফেয়ী (র) হযরত হাসান (রা)-এর নাতনি সাইয়েদা নাফিসা (র)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৮৮]

---

৮৪. তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।
৮৫. তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।
৮৬. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪৭।
৮৭. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।
৮৮. ওয়াফায়াতুল আইয়ান, (মিশর : আল মাতবাআতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী শিক্ষায় আধুনিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে এমন কিছু স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই। যেমন– মানুষের স্বভাবের মধ্যে সম্পদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও মোহ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (তোমরা সম্পদকে অধিক ভালোবেসে থাক)।[৮৯]

তবে আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে কিছু নীতি আরোপ করেছেন। বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনকে হালাল করেছেন এবং অবৈধ পন্থা যেমন– চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি পন্থায় সম্পদ অর্জনকে হারাম করেছেন।
মহান আল্লাহ মানুষকে খাবার ও পানীয়ের প্রতি চাহিদা ও ঝোঁক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শূকর, কুকুর ও হিংস্র পশুর গোশত অবৈধ করেছেন।

সহশিক্ষার অবক্ষয় ও তার প্রতিকার

মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ আর নারীর মধ্যে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ দান করেছেন।
জান্নাতে হযরত আদম (আ)-কে আবাসন দান করার পর তিনি আল্লাহপ্রদত্ত বিচিত্র আনন্দ ও বিলাস-সামগ্রী উপভোগ করতে থাকেন। কিন্তু নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসব আরাম-আয়েশের উপকরণ তাঁর জন্য আনন্দকর হয়নি, সেখানে তিনি স্বস্তিবোধ করেননি। আল্লাহ তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য সঙ্গীরূপে অন্য কোনো প্রাণী নির্বাচন করেননি। বরং তাঁর জন্য নারীকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা একে অন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়। তবে দুই শ্রেণির মধ্যে বৈধতার একটি সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন, যা তারা কোনোভাবে লঙ্ঘন করতে পারবে না। তাই নারী-পুরুষের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না।
পেট্রোল ও আগুন পাশাপাশি রেখে পোড়ানোকে ঠেকিয়ে রাখা এবং লৌহচূর্ণ ও চুম্বকদণ্ড পাশাপাশি রেখে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণকে বাধাগ্রস্ত করা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি কোনো যুবক-যুবতী যুগলকে যদি অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের সুযোগ করে দিয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তবে তাও অসম্ভব হবে। এরূপ নিষেধাজ্ঞা কখনো কাজে আসে না। অতএব সহশিক্ষা বহাল থাকলে প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা বলতে গেলে মোটেও সম্ভব নয়।
সহশিক্ষা-ব্যবস্থা মানবজাতির যে ক্ষতি করেছে, তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯০] অবশ্য নীতি-নৈতিকতার মান ভালো থাকায় একটা সময়ে সহশিক্ষা চরম অবক্ষয়ের জন্য দায়ী না থাকলেও বর্তমানে অতঃপতনের যুগে নীতি-নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের কারণে একে অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়ে থাকে।

---

৮৯. সূরা আল ফাজর : ২০।
৯০. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, পৃ. ১৬৮।

সহশিক্ষার বদৌলতে পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ থাকায় একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি।

তাই এ ক্ষতি, ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সহশিক্ষার পরিবর্তে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করাই শ্রেয়।[৯১]

সহাবস্থানের প্রকার

নারী-পুরুষের সহাবস্থান তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে–

ক. রক্তসম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে নারীর সহাবস্থান
খ. অন্যদের সাথে অসৎ উদ্দেশ্যে নারীর সহাবস্থান
গ. শিক্ষাঙ্গন, দোকানপাট, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, সভাসমাবেশ ইত্যাদিতে নারীর সহাবস্থান।

উক্ত তিন প্রকারের প্রথম প্রকার সহাবস্থান বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এবং দ্বিতীয় প্রকার সহাবস্থান অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

তৃতীয় প্রকার সহাবস্থান অবৈধ হওয়ার বিষয়টি ইসলাম সমর্থন করে না। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো–

ক. কুরআনের প্রমাণ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ .

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। এটাই তাদের পবিত্র থাকার জন্য অধিকতর সহায়ক। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।"[৯২]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে পরনারী-পুরুষকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সহাবস্থানের দ্বারা কু-দৃষ্টিপাতের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

তাই সহাবস্থান হলো পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং তদ্‌পেক্ষা জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অবলম্বন।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"এ ছাড়া তারা যেন নিজেদের ঢেকে রাখা সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে– এমনভাবে নিজেদের পা না ফেলে (অর্থাৎ জোরে জোরে না হাঁটে)। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও।"[৯৩]

---

৯১. মোসাম্মত কবিতা সুলতানা, ধন্য আমি নারী, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৭৫-৮০।
৯২. সূরা আন নূর : ৩০-৩১।
৯৩. সূরা আন নূর : ৩১।

উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে নারীকে নূপুরধ্বনির ঝঙ্কারসহ না হাঁটার জন্য বলা হয়েছে। কারণ, নূপুরধ্বনি দ্বারা পুরুষের অন্তরে নারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে নারীকে পুরুষের সামনে স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। কারণ নারী ও তার সৌন্দর্য পুরুষের কু-প্রবৃত্তিকে আন্দোলিত করে। আর সহাবস্থানের ক্ষেত্রে নূপুরধ্বনি এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

يٰـاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের গায়ে আবরণ টেনে দেয় (সারা শরীর আচ্ছাদিত রাখে)। এতে তাদের (সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে) পরিচিত হতে সুবিধা হবে এবং উত্যক্ত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"[৯৪]

রমণীর লজ্জা ও লাজুকতা অটুট রাখার জন্য এবং ইভটিজিং[৯৫] থেকে সুরক্ষার জন্য উক্ত আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পুরো দেহ আচ্ছাদনকারী মার্জিত ও শালীন পোশাক পরিধান করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ, রাসূল (স) বলেছেন– إذا لم تستحى فاصنع ما شئت "যখন তোমার লজ্জা-লাজুকতা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার"।[৯৬]

নারী বা পুরুষের লজ্জার সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ লজ্জাহীন হয়ে পড়লে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনার সব ঘাটে অবতরণ করতে পারে। তখন নানা অপরাধ-কর্মে জড়িয়ে পড়তে ন্যূনতম বাধা অবশিষ্ট থাকে না। নারী ও পুরুষের সহাবস্থানের কারণে লজ্জা এবং লাজুকতার আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব সহাবস্থানের ভয়াবহতা অপরিসীম।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَـاعًا فَسْـئَلُوْهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ؕ

"তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছে কোনো জিনিস চাইলে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এতে তোমাদের মন ও তাদের মন অধিকতর পবিত্র থাকবে।"[৯৭]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রথমত আবু বকর (রা), ওমর (রা)-সহ সাহাবীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা ছিলেন আমাদের তুলনায় হাজারো গুণ বেশি পবিত্র আত্মার অধিকারী। অথচ তাদেরকেও নবী (স)-এর স্ত্রী বা অন্য নারীদের সাথে কোনো প্রকার বস্তু আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হিজাব অর্থাৎ পর্দা রক্ষা করার নির্দেশ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের ভিন্ন অবস্থান অটুট রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

---

৯৪. সূরা আল আহযাব : ৫৯।

৯৫. ইভটিজিং প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নিগ্রহ নির্দেশক একটি কাব্যিক শব্দ যা মূলত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে ব্যবহৃত হয়। ইভ দিয়ে পৌরাণিক আদিমাতা হাওয়া অর্থে সমগ্র নারীজাতিকে বোঝানো হয়। [https://en wikipedia.org]

৯৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০৪।

৯৭. সূরা আল আহযাব : ৫৩।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ

"আর যখন তিনি (মুসা আ.) মাদইয়ানের পানির (কূপের) কাছে গেলেন তখন সেখানে দেখলেন, একদল লোক (তাদের পশুদেরকে) পানি পান করাচ্ছে। তাদের পাশেই দু'জন মহিলাকেও দেখলেন, যারা (তাদের পশুগুলোকে) সরিয়ে রাখছে। তিনি মহিলাদ্বয়কে বললেন, "তোমাদের ব্যাপার কী?" তারা বলল, (আমরা আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ না রাখালেরা (তাদের পশুদেরকে) বের করে নেয়। আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ।" তিনি তখন তাদের হয়ে (তাদের পশুদেরকে) পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর সে ছায়ার দিকে চলে গেলেন এবং বললেন, প্রভু! তুমি আমাকে যে কল্যাণই দাও না কেন আমি তার অভাবী (আমি তোমার যে কোনো দানেরই মুখাপেক্ষী)। অতঃপর মহিলাদ্বয়ের (দুই বোনের) একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তার কাছে এল এবং বলল, "আপনি যে আমাদের হয়ে (আমাদের পশুদের) পানি পান করিয়েছেন, তার পুরস্কার দিতে আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন।"[৯৮]

উক্ত আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়–

ক. মহিলাদ্বয় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছিল। পুরুষের সাথে তাদের সহাবস্থান ছিল না। কারণ, আয়াতে বলা হয়েছে وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ (আর তাদের পাশেই তিনি দু'জন মহিলাকেও দেখলেন, যারা [তাদের পশুদেরকে] সরিয়ে রাখছে)।

খ. আয়াতের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদ্বয় পুরুষদের সহাবস্থানের প্রতি ন্যূনতম আগ্রহী ছিল না। আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে– لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ (আমরা [আমাদের পশুগুলোকে] পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ না রাখালেরা [তাদের পশুদেরকে] বের করে নেয়)।

গ. মহিলাদ্বয় বিনা প্রয়োজনে কাজের উদ্দেশ্যে বাহিরে গমন করেননি। বরং তীব্র প্রয়োজনের কারণে এবং বিকল্প উপায় না থাকার কারণে বের হয়েছিলেন। তাই তাদের উক্তি ছিল– وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (আর আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ লোক)। অর্থাৎ পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে এবং অন্য কোনো পুরুষ লোক না থাকার কারণে বের হয়েছিলেন।

ঘ. প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে গমন করার ক্ষেত্রে মহিলারা যথাসম্ভব মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কারণ এ ক্ষেত্রে ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদ থাকা সহজ।

---

৯৮. সূরা আল ক্বাসাস : ২৩-২৫।

বেগানা পুরুষ ও মহিলার সহাবস্থান মোটেও গ্রহণীয় নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَ بْوٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط

"সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সেই মহিলাটি তাকে (কুকর্মে) প্ররোচিত করল এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, এদিকে এসো।"[৯৯]

বাদশার স্ত্রী বংশীয় আভিজাত্য, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, সম্পদের প্রাচুর্য এবং রূপ-লাবণ্যে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়ির চাকরের সাথে সহাবস্থানের কারণে তার সঙ্গে প্রবল ঘনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। একপর্যায়ে মহিলাটি বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে চূড়ান্ত কামনার প্রস্তাব করে বলেছিল– هيت لك (এদিকে এসো)।

খ. হাদীসের প্রমাণ

لايخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان.

"কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়। কারণ, এরূপ করলে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি থাকে শয়তান।"[১০০]

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

"কোনো পুরুষ যেন মাহরাম (এমন লোক যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া কোনো নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়।"[১০১]

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

"মহিলা হলো লজ্জার পাত্র। সুতরাং যখন সে বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।"[১০২]

لا تدخلوا المساجد من باب النساء.

"তোমরা মহিলাদের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করো না।"[১০৩]

ان عمر بن الخطاب كان ينهى ان يدخل من باب النساء.

"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মহিলাদের দরজা দিয়ে (পুরুষদেরকে মসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।"[১০৪]

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.

"তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে গমন করা থেকে বাধা প্রদান করো না। তবে তারা যেন সাজসজ্জামুক্ত অবস্থায় (মসজিদে) গমন করে।"[১০৫]

---

৯৯. সূরা ইউসুফ : ২৩।
১০০. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১।
১০১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪।
১০২. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।
১০৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।
১০৪. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

اذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.

"তোমাদের মধ্য থেকে কোনো মহিলা মসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।"[১০৬]

إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان.

"আল্লাহর নিকট মহিলার সর্বাধিক উত্তম নামায হলো স্বীয় গৃহের সর্বাধিক অন্ধকারস্থলে আদায়কৃত নামায।"[১০৭]

صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلوتها في حجرتها وصلوتها في مخدعها أفضل من صلوتها في بيتها

"নারীর জন্য তার শয়নকক্ষে নামায পড়া অন্য কোনো সাধারণ কক্ষে নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তার শয়নকক্ষের নিভৃত প্রকোষ্ঠে নামায পড়া শয়নকক্ষের অন্যসব স্থানে নামায পড়া থেকে উত্তম।"[১০৮]

خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها.

"পুরুষদের উত্তম সারি হলো প্রথম সারি আর নিকৃষ্ট সারি হলো শেষ সারি। মহিলাদের উত্তম সারি হলো শেষ সারি আর নিকৃষ্ট সারি হলো প্রথম সারি।"[১০৯]

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষের সহাবস্থান কোনোভাবেই কাম্য নয়। একারণে নামায ও হজের মতো ইবাদত পালন করার সময়ও নারী-পুরুষের সহাবস্থানের উল্টো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অথচ নামায বা হজ পালনের সময় মানুষ একান্তভাবে আল্লাহর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে। প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপ পথে তাড়িত করতে পারে না। কারণ, নামায ও হজের বিধানাবলি পালন করার সময় ব্যক্তিগত কোনো কাজ বা পরিকল্পনা করা, কল্পনা করা, মনোযোগ অন্য দিকে যায় ইত্যাকার বিষয়ের কোনো সুযোগ নেই। তাই তো রাসূল (স) যখন ফজরের নামায শেষে সালাম ফেরাতেন তখন মহিলারা স্বীয় গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন অপর দিকে রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ স্বস্থানে স্থিরভাবে বসে থাকতেন। রাসূল (স) ও সাহাবীগণ গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করার পূর্বে মহিলা সাহাবীগণ স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন। এভাবে নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ এড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া রাসূল (স) ছোট বাচ্চাদের শয্যা পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে বলেন–

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

"তোমরা সাত বছর বয়সে তোমাদের শিশুদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করো। আর শিশুদের বয়স দশ হয়ে গেলে নামাযের জন্য প্রহার করো এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।"[১১০]

হাদীসের মধ্যে শিশু হওয়া সত্ত্বেও এবং সহোদর হওয়া সত্ত্বেও পুত্র ও কন্যা সন্তানের শয্যা পৃথক করার নির্দেশ প্রদান করার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীয়তে কোনোভাবেই নারী-পুরুষের সহাবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১০৫. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।
১০৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
১০৭. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে খুযাইমা, (মিসর : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ২০০৩), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৬।
১০৮. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।
১০৯. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।
১১০. সুনান আবু দাউদ, প্রগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কর্মক্ষেত্রসহ সব জায়গাতে সহাবস্থানের ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই ভয়াবহতার মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গবেষণা এবং জরিপ চালিয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সহাবস্থানের ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে। তাই এখানে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।

পাশ্চাত্য গবেষণায় প্রাপ্ত সহাবস্থানজনিত সমস্যাবলি

ব্রিটেনের সহশিক্ষা স্কুল ও স্বতন্ত্র (Single-Sex) স্কুলের একটা জরিপ প্রকাশ করা হয়েছিল। জরিপে বলা হয়েছে যে, ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক (স্বতন্ত্র) স্কুল সহশিক্ষা স্কুল থেকে উৎকৃষ্ট। উভয় ধরনের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। শিক্ষকরা মন্তব্য করেছেন যে, স্বতন্ত্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সহশিক্ষা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে অধ্যয়নে বেশি মনোযোগী। অথচ ছাত্র-ছাত্রীরা Single-Sex স্কুলের চেয়ে সহশিক্ষা স্কুলে লেখাপড়া করার প্রতি বেশি আগ্রহী। কারণ অবশ্য অনেকেরই জানা আছে যে, বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবাধ মেলামেশার আকর্ষণ একটা স্বভাবজাত বিষয়।

ঐ জরিপে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সহশিক্ষা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিপরীত লিঙ্গের প্রিয় হতে এবং তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য বেশি সময় ব্যয় করে। অধ্যয়নের প্রতি বেশি মনোযোগ না থাকার কারণে সহশিক্ষা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের প্রশ্নের উগ্র ও চটপটে উত্তর দেয়। তারা স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করার জন্য কম সময় ব্যয় করে অথচ ডেটিং করার কাজে বেশি সময় নষ্ট করে। জরিপের শেষ কথা হলো এই যে, ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দেশে বেশি বেশি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করার চিন্তা-ভাবনা করছে।[১১১]

সহশিক্ষার কারণে লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ নিম্নের দিকে যাচ্ছে। আর অবৈধ প্রেম ও নোংরামির হিড়িক পড়ে যাচ্ছে।[১১২]

কানাডার উন্তারু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা বুনী ফেয়ার বলেন, সহশিক্ষাব্যবস্থা মহিলাদেরকে সাম্য ও সমানাধিকারের শ্লোগান দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। অথচ বাস্তব সত্য হলো নারী-পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক্‌করণের দ্বারাই কেবল সাম্য রক্ষা করা সম্ভব। কারণ, নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেরই কিছু স্বকীয়তা আছে। আর পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উক্ত স্বকীয়তার সুফল ভোগ করা তুলনামূলক অনেক সহজ। পক্ষান্তরে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষরা উক্ত সুবিধা বেশি ভোগ করতে পারে।[১১৩]

অধ্যাপিকা নানসি বিডি ১৯৯৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আমেরিকান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সফলতার উৎস নিয়ে তুলনামূলক গবেষণায় বলেন, সাফল্যের রহস্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত। বর্তমানে এ ধরনের বিদ্যালয়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে তিনি গবেষণার মাত্রা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন।[১১৪]

সম্ভবত এধরনের গবেষণা শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যে কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর বিট ওয়েলসন নিশ্চিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার দশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে নিউইয়র্ক,

---

১১১. নারী অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
১১২. নারী অধিকার, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৩।
১১৩. মুহাম্মদ সিদ্দিকী, দৈনিক জারিদাতুর রায়িল আম্ম, কুয়েত ২৯ জুলাই, ২০০২ খ্রি.।
১১৪. দৈনিক জারিদাতুল ওয়াতান কুয়েত : ১২ জুন, ২০০০ খ্রি.।

ক্যালিফোর্নিয়াসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি পর্যায় থেকে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান তৈরিতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।[১১৫]

আমেরিকার উইস্কনসিনে অবস্থিত নরবোর্ট কলেজের অধ্যাপিকা আমেলি লানদুন উক্ত দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তুলনামূলক গবেষণা চালিয়ে বলেন, উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে ডিগ্রিধারী সাবেক ছাত্রদেরকে পূর্বের প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করা হলে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫২% ছাত্র এবং সহশিক্ষাব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৩৮% ছাত্র সাবেক প্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে সম্মতি জানায়।[১১৬]

মুসলিম গবেষণায় প্রাপ্ত সহশিক্ষার সমস্যাবলি

সহাবস্থানের ফলাফল নির্ণয়ে আরব এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে মাঠপর্যায়ে জরিপ চালানো হয়েছে। সেই জরিপের সকল ফলাফল জানা সম্ভব হয়নি। বরং কোনো কোনোটির ফলাফল জানা সম্ভব হয়েছে। তাই নিম্নে সেসব জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হলো–

জর্দানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মুসলিম তরুণীদের সহশিক্ষা-বিষয়ক সমস্যার প্রভাব গবেষণা করেছেন ফাতেমা মুহাম্মদ রাজা মুনাসেরা।

উক্ত গবেষণার ফলাফল নিম্নরূপ :

ক. নৈতিক সমস্যা। যথা–

১. কলহ সৃষ্টি হয়।
২. নারী ও পুরুষদের উভয় পক্ষ থেকে কৃত্রিম আচরণ প্রকাশ পায়।
৩. তরুণ কর্তৃক তরুণীদের হয়রানির শিকার হয়।
৪. পাপকর্মে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ধর্মীয় বাধা দুর্বল হয়ে যায়।
৫. ছাত্রীদের হিজাবহীন অবস্থায় বা অতি পাতলা পোশাক পরে বের হওয়ার কারণে অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনার প্রবণতা বাড়তে থাকে।
৬. ব্যভিচারের মতো জঘন্যতম নৈতিক অপরাধসমূহের বিস্তার ঘটে।
৭. নারী-পুরুষ উভয়ের নৈতিক অবক্ষয় হয়।

খ. শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা

১. শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানকালে আলোচনার স্বাধীনতা থাকে না। স্বীয় প্রেমিক বা প্রেমিকার সামনে নিজ অদক্ষতা ও দুর্বলতা ফাঁস হয়ে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে পাঠ্যবিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রতি অনীহা থাকে।
২. শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রীর প্রতি সমীহ প্রদর্শন করে।
৩. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেম-ভালোবাসার সুবাদে সময় নষ্ট করার কারণে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে এবং ক্লাসে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অবহেলা করে।

---

১১৫. দৈনিক জারিদাতুস সিয়ামাহ : ২ অক্টবর, ২০০১ খ্রি.।
১১৬. দৈনিক জারিদাতুস সিয়ামাহ : ২০ নভেম্বর, ২০০০ খ্রি.।

৪. গুরুগম্ভীর কোনো কাজ সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়কে যেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে নেয়।

৬. একে অপরকে নিয়ে অতি চিন্তাভাবনা করার মধ্যে সময় নষ্ট করে।

৭. পড়াশোনায় দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

গ. অর্থনৈতিক সমস্যা

১. ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরস্পর বদান্যতা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা হয়। যে কারণে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অসৎ উপায়ে আয় করার পথ বের করে।

২. উভয় প্রকারের শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছেদের পিছনে বেশি অর্থ ব্যয় করে।

ঘ. সামাজিক সমস্যা

১. সমাজে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায়। যে কারণে নারী প্রদর্শনযোগ্য পণ্যরূপে বিবেচিত হয়।

২. তৃতীয় কোনো অবিবাহিত/অবিবাহিতা শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় থাকার সুবাদে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৩. যুবসমাজ বিবাহ এড়িয়ে চলে এবং অবৈধ সম্পর্ক রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ. মানসিক সমস্যা

১. একজনের দুর্বলতা অপরজনের সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করে।

২. যুবকের হৃদয়ে মানসিক চাপ বিরাজ করে।

তা ছাড়া সহাবস্থান নিম্নোক্ত উপায়ে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে বাধা হয়ে থাকে–

১. অন্যের উপহাসের পাত্র হওয়ার ভয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকে।

২. পরস্পর আড্ডায় সময় নষ্ট করার কারণে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে।

৩. ভুল হয়ে যাওয়ার ভয়ে বক্তব্যে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

৪. ক্লাসে ছাত্রী উপস্থিত থাকার কারণে শিক্ষক কর্তৃক লাজুকতাবশত অনেক বিষয়ের স্পষ্ট আলোচনা এড়িয়ে চলে।

৫. শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

৬. পাঠদানকারী মহিলা হওয়ায় ছাত্রদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। এভাবে শিক্ষার মান দুর্বল হতে থাকে।[১১৭]

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সহাবস্থানের প্রভাব

বিভিন্ন গবেষণায় ছাত্র-ছাত্রীদের সহাবস্থানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

১. **একে অন্যকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করার কল্পনা :** যদি কোনো ছাত্র কোনো ছাত্রীর পাশে বসতে পারে, তা হলে তার বিশেষ ভাবনা ও কল্পনা থাকে কীভাবে সে তাকে আকর্ষণ করবে, মন জয় করবে। বিশেষত ছাত্রী সুন্দরী হলে এরূপ হবেই।

---

১১৭. ফাতিমা রেজা মুনাসিরা, আসারু মুশকিলাতাইল ইখতিলাতি ওয়াল মিনহাজিত তালিমিয়্যিাহ আলা তালীমিল ফাতাতিল মুসলিমাতি ফিল জামিয়াতিল উরদুনিয়্যাহ, (মুলতাকা আহলিল হাদীস, নভেম্বর ২০১১), পৃ. ৩২-৪৬।

মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগকৃত জরিপ, যা ১৯৫৬ সনের ৩০ মার্চে আল মুসাউয়ার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, ৬৫% শিক্ষার্থী বলেছে সহাবস্থান তাদের পড়াশোনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কারণ তারা তাদের অবসর সময়ের চার ভাগের তিন ভাগ প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে ব্যয় করে। আর একারণে কর্তৃপক্ষ মেয়েদের জন্যে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার মতামত ব্যক্ত করে।[১১৮]

মিসরের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের জনৈকা কর্মকর্তা আসমা ফাহমী আমেরিকা সফর থেকে এসে বলেন– আমেরিকান নাগরিকগণ মনে করেন যে, সহাবস্থানের কারণে তরুণীরা পড়াশোনার চেয়ে পোশাক ও প্রসাধনীর প্রতি বেশি যত্নবান। যদি তরুণরা না থাকত, তা হলে তরুণীরা এরূপ করত না।[১১৯]

পনেরো বছর বয়সী তরুণী দিরদার মাক বলেছে, আমরা পড়াশোনার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের প্রত্যাশী ছিলাম। কারণ আমাদের সাথে তরুণরা থাকলে ভয় পেতাম এবং সুন্দর পোশাক ও প্রসাধনী ব্যবহার করতে হতো। আর বর্তমানে শুধু মেয়েলি পরিবেশে থাকার কারণে তুলনামূলক বেশি স্বস্তি অনুভব করছি।[১২০]

২. **পুরুষ কর্তৃক মেয়েলি বেশ ধারণ এবং মহিলা কর্তৃক ছেলেদের স্বভাব গ্রহণ করা :** যখন শিক্ষার্থীরা পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের সাথে সহাবস্থান করে তখন একজন অপরজনের গুণাগুণ ও চরিত্র গ্রহণ করে। বিশেষত ফিলিপাইনে এ ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষ কিছু শিক্ষক নিয়োগদানের ইচ্ছা করেছে, যারা ছাত্রদেরকে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করার পরিবর্তে পুরুষদের পোশাক পরিধান করতে প্রশিক্ষণ দেবে।[১২১]

৩. **মেধার মান কমে যাওয়া :** ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ও ব্রিটেনে একটি গবেষণা ও জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপে প্রমাণ হয়েছে যে, সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী। তাই ব্রিটিশ সরকার সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক পৃথক শ্রেণিকক্ষের আয়োজন করতে উৎসাহিত করার ইচ্ছা করেছে।[১২২]

৪. **সৃজনশীলতা দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং প্রতিভা সীমিত হয়ে যাওয়া :** জার্মানির বুন নগরীতে মনোবিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালিত জরিপে প্রমাণিত হয়েছে যে, সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা দুর্বল এবং প্রতিভার পরিধি সীমিত। পক্ষান্তরে যেসব প্রতিষ্ঠানে কেবল এক লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে তাদের মেধাশক্তি ও সৃজনশীলতা বেশি।[১২৩]

৫. **ভালো ফলাফল লাভে অন্তরায় হওয়া :** জার্মানির কিল ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত জরিপে জানা গেছে যে, এসএসসির ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষ ছাত্রীদের থেকে পৃথক করার পর পড়াশোনায় ভালো ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। অভিন্ন শ্রেণিকক্ষ থাকা অবস্থায় পড়াশোনার যা মান ছিল, শ্রেণিকক্ষ পৃথক করার পর তার চেয়ে চারগুণ বেশি

---

১১৮. ফুয়াদ আব্দুল কারীম, কাদায়াল মারআতি ফিল মু'তামিরাতিদ দুয়ালিয়্যাহ, পৃ. ৫৪২, www. Islamland.com/.../ar-Women Issues at international conferences

১১৯. শায়খ আহমদ মুহাম্মদ জামাল (র), মাকানাকে তুহমাদী, (মিসর : দারু ইহয়াউল উলূম, জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৯১।

১২০. প্রগুক্ত, পৃ. ৮৭,

১২১. শায়খ আলী ত্বানত্বাভী, যিকরায়াত (সৌদি আরব : দারুল মানারাহ, ১৯৮২ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

১২২. মুহাম্মদ সাঈদ মাবিদ, ইলা গাইরিল মুহাজ্জাবাতি আওয়ালান, (রিয়াদ : মাকতাবুর রাইয়ান, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৯১

১২৩. দৈনিক জারিদাতুল ওয়াতান, কুয়েত : ১২ জুন, ২০০০ খ্রি.।

ভালো হয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রেণিকক্ষ আলাদা করার পর মেয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফলও অতীতের চেয়ে ভালো হয়েছে।[১২৪]

৬. **দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের শিকার হওয়া :** আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন থেকে প্রকাশিত ১৯৮৮ সনের জরিপে জানা গেছে যে, অভিন্ন শ্রেণিকক্ষে মার্কিন তরুণীরা খুব বেশি দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, আত্মহত্যার শিকার হয়ে থাকে।

৭. **প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা শেষ করে দেয়া :**জার্মানির শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ড. কারলি শুসতার[১২৫] উল্লেখ করেন যে, শিক্ষালয়ে এক লিঙ্গের শিক্ষার্থী থাকলে পড়াশোনায় ভালো করার মানসিকতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে সহশিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয়।[১২৬]

৮. **মেয়ে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়া :** সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ষণ ও অপহরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যৌন হয়রানি রোধের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির সর্বোচ্চ শাস্তি প্রয়োগের জন্য নতুন আইন পাস করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে একথা প্রমাণ করে যে, তাদের সহশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির বিস্তার ঘটছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আরো প্রকাশ করেছে যে, সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীরা ছাত্র কর্তৃক যতটা যৌন হয়রানির শিকার হয় তার চেয়ে বেশি তারা শিক্ষক কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার হয়।[১২৭]

৯. **লিঙ্গভেদে বৈষম্য করা :** সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্য করে ছাত্রদের সাথে স্বজনপ্রীতি করা হয়ে থাকে। প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ, শিক্ষাবৃত্তিলাভসহ যাবতীয় সুযোগ ও সুবিধা ছাত্রদের কল্যাণে হয়ে থাকে।[১২৮]

১০. **শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া :** যৌন হয়রানি বা অপহরণ, ধর্ষণ, অধিকার, বৈষম্য ইত্যাকার অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়ে অনেক ছাত্রী শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে ধর্ষণের শিকার হওয়ায় অনেক ছাত্রী পুনরায় বিদ্যালয়ে যেতে নারাজ। কারণ ধর্ষণ ও অপহরণের মতো জঘন্য ঘটনা অহরহ ঘটছে।

১১. **ছাত্রীদের লাজুকতা হ্রাস পাওয়া :** দুবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি অনুষদের ছাত্র আহমদ মুস্তফা বলেন যে, আমার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় সবচেয়ে নেতিবাচক দিক হলো সহাবস্থান। যে কারণে ছাত্রীরা লাজুকতা হারাচ্ছে। প্রেম, ভালোবাসা, বিবাহ, তালাকের মতো বিষয়ে ছাত্রীরা প্রকাশ্যে মুখ খুলছে। মোটকথা, সহাবস্থান ও সহশিক্ষার কারণে সরাসরি নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে।[১২৯]

১২. **কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনে ইতস্তত বোধ করা :** অনেক সময় নারী বা পুরুষের স্বতন্ত্র বিষয় উত্থাপন করতে শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রী সহাবস্থানের কারণে সংকোচ বোধ করেন।[১৩০]

---

১২৪. মাকানাকে তুহমাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৯০।

১২৫. কারলি শুসতার : তিনি বর্তমানে নিউইয়র্ক-এ অবস্থিত হোফস্টরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক বিভাগের সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ২০০৯ খ্রি. থেকে অধ্যাবধি নিয়োজিত আছেন। [https// www.Linkedin.com]

১২৬. দৈনিক আফাকুল আরাবিয়্যাহ, মিসর : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.।

১২৭. দৈনিক জারিদাতুল ওয়াতান, কুয়েত : ১২ জুন, ২০০০ খ্রি.।

১২৮. ড. মুহাম্মদ ইবনে আলী আলবার, আমালুল মারআতি ফিল মীযান, (মিসর : দারুল হাদীস, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১৯২।

১২৯. দৈনিক জারিদাতুল বয়ান, আমিরাত, www. albayan.co,ae, মঙ্গলবার, শাওয়াল ২৪, ১৪২২ হিজরী।

১৩০. দৈনিক জারিদাতুল বয়ান, আমিরাত : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রি.।

সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনাসমূহ

এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্নরকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভালো। অবশ্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই সাময়িকভাবে সহশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নের প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

- ▣ পরস্পর দৃষ্টি অবনমিত রাখা।
- ▣ পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ও আঁটসাঁট পোশাক পরিহার করা, যাতে অপর ব্যক্তি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপ বুঝতে না পারে।
- ▣ প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় এমন ভাব প্রকাশ না পাওয়া যাতে তার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয়।
- ▣ শ্রেণিকক্ষে এমন অশ্লীল আলোচনা পরিহার করা, যে আলোচনায় পরস্পর লজ্জাশীলতা হ্রাস পায়।
- ▣ নারীদের চলার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখা ও জোরে জোরে পা না রাখা।
- ▣ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের মাঝখানে একটি পার্টিশন থাকা যাতে নারী-পুরুষ পরস্পরকে দেখতে না পায়।
- ▣ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে দুটি দরজা থাকা আবশ্যক। একটি দিয়ে ছাত্রী ও অপরটি দিয়ে ছাত্র আসা-যাওয়া করবে।
- ▣ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ থাকা, একাধারে পাঠদান অব্যাহত রাখা, যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ অহেতুক ঘোরাফেরা থেকে রেহাই পায়।
- ▣ নারী শিক্ষার্থীর সাথে পুরুষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গনে একসাথে চলাফেরা ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখা।
- ▣ নারী শিক্ষার্থী বিকেল পাঁচটার পূর্বে ক্যাম্পাস ত্যাগ করা।

  আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, যে পর্যন্ত পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শর্তের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। তা হলো–

- ▣ পর্দার পরিপূর্ণ বিধান মেনে চলা।
- ▣ পুরুষদের নিকট না বসা।
- ▣ গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে নির্জনবাস না হওয়া।
- ▣ নারীদের জন্যে তালীমের উদ্দেশ্যে পুরুষদের দেখার সুযোগ আছে, তবে এ সুযোগ প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।[১৩১]

মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য সহশিক্ষাই বহাল রয়েছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোশাক বিধি (dress code) এবং অন্য নির্দেশাবলি চালু করেছে, যা পরিস্থিতিকে শান্ত রাখতে সহায়ক।

বাংলাদেশে দ্রুত এ ধরনের পদক্ষেপসমূহ নেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব নাও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত, যা ডা. সাবরিনা রশীদ[১৩২] সুপারিশ

---

১৩১. ফাতাওয়া উসমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯।

১৩২. ড. সাবরিনা রশীদ বর্তমানে মালাশিয়া অবস্থিত আতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মালটিমিডিয়া টেকনোলজি বিভাগে সিনিয়র লেকচারার পদে নিয়োজিত আছেন। [www.smme.uam.edu]

করেছেন। "আমরা দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।"[১৩৩]

পর্দার আইন মতে নারী-পুরুষ সকলকেই দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। নারীর সতীত্ব, পবিত্রতা ও শালীনতা রক্ষা করার জন্য পর্দার সহায়ক পোশাক পরতে হবে। সহশিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। মেয়েদেরকে গার্লস স্কুলে ও মহিলা কলেজে এবং ছেলেদেরকে পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজে পড়াতে হবে। এরপরেও যদি কেউ নারীর নিরাপদে জ্ঞান অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং ধর্ষণ-অপহরণ করে, তা হলে আল্লাহর অধ্যাদেশ অনুসারে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। যে দেশেই কিছুটা ইসলামী আইন চালু আছে, সে দেশে সহশিক্ষার অনুমোদন দেওয়া হয় না। সৌদি আরবে সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কোনোই সুযোগ নেই। ফলে সেদেশের নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরি।

প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার অধিকারী কেউ কেউ মনে করেন যে, লেখাপড়া, চলাফেরা, কর্মক্ষেত্র ও আনন্দ-বিনোদনের সকল ক্ষেত্রে নারীপুরুষ একসাথে থাকলে পরস্পরে আকর্ষণ কম থাকে। আর একে অপর থেকে দূরে থাকলে বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। একে অপরকে কাছে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের এমন মন্তব্য যুক্তির নিরিখে কিছুটা সঠিক বলে মেনে নিলেও বর্তমান যুগে তরুণসমাজের নীতি নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ও ভিনদেশীয় অপসংস্কৃতির কালো ছোবলে আক্রান্ত হওয়ায় ইসলাম কর্তৃক নারী-পুরুষের সহাবস্থানের বিষয়টিকে সমর্থন না করার প্রসঙ্গটি খুবই যৌক্তিক হিসেবে দেখা দিয়েছে। কারণ পৃথিবী জুড়ে যত অঘটন, অশ্লীলতা ও অশালীনতা সব কিছুর মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ও তাদের বেপরোয়া চলাফেরা।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও সহশিক্ষাসংক্রান্ত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী বিধানের আলোকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা, নৈতিকতা ও চারিত্রিকতার বিষয়টি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন থাকে। অবশ্য এর জন্য বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষিকার বিষয়টি সবচেয়ে অগ্রণী বিষয়। পাশাপাশি অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতুলতাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্বজনীন হয়ে না উঠলেও বর্তমানে বেশ কয়েকটি মহিলা কলেজ ও বয়েজ কলেজ ইতোমধ্যে অনুকরণীয় ভূমিকা রেখেছে। তাই সহশিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমার উপরিউক্ত প্রস্তাবনা অনুস্মরণ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে না বলে আমি আশাবাদী।

---

১৩৩. 'সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা' দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও আধুনিকতার দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

নারীর কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিচরণ অনিবার্য। বিভিন্ন কাজ-কারবার, লেনদেন, উঠাবসা ইত্যাদি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই স্বভাবতই নারী-পুরুষ উভয়ের সমাজের বিভিন্ন কর্মমুখর বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এক্ষেত্রে নারীদের প্রয়োজনীয়তা পুরুষদের তুলনায় কম হচ্ছে। নারীদের জন্য সতর্কতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। তাই ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থায় বেশ কিছু আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ নারীর দায়িত্বসচেতনতা যে কোনো সমাজের উন্নতির অন্যতম অংশ। শালীনতা ও পবিত্রতা রক্ষা করে শরয়ী গণ্ডির মধ্যে থেকে পর্দা রক্ষাসহ উন্নয়নমূলক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কাজে দায়িত্বপালন, চাকরি বা ব্যাবসা-বাণিজ্য শরিয়ত সম্মত। শালীনতা রক্ষার্থে নারী ক্রমস কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে না। যে পেশায় তার সৌন্দর্য প্রদর্শন হয় কিংবা তা দেহ-সৌন্দর্য নির্ভর হয়ে থাকে। যেমন– মডেলিং, নৃত্য, সিনেমা ইত্যাদি।

নারীর প্রধান কর্মস্থল তার গৃহ। প্রয়োজন ব্যতীত সে ঘরের বাইরে যাবে না। মুসলিম পরিবারে নারীকে গৃহের রাণীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব স্বামীর উপর। আর অর্জিত অর্থের দ্বারা গৃহের ব্যবস্থাপনা নারীর কাজ।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

“তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বের জাহেলি যুগের নারীদের ন্যায় সাজসজ্জা করে রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে বের হয়ো না।”[১৩৪]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জাস্‌সাস (র) বলেন–

وفيه دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت ومنهيات عن الخروج.

এতে বোঝা যায়, নারীদেরকে তাদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।[১৩৫]

আল্লামা শাওকানী (র) বলেন– المراد بها أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن.

এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে বসবাস এবং অবস্থান করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।[১৩৬]

নারীর কর্ম বা দায়িত্ব প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন–

المراة راعية على بيت زوجها وهى مسؤلة عنهم

---

১৩৪. সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩৩।
১৩৫. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩।
১৩৬. ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

নারী স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা এবং এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে (কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।"[১৩৭]

ঘরের বাইরের কাজের দায়িত্ব থেকে শরীয়ত নারীদেরকে সাধারণভাবে মুক্ত রেখেছে। জুমা ও ঈদের নামায তাদের উপর ওয়াজিব করা হয়নি। জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে হাজির হওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণসহকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু উৎসাহিত করা হয়নি। তাদের উপর জিহাদও ফরয নয়। তবে মুজাহিদদের খেদমতের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানাযায় অংশগ্রহণও তাদের প্রয়োজন নেই।

নবী করীম (স) বলেন– خير مساجد النساء قعر بيوتهن -

"গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠ হলো নারীদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ।"[১৩৮]

নারীর গৃহকর্ম সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন–

عليكن بالبيت فإنه جهادكن

"তোমরা গৃহকর্মে লেগে থাক। এটাই তোমাদের জিহাদ।"[১৩৯]

এক মহিলা সাহাবী (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। তারা বিজয়ী হলে গনিমত লাভ করে, শহীদ হলে নিজেদের রবের নিকট জীবিত অবস্থায় রিযিকপ্রাপ্ত হয়। আমাদের কোন কাজ তাদের এ কাজের সমতুল্য হবে? তখন রাসূল (স) বললেন–

إطاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن.

স্বামীর আনুগত্য এবং নিজেদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।[১৪০]

মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ার অনুমতি নারীদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই শর্তে যে, তারা পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে না এবং তাদের কাতার হবে পুরুষদের কাতার থেকে ভিন্ন এবং পেছনে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها.

"পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হচ্ছে শেষের কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার। অর্থাৎ ভিন্নতা এবং দূরত্ব যত বেশি হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা তত বেশি পছন্দনীয় হবে।"[১৪১]

গৃহের বাইরে নারীর উপার্জন প্রসঙ্গ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর প্রকৃত কর্মস্থল তার গৃহ। সাধারণত তারা গৃহের মধ্যেই অবস্থান করবে। অযথা ঘরের বাইরে যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা প্রয়োজন হলে ঘরের বাইরে, যেমন– হাটবাজার ও ক্ষেত-খামারেও যেতেন।

---

১৩৭. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৩।
১৩৮. মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৭।
১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
১৪০. হাফেজ আবদুল আযীয আল মুনযেরী, আততারগীব ওয়াত তারহীব, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৪ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।
১৪১. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

পর্দার বিধান সম্পর্কে ওহী নাযিল হওয়ার পরের একটি ঘটনা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) হযরত সাওদা (রা)-কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে তাঁর সমালোচনা করলেন। হযরত সাওদা (রা) ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী (স)-এর কাছে একথা খুলে বললেন। এরপরই নবী (স)-এর উপর ওহী নাযিলের লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হওয়ার পর হযরত সাওদা (রা)-কে ডেকে বললেন–

انه اذن لكن أن تخرجن لحاجتكن-

"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।"[১৪২]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমার খালাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিল। ইদ্দত পালনকালেই তিনি ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডাল কেটে এনে তা বিক্রি করার জন্য নবী করীম (স)-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন–

اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خيرا-

বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়তো দান-খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোনো ভালো কাজ করতে পারবে।[১৪৩]

খাওলা বিনতে ছা'লাবার স্বামী একবার অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে বলে ফেলেন যে, আজ থেকে আমার কাছে তুমি আমার মায়ের মতো। পরে তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে জানার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যান। এ বিষয় সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই নবী করীম (স) নির্দেশ দিলেন যে, অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকবে। তার এ কথা শুনে স্ত্রী বলল–

يا رسول الله ما له من شيء وما ينفق عليه إلا أنا-

"হে আল্লাহর রাসূল, তার ব্যয়নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি ছাড়া তার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য আর কেউ নেই। অতএব এ অবস্থায় সে কীভাবে জীবনযাপন করবে?"[১৪৪]

কায়লা নামের এক মহিলা সাহাবী রাসূল (স)-এর কাছে আরজ করলেন– إني امرأة أبيع وأشترى-

আমি একজন মহিলা। আমি নানা রকমের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। অর্থাৎ আমি ব্যবসা করি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জেনে নিলেন।[১৪৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নিজের স্বামী এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি রাসূল (স)-এর নিকট এসে বললেন–

إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لى ولا لزوجي ولا لولدي شيء-

"আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রি করি। এছাড়া আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। তিনি জানতে চাইলেন যে, তিনি কি তাদের জন্য এসব ব্যয় করতে পারবেন? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার এবং এজন্য তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।"[১৪৬]

---

১৪২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০০।
১৪৩. সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।
১৪৫. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-২৫।
১৪৬. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১২।

আমারা বিনতে তারীখ বলেন, একবার দাসীকে সাথে নিয়ে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করে থলেতে রাখলাম। মাছের মাথা ও লেজ থলের বাইরে বেরিয়ে রইল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা) তা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম দিয়ে কিনেছেন? মাছটি তো বেশ বড় এবং সুন্দর। পরিবারের সবাই তৃপ্তির সাথে খেতে পারবে।[১৪৭]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে আসমা বিনতে মাখরা (রা)-কে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাত। আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[১৪৮]

সাহল ইবনে সা'দ (রা) অন্য একজন মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। তার নিজের কৃষিক্ষেত্র ছিল। সে তার কৃষিক্ষেত্রের খালের পাড় দিয়ে গাজরের চাষ করত। সাহল ইবনে সা'দ ও অন্য সাহাবীগণ জুমুআর দিন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে তাঁদেরকে গাজর ও আটার তৈরি একপ্রকার হালুয়া খেতে দিত।[১৪৯]

এই আলোচনায় নারীর প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর ভিত্তি করে তার জন্য সাধারণভাবেই গৃহই যে উত্তম এ কথাটি প্রথমে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলো। তারপর প্রয়োজন হলে যে নারীরা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ঘরের বাইরে গিয়ে জীবিকা উপার্জন বা অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, রাসূলে করীম (স)-এর বাণীর মাধ্যমে সেটাও বর্ণনা করা হলো। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা দরকার, তা হচ্ছে যারা নিজেদের স্বার্থে নারীদেরকে গৃহে বন্দিজীবন যাপন করতে বাধ্য করে, তারা নিম্নবর্ণিত কুরআনের আয়াতটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

তাদের জবাবে বলা যায়–

১. এ আয়াতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতগুলোসহ সকল আয়াতই রাসূল (স)-এর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, আল্লাহর উক্তি "তোমরা নিজেদের গৃহ মধ্যে অবস্থান করো" এটি একটি প্রকৃত ও মৌলিক আদেশ। এখানে রাসূল (স)-এর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এজন্যই উম্মে সালামা (রা) বলেন, নবী করীম (স)-এর সঙ্গে ছাড়া আমি কখনো উটের পিঠে চড়ে রওয়ানা হইনি।[১৫০]

২. এ থেকে নিশ্চিত হয় যে, ঘরের মধ্যে অবস্থান করার বিষয়টি রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত। হযরত উমর (রা) তাঁদেরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যে শেষ হজ্জ করেন তাতেই তাঁদের যাওয়ার অনুমতি দেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) এবং যারা তাঁর ব্যাখ্যার সাথে একমত, তাঁরা অনুধাবন করেন এবং হজ্জের ক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর এ হাদীস উল্লেখ করেন, "হজ্জ হচ্ছে উত্তম জিহাদ এবং হজ্জ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" এর মধ্যে হজ্জ করার জন্য যে, অনুপ্রেরণা রয়েছে, তা একাধিকবার হজ্জ করার বৈধতা প্রমাণ করে। আর এরপর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়।

---

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।
১৪৮. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২।
১৪৯. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-২৫।
১৫০. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, (মিশর : দারুল হাদীস, ১৯৯৮), ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

এ উক্তির মাধ্যমে এর ব্যাপকতাকেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর আল্লাহর ঘোষণা وقرن فى بيوتكن আয়াতের ভিত্তিতেই হযরত উমর (রা) প্রথম দিকে রাসূল (স)-এর স্ত্রীদেরকে হজ্জ পালন থেকে বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু পরে অকাট্য ও বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁর শাসনামলের শেষ বছর তাঁদের হজ্জ করার অনুমতি প্রদান করেন।[১৫১]

যদি বলা হয়, এ আয়াত সাধারণ মুসলিম নারীদের উদ্দেশেই নাযিল হয়েছে। তবে আমরা হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পারি না। কেননা হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই "তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো" এই নির্দেশের আলোকে আমরা দেখতে পাই, রাসূল (স)-এর যুগে মুসলিম নারীরা কীভাবে চলাফেরা করেছে আর কেনই-বা তাদেরকে এ নির্দেশের আলোকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নেয়া থেকে নিষেধ করা হয়নি?

ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের মতে নারীর কর্মক্ষেত্র

সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ উভয়েই মানুষ। তবে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি প্রজাতি ভিন্ন প্রকৃতির। আর এই ভিন্নতার কারণেই তাদের কর্মক্ষেত্রও স্বতন্ত্র হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা, নারী-পুরুষের মাঝে রয়েছে দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য। এ পার্থক্য শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই নয়; বরং বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও। যদিও ইলমে তাশরীহ বা দেহবিজ্ঞানের (ফিজিওলোজি) গবেষণায় বর্তমানে চূড়ান্তভাবেই বলা হচ্ছে যে, নর-নারীর ভেতরে দৈহিক ও মননের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

"দেহবিজ্ঞানের যেসব বিখ্যাত বিশারদ নারীর শরীর ও মগজ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা চালিয়েছেন, তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানানুশীলনের ক্ষমতা নারী ও পুরুষের সমান।" এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপে নর-নারীর সমানাধিকার মেনে নিয়ে নারী-স্বাধীনতাকে সমর্থন করা হয়েছে। ইউরোপে আজ এমন কোনো কার্যক্ষেত্র নেই, যেখানে পুরুষের সাথে সমান তালে পা রেখে নারীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে না। সেখানে নারী ডাক্তার, নারী অধ্যাপক, নারী উকিল, ব্যারিস্টার, জজ এককথায় তারা সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের সমকক্ষতা প্রমাণ করে চলেছে, যা আমাদের দেশেও বিরাজমান।

নারীসংক্রান্ত এসব মতামত ও দাবি-দাওয়া পড়ে যে কেউ সোজাসুজি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারেন যে, ধীশক্তিতে নর-নারীর ভেতরে যে মোটেও পার্থক্য নেই, ইউরোপের সুধী সমাজের সর্বসম্মত মত এটাই। তাই মেনে নেয়া যায় যে, পুরুষের চেয়ে নারী কোনো অংশেই কম নয়। আসলে এ হচ্ছে একটা ধোঁকা মাত্র। এই ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে গেছে এদেশের নবীনেরা। এর মূলে রয়েছে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। যদি এ দুটো মতের বিপরীত দিকে ইউরোপের বিজ্ঞতম মনীষী, যারা বিজ্ঞানের কর্ণধার, প্রবর্তক তাদের ভূরিভূরি অভিমত তুলে ধরা যায়, তা হলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, সেখানকার উঁচুদরের শিক্ষাবিদ মহল সেই মতকে আদৌ সমর্থন করেন না; বরং তাদের মতামত সামঞ্জস্যশীল হয় ইসলামের বিধানের সাথে। শুধুমাত্র এখানেই নয়, বরং আমরা যেখানে যে কোনো বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, সেখানেই দেখতে পাই ইসলামের মতামতের সাথে বিজ্ঞানের ঐকমত্য। এটা ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের এক অপূর্ব মিল। যদিও বর্তমানের কতিপয়

---

১৫১. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬।

স্বল্পজ্ঞানী বিজ্ঞানী নামধারী ব্যক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত পবিত্র কুরআন তথা ইসলামী সংবিধানের বিরোধিতা করে। নারী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের বিধান হলো, নারীর সৃষ্টি পুরুষের হাড়ের নির্যাস মগজ থেকে। মগজ যেমন হাড়ের তুলনায় নরম, হালকা ও স্বাভাবিক। অনুরূপ এই মগজের সৃষ্টি নারীও পুরুষের তুলনায় নরম, হালকা, নাজুক। পক্ষান্তরে পুরুষ নারীর তুলনায় শক্তিশালী ও কর্মঠ।

একথাটিরই বাস্তব রূপরেখার দ্বারোদঘাটিত হয় বিজ্ঞান থেকে; যদিও বর্তমানে দেহবিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে। বলে বলা হচ্ছে যে, নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু একথা আমরা কখনও মেনে নিতে পারি না। বাস্তব যা সত্য, তা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে বিনাবাক্যে, অকুণ্ঠচিত্তে। বাস্তব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কেননা, দৈহিক গঠন ও কাঠামোগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাট ব্যবধান বা বৈষম্য রয়েছে। পুরুষের দৈহিক গঠন কাঠামো অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল ও ঋজু, অথচ শক্তিশালী, সবল ও কর্মঠ এবং দুর্বলতামুক্ত। পক্ষান্তরে নারীর দেহ কাঠামো অপেক্ষাকৃত জটিল, অথচ নরম, নাজুক ও দুর্বল। পুরুষের শরীরে গঠন-কাঠামোগত দিক দিয়ে তেমন কোনো দুর্বলতা, ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নেই, যেমনটা নারীর আছে। নারীর শরীরের সবচেয়ে বড় এবং গুরুতর ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা হলো তাদের অস্বাভাবিক বক্ষ স্ফীতি। নাজুক ও স্পর্শকাতর গোপনাঙ্গ এবং অস্বাভাবিক আয়তনের নিতম্ব (WAIST)। এর ফলে শারীরিক সামর্থ্য, কলাকৌশল বা নৈপুণ্য তথা শারীরিক পারঙ্গমতা ও পারদর্শিতায় নারী পুরুষের মোকাবেলায় অপারগ।

শারীরিক গঠন-কাঠামোগত পার্থক্য ছাড়াও মানসিক ও স্বভাবগত দিক থেকেও নারী ও পুরুষের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আর এ পার্থক্য শুধু মানুষ নয় বরং ইতর প্রাণী নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পুরুষ যেখানে সাহসী, নারী সেখানে ভীরু। সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও পৌরুষ পুরুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট; আর ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা, পরনির্ভরশীলতা ও লজ্জা নারীর ভূষণ। পুরুষ যেখানে বেপরোয়া ও কাণ্ডজ্ঞানহীন, নারী সেখানে কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল। পুরুষ যেখানে চঞ্চল ও উগ্র, নারী সেখানে শান্ত ও নমনীয়। পুরুষের আচরণ যেখানে ধ্বংসাত্মক, নারীর আচরণ সেখানে গঠনমূলক। পুরুষ যেখানে অসহিষ্ণু, আত্মকেন্দ্রিক, নারী সেখানে সহিষ্ণু ও নিবেদিত প্রাণ। পুরুষ যেখানে লাম্পট্যের পরিচয় দেয়, নারী সেখানে পরিশুদ্ধতার উপমা। পুরুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যেখানে সহজ-সরল, নারী যেখানে কূটবুদ্ধিসম্পন্না ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না। পুরুষ জয় করে শক্তি ও পৌরুষে, নারী জয় করে রূপে ও গুণে। পুরুষের জীবন যেখানে সাদাসিধে, নারী সেখানে আড়ম্বরপূর্ণা ও বিলাসিনী। পুরুষ যেখানে মহানুভব, নারী সেখানে সংকীর্ণমনা। পুরুষ যেখানে আবেগের দাস, নারী সেখানে বাস্তববাদী। পুরুষ যদি হয় অদূরদর্শী, নারী হয় দূরদর্শী। নারী যেখানে নিরাপত্তাহীনতায় কাতর, পুরুষ সেখানে নিরাপত্তাদাতা।

একটি পুরুষ মোরগের ভয়ে সকল নারী মুরগিই ছুটে পালায়। একটি ষাঁড়ের ভয়ে একদল গাভী ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। একজন মহিলা একটি ছোট মেয়ের চেয়ে ছোট একটি ছেলেকে নিয়ে একাকী হাঁটতে অধিকতর নিরাপত্তা বোধ করে। এভাবে মানুষ ও ইতর প্রাণী নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের মধ্যে হাজারো রকমের মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবগত পার্থক্যের কথা বলা যেতে পারে। নারীর নিকট পুরুষ খুঁজে থাকে শান্তি আর পুরুষের নিকট থেকে নারী পায় নিরাপত্তা। শক্তিশালী ও সুবিধাজনক শারীরিক গঠন কাঠামো নিয়ে পুরুষ যেখানে বেপরোয়া ও গর্বিত, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অসুবিধাজনক গঠন কাঠামো নিয়ে নারী সেখানে নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা।

নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য

গঠনগতভাবে নারী-পুরুষের দৈহিক পার্থক্যও বেশ লক্ষণীয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

নারীর শরীর অম্লধর্মী কিন্তু পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী। নারীর শরীর চুম্বকধর্মী কিন্তু পুরুষের শরীর বিদ্যুৎধর্মী। নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কিন্তু পুরুষের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল। সাধারণত পুরুষের দৈহিক গড় ওজন ১৪০ পাউণ্ড এবং নারীর দৈহিক ওজন ১২৮ পাউণ্ড। পুরুষের দেহে মাংসপেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ, কিন্তু নারীর দেহে মাংসপেশী ৩৫ ভাগ। পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত সাত সের কিন্তু নারীর দেহের হাড়ের ওজন সোয়া পাঁচ সের। পুরুষের দেহে শতকরা ১৮ ভাগ চর্বি কিন্তু নারীর দেহে ২৮ ভাগ চর্বি। পুরুষের তুলনায় নারীর শরীরে জলীয় অংশ বেশি। রক্তের লাল কণিকা নারীর চেয়ে পুরুষের অনেক বেশি। পুরুষের রক্তের এক কিউবিক মিলিমিটারে পঞ্চাশ লক্ষ রক্ত কণিকা থাকে;[১৫২] কিন্তু নারীর থাকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। পুরুষের মগজের ওজন গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, কিন্তু নারীর মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স। পুরুষের মগজের সর্বনিম্ন ওজন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স কিন্তু নারীর সর্বনিম্ন ৩১ এবং সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স। অথচ মগজের ওজনের উপরই বুদ্ধি নির্ভরশীল। নারীর পঞ্চেন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় দুর্বল। নারীর মগজের বক্রতা ও প্যাঁচ পুরুষের তুলনায় কম। নারীর হৃৎপিণ্ড পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনায় ওজনে ৬০ গ্রাম কম। নারীর তুলনায় পুরুষের নাড়ির স্পন্দন মিনিটে ৫টি কম। শ্বাস-প্রশ্বাসে পুরুষ ঘণ্টায় ১১ ড্রাম কার্বণ জ্বালাতে পারে কিন্তু নারী পারে মাত্র ৬ ড্রাম। নারীর দেহে পুরুষের তুলনায় অক্সিজেনের ভাগ কম। নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি শক্তিধর। সর্বোপরি, সমস্যার সমাধান কিংবা জটিল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মস্তিস্কের ডান ও বাম উভয় বলয়ই ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষরা ব্যবহার করে শুধু ডান বলয়। মগজের আলোচনা সম্বন্ধে আরো একটি দিক থেকে যায়, যা এখানে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে, ‘মীখাখ’। সুতরাং এর ভেতরকার তারতম্য ও আলোচনা করা প্রয়োজন। শরীরতত্ত্বের পরিভাষায় মগজের শেষাংশকে মীখাখ বলে। পুরুষের মীখাখের সঙ্গে মগজের সম্পর্ক হলো ১.৭/৪ অংশ। কিন্তু, নারীর মীখাখের সাথে মগজের সম্পর্ক হলো মাত্র ১.৪/১ অংশ।[১৫৩] জেনে রাখা দরকার যে, মীখাখ মগজের সেই অংশটির নাম, যার স্বল্পতা ও আধিক্যের ওপরে জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির তীক্ষ্নতা ও ভালোমন্দ সর্বতোভাবেই নির্ভরশীল।[১৫৪]

নারী পুরুষের ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য

মানুষের জ্ঞান ও মেধাশক্তি যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে প্রতিপালিত হয়, তাতেও উভয় শ্রেণির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনীষী নিকোলাস ও মনীষী বেইলি প্রমাণ করেছেন যে, নারীর ইন্দ্রিয়শক্তি পুরুষের ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা অনেক দুর্বল।

ঘ্রাণশক্তি : নারীর ঘ্রাণশক্তি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, যতটুকু দূরত্ব নারীরা ঘ্রাণশক্তি দ্বারা অনুভব করতে পারে না, পুরুষ তা সহজেই পারে। ঘ্রাণের শক্তিমাত্রা যতটুকু হলে পুরুষ অনুভব করতে পারে, নারীর প্রয়োজন তার দ্বিগুণ। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা হাল্কা ব্রাসিক এসিডের ঘ্রাণ বিশ হাজারের একভাগ হলে এবং পুরুষ এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলেই অনুভব করতে পারে।

---

১৫২. শিকদার আবুল বাশার, আপটুডেট সাইন্স কলেজ কুইজ, (ঢাকা : অনুভব প্রকাশনী, জুলাই ১৯৯৫ ইং) পৃ. ২২।

১৫৩. মো: কামরুজ্জামান শিবলী, ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর কর্মক্ষেত্রে, (চট্টগ্রাম মাসিক মঈনুল ইসলাম, সংখ্যা ১২, মে ২০১৭) পৃ. ২৬)

১৫৪. আত তাওযীহ ফী উসূলিত তাশরীহ : পৃ. ৪২২।

স্বাদ ও শ্রবণশক্তি : স্বাদ ও শ্রবণ শক্তির অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নারীর চেয়ে পুরুষ এক্ষেত্রে অনেক সবল। এর প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন এত পাচ্ছি যে, তা আর নতুন কোনো উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না। 'এনসাইক্লোপেডিয়া'য় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– "এর ফলেই খাদ্যের গুণাগুণ বিচার, সুরের ভালোমন্দ পরীক্ষা, পিয়ানোর রাগ-রাগিনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা পুরুষরাই স্থান পায়। কোনো নারী এসব ব্যাপারে আজ পর্যন্ত নিজেকে সক্ষম প্রমাণিত করতে পারেনি।"

অনুভূতিশক্তি : এ সম্পর্কে মনীষী লোমব্রুয়ার ও সিয়ারজী প্রমুখ পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত এই, নারীর পুরুষ থেকে এক্ষেত্রে দৌর্বল্য অনেক বেশি। তাদের গবেষণাপ্রসূত যুক্তি হলো, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি নরের চেয়ে নারীর অনেক কম বলেই পুরুষের চেয়ে তাদের ধৈর্য বেশি বলে মনে হয়। (নরের চেয়ে নারীর অনুভূতি অনেক কম না হলে আগুনের মতো দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে তারা এত ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে পারত না)।

লোমব্রুয়ারের মূল বক্তব্য হলো– "গর্ভ ও প্রসবের কঠিন কষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ভেবে দেখুন, নারীরা দুনিয়ার বুকে কত কঠিন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে। যদি নারীদের অনুভূতিশক্তি পুরুষের মতোই তীক্ষ্ণ হতো, তা হলে কিছুতেই তারা এতবড় দুঃখ নীরবে সহ্য করতে পারত না। মানবজাতির সৌভাগ্য যে, প্রভু নারীকে প্রখর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তা না হলে বনী আদমের উৎপত্তির গুরুভার বয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না।"[১৫৫]

রুচিভেদ ও স্বভাব : মেয়েদের জ্ঞানশক্তি পুরুষের জ্ঞানশক্তি অপেক্ষা যতখানি দুর্বল, ঠিক ততখানি পার্থক্য দেখা দেয় তাদের রুচিবোধের ভেতরে। তাদের চারিত্রিক শক্তিও পুরুষের সমান নয়। তাদের স্বভাবই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তাই দেখা যায় যে, তাদের ভালোমন্দের বিচার পুরুষের ভালোমন্দ বিচারের সাথে সাধারণত এক হয় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের অনৈক্যটা শুধু বাইরেই নয়। উপরন্ত সেসব প্রকৃতিগত পার্থক্যেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এছাড়াও আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে এই দুই শ্রেণি তথা নারী-পুরুষের মাঝে। এসব গঠনমূলক পার্থক্যই বলে দেয় যে, নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন না হয়ে ভিন্নতর হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিসংগত। আর এটাই হলো ইসলামের বিধান। অতএব আমরা দেহবিজ্ঞানের থিউরী মান্য করে নারী-পুরুষের পার্থক্যের বাস্তব সত্যকে বিসর্জন, কালিমা লেপন ও প্রত্যাখ্যান করতে চাই না। এমনটি হবে অজ্ঞতাপ্রসূত ও বাতুলতামাত্র।[১৫৬]

ইসলামের বিধান হচ্ছে পুরুষরা গৃহ-বহির্ভূত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবে আর নারীরা গৃহের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করবে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের এ বিস্তৃত সুবিশাল পার্থক্য ইসলাম করেনি এবং পুরুষরাও করেনি, বরং প্রকৃতি তথা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মহান আল্লাহই করেছেন। আল্লাহ তায়ালাই নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সুবিশাল পার্থক্যের ব্যবধান স্থাপন করেছেন। কেননা, আমরা জানি যে, মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ গৃহ নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করতে শিখেছে। এ থেকেই শুরু হয় প্রকৃতির এই অমোঘ ধারা। প্রকৃতির এ গৃহই নারীকে ঘর-সংসারের কাজ করতে বাধ্য করে। আর নারীও তখন মেনে নিয়েছিল এ বশ্যতা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নারীর পদচারণা পরিলক্ষিত হতো ঘরের বাইরে যথেচ্ছাভাবে। নারীর এই

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৫৬. ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর কর্মক্ষেত্র, পৃ. ২৮।

যথেচ্ছাচারিতার কারণে তখন নারী প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হতো বহুবিধ অপকর্মের, নির্যাতনের। এই 'নারী নির্যাতন' প্রবণতা রোধে নারী-পুরুষের শারীরিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম ঘোষণা করল– وقرن فى بيوتكن "তোমরা (নারীরা) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর।"[১৫৭]

এই আইনের হেতু এটাই যে, নারী-পুরুষ যেহেতু পরস্পর একে অপরের সম্পূরক, সেহেতু তাদের কাজকর্মের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র হওয়াই উচিত। কারণ, নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক তখনই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হবে, যখন তাদের কাজের মধ্যে ভিন্নতা প্রকাশ পাবে। আর এ ভিন্নতা তখনই প্রকাশ পাবে, যখন কেউ কারো অনধিকার চর্চা না করে প্রত্যেক নর-নারীই স্বীয় কর্ম সম্বন্ধে সচেতন হবে। এ কারণেই ইসলাম নারীকে তার গৃহের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কার্যসমূহ পালন করতে হুকুম করেছে। কেননা, নারীর সৃষ্টি হয়েছে বংশ সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, পারিবারিক দায়িত্ব, গর্ভধারণ, প্রসব ও শিশু লালন-পালন, সংসারের যাবতীয় কাজের পাশাপাশি সন্তানদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা, সুশিক্ষা দেওয়া, খোদাপ্রদত্ত নিখাদ ভালোবাসা দান করা ইত্যাদির জন্য। উপরন্তু সংসারই হলো নারীর উন্নতির একমাত্র ক্ষেত্রফল। পক্ষান্তরে নারীরা যদি গৃহে অবস্থান না করে অফিস-আদালতে পুরুষের সাথে কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তবে এসব জরুরি কার্যাবলি সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে। এগুলো থাকবে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অবহেলিত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতাও নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন হবে এতে। এই কারণে নারীদেরকে কঠিন অশান্তি ও দুঃখ, দুর্দশা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাদের শান্তিপূর্ণ ঘর-সংসার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন করে দেওয়াকে ইসলাম সমর্থন করেনি।

উঁচুদরের বিজ্ঞানীদের নারী সম্পর্কে মতামত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে তাঁদের মতামত ইসলামী মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এখানে কতিপয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতামত উপস্থাপন করা হলো। জড়বিজ্ঞানে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক সোলসায়মন 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ক্রুশিয়ার গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেন– "নারীর নারীই থাকা উচিত।" হ্যাঁ, অবশ্যই নারীকে নারী থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্টই তাদের কল্যাণকর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির এটাই বিধান এবং এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা যতখানি প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবে, ততখানি তাদের সাফল্য ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই তাদের বিপদ বেড়ে যাবে। কোনো কোনো দার্শনিক মানবজীবনে পবিত্রতা আছে বলে স্বীকার-ই করেন না।[১৫৮]

আমরা বলি, মানবজীবনে মনোমুগ্ধকর পবিত্রতার ব্যাপক অস্তিত্ব বিরাজমান। হ্যাঁ, তা শুধু তখনই দেখা দিতে পারে যখন নর ও নারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে এবং তা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে চলবে।" আর প্রকৃতিই তো নারীকে তার গৃহের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কার্যাদি পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে।

---

১৫৭. সূরা আল আহযাব : ৩৩।

১৫৮. ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর কর্মক্ষেত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

আপনাদের বিস্ময় জাগবে একথা শুনে যে, এতবড় দার্শনিকরা কেন নারীদের নারী থাকার উপদেশ দেন? নারী তাদের নারিত্বের বাইরে আবার যেতে পারে কী করে? নারী তো নারীই থাকবে চিরকাল এবং পুরুষ থাকবে পুরুষ। ইউরোপের সুধীমহল সেখানকার আধুনিকা নারীদের নারী বলেই স্বীকার করতে রাজি নন। কারণ, তারা তাদের স্বরূপ ও স্বদায়িত্ব ভুলে পুরুষ হবার সাধনা চালাচ্ছে। ফলে তারা নারিত্বের গণ্ডির বাইরে পা রাখবার প্রয়াস পাচ্ছে। উক্ত মনীষী আরেক স্থানে লিখেছেন– যে নারী স্বীয় গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে মত্ত হতে চায়, সন্দেহ নেই যে, সে পূর্ণাঙ্গ কর্মী হিসেবেই দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তখন আর নারী থাকে না।"

খ্যাতনামা লেখক অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'রিভিউজ' প্রত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় আধুনিকা নারীর শোচনীয় অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। বিশেষ করে ইউরোপের যেসব নারী বর্তমান নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে পড়ে পুরুষের দায়িত্বে ভাগ বসাতে এসেছে, তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– "যেসব নারী সমাজজীবনের মূল ভিত্তি অর্থাৎ দাম্পত্য-জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, স্রষ্টা যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে প্রয়োজনে তাদের এ ধরনের দৈহিক ও মানসিক রূপদান করেছেন, তারা তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের মেজাজে আল্লাহর দেওয়া সেই বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের নারীদের ভেতরে স্বভাবত পাওয়া যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যাদের 'নপুংসক' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

বস্তুত তাদের পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি নারী বলবারও সাধ্য থাকে না। উপরন্তু, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। পুরুষ হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তা এজন্য যে, প্রকৃতি তাদের দেহ ও মন এমনভাবে গড়ে ফেলেছে, যার সংশোধন তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নারীরও এজন্য থাকছে না যে, তাদের কাজকর্ম, হাবভাব ও চালচলন সবই পুরুষের, নারীর গন্ধও তাতে নেই।"

বিখ্যাত সমাজবাদী দার্শনিক মনীষী প্রুধোঁ স্বীয় খ্যাতনামা গ্রন্থ "ইবতিকারুন নিয়াম" এ লিখেন– "প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু শিক্ষা তাকে সহায়তা করতে নারাজ। তাই তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় আমরা দিন গুনছি। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের বিস্তির্ণ ক্ষেত্রে নারীদের কোনোই অবদান নেই। নারীদের আদৌ সহযোগিতা না নিয়েই মানবজাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলছে। পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, একমাত্র পুরুষ জাতিই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেগুলোকে তারা যুগে যুগে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে চলছে। সেসবের যথাযোগ্য প্রয়োগ তাদেরই হাতে হচ্ছে। এ থেকে যা-কিছু শুভাশুভ ফল তারাই উৎপাদন করছে, এর মাধ্যমেই তারা নারীদের ভরণপোষণ ও সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে চলছে।"

"পুরুষের ক্ষেত্র নারীদের চর্চার ফলে ভয়াবহ পরিণাম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে চলছে। এর প্রতিকার হচ্ছে, পুরুষের ব্যাপারে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক যে বৈষয়িক দায়িত্ব রয়েছে, তা বিশেষভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

মেয়েদের সবচেয়ে প্রশংসনীয় উঁচুস্তরের কাজ হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা। আমাদের এ যুগেও বলা হয়, নারীদের ভূগোল শিক্ষা এ জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজ নিজ ঘরের দরজা জানালাগুলো যথাযথ স্থানে বসাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। রসায়নশাস্ত্র তাদের এজন্য শেখা দরকার যে, হাঁড়ির রান্নাসামগ্রী উথলে উঠলে যেন যথাসময়ে সামলে নিতে পারে। লর্ড বায়রন নারীর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়েও অভিমত পেশ করেছেন– মেয়েদের লাইব্রেরিতে ধর্মগ্রন্থ ও পাকপ্রণালি ছাড়া আর কোনো বই থাকা অনুচিত।"[১৫৯]

উঁচুদরের বৈজ্ঞানিকদের এ ধরনের আরো ভূরিভূরি থিউরি রয়েছে, যেগুলো নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতারই বার্তা বহন করে। সুতরাং এসব কুরআনের বাণী, বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ মতামত ও প্রকৃতির নিয়মনীতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন না হয়ে ভিন্নতা হওয়াই যুক্তিসংগত। উপরন্তু, নারীর উন্নতির একমাত্র কর্মক্ষেত্র হলো তার সংসার। সংসারেই নারীর নারিত্ব বিকশিত হয়, অন্য কোথাও নয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নারী প্রগতিবাদীরা এ তিনটি তথা কুরআন, বিজ্ঞান ও প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসে রাজি নয়। তাই তারা তাদের সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে নারী স্বাধীনতার কথা বলে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন হবার দাবি করে। নারীকে প্রগতির নামে চাকরি দিয়ে স্বনির্ভর করার লোভ দেখায়। আবার এ নারীবাদীরাই অফিস-আদালতে চাকরি দিয়ে নারীকে তাদের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এসব চাকরিরত মহিলাদের মাসিক বেতন পুরুষের তুলনায় অনেক কম। এমন বেতন পুরুষদের হলে পুরুষরা সংগ্রাম চালিয়ে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করে নিতে পারত; কিন্তু নারীরা তা পারে না। কারণ, তারা দুর্বল। এ পার্থক্য শুধু আমাদের দেশেই নয়; বরং ইউরোপেও, যেখানে গড়ে দশ লাখ কর্মজীবী নারীর মধ্যে মাত্র দশ হাজার নারী তাদের পুরুষ সহকর্মীর সমান বেতন পায়। আর বাকি সব নারীই মাসিক বেতন পায় পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

যারা নারীর সত্তাকে পুরুষদের থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দেখতে চায়, তাদের তুলনা হতে পারে সেই মূর্খদের সাথে, যারা পানি পান করতে গিয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলিত শক্তি লোপ করে একটাকে ভিন্ন করে পেতে চায়। অথচ সে মূর্খের জানা উচিত যে, পানির অস্তিত্বই নির্ভর করছে সেই দুটো উপকরণের সংযোগের উপর এবং তা থেকে একের বিয়োগে পানির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি পানির বেলায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটাকে অপরটা থেকে ভিন্ন ও স্বাধীন করে দিয়েও পানিকে পানি রাখা সম্ভবপর হতো, তা হলে অবশ্যই নর ও নারীর এক শ্রেণিকে অপর শ্রেণি থেকে পৃথক করে দিয়ে মানব-সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কল্পনা করা যেত। উপরন্তু অক্সিজেন যদি পানি সৃষ্টির ধারায় হাইড্রোজেনের কাজ দিত এবং হাইড্রোজেন দিত অক্সিজেনের কাজ, তা হলে নারীও নরের কাজে দখল দিতে পারত নিশ্চিন্তে এবং তাতে মানব-সভ্যতায় কোনোরূপ ভাঙ্গনই দেখা দিত না। কিন্তু আমরা জানি এরূপ হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভবপর নয়। যেভাবে হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেন ওজনে বেশি, তেমনি নারীর তুলনায় নর দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে সবল।

প্রকৃতির নিয়মে আগুন-পানি, আগুন-মোম, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যেভাবে একত্রিত হতে পারে না, অনুরূপ নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন হতে পারে না। আর এসব হতে পারে তখনই, যখন প্রকৃতি বিধান পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব।

---

১৫৯. ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারী কর্মক্ষেত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[১৬০]

নারী-পুরুষ এই দুই শ্রেণি বিপরীতধর্মী হলেও পরস্পর আকর্ষণাত্মক। আর এ কারণেই নারীরা প্রায়ই গ্রহণ করে তাদের কর্মক্ষেত্রে উপস্বামী, বয়ফ্রেন্ড এবং পুরুষরা গ্রহণ করে উপস্ত্রী ও গার্লফ্রেন্ড। স্বামী-স্ত্রীতে থাকে না কোনো ভালোবাসা, কেউ কারো ধার ধারে না। পান থেকে চুন খসলেই শুরু হয় ঝগড়াঝাটি, তাদের সংসারে অশান্তি বিরাজ করে সর্বদা। চলে তালাক-ডিভোর্সের খেলা অবাধে, যা বর্তমান বিশ্বের অবাধ নারী স্বাধীনতায় এসব তালাক-ডিভোর্স অহরহ ঘটছে। সংসারে নেমে আসছে অশান্তি।

আশ্চর্য যে, নারীস্বাধীনতার দাবিদাররা নারীর দাসত্বের অভিযোগ তুলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। অথচ তারা একথা ভাবছে না যে, স্রষ্টা কীভাবে পুরুষদের নারীর অধীন ও দাস করে রেখেছেন। স্রষ্টা পুরুষদের উপরে অপরিহার্য করে দিয়েছেন নারীর খোরপোষ ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থার জন্য জীবনসংগ্রামে দুর্গম ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া। সেজন্য তারা প্রাণ বিপন্ন করেও সমুদ্রে গভীর তলদেশে অভিযান চালিয়ে মণিমুক্তার ভাণ্ডার এনে নারীর পদতলে লুটিয়ে দেয়।

এখানে একটি প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা তো পুরুষদেরকে নারীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এখন কথা হলো, নারীর যদি তার পিতা, স্বামী, ভাই বা নিকটাত্মীয় কেউ না থাকে, তবে সে নারীর অবস্থা কী হবে? সে নারীকে তো অবশ্যই তার জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বাইরে অফিস-আদালতে চাকরির অন্বেষণ চালাতে হবে।

ইসলাম এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে, আজ আমরা তা ইউরোপের মনীষীদের কণ্ঠেই শুনতে পাচ্ছি। ইসলাম বলেছে, এরূপ অসহায় ও অরক্ষিতা নারীর, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা "বাইতুল মাল" থেকে করা হবে। বাইতুল মাল হচ্ছে মুসলমানদের তথা জনসাধারণের অর্থভাণ্ডার। তা সরকারের দায়িত্বে দুঃস্থ ও অসহায়দের স্বার্থে মুক্তহস্তে ব্যয়িত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই ইসলাম অসংখ্য দুঃস্থ ও বিধবার সহায়তা সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরে অপরিহার্য করে দিয়েছে, যেন পেটের দায়ে তাকে গৃহ ছেড়ে বাইরের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে গিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

ইউরোপের মনীষীরা বেশ কিছুদিন যাবৎ ইসলামের এ বিধানটিকেই বাস্তবে রূপ দেবার জন্য লেগে গেছেন এবং আন্দোলন শুরু করেছেন যে, এ ধরণের অসহায় ও অরক্ষিতা বিধবা নারীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সরকারি

১৬০. সূরা আর রূম : ৩০।

তহবিল থেকেই করা হোক। "আন্নিযামুস সিয়াসী" গ্রন্থে রয়েছে, "স্বামী কিংবা কোনো নিকট আত্মীয়ের অবর্তমানে নারীর প্রতি সমাজের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে কোষাগার থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, তা হলে পেটের দায়ে তাদের গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে লিপ্ত হতে হবে না। কারণ, যথাসম্ভব নারীকে গৃহেই অবস্থান করা উচিত। আমাদের প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিত যে, নারীকে যেন বাইরের কঠোর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেমে হাজার দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয় এবং মহান আল্লাহ তাদের যে ছায়া-ঘেরা গণ্ডিতে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য না হয়।"[১৬১]

গৃহই হলো নারীর উন্নতির একমাত্র ক্ষেত্রফল। ঘর-সংসারেই নারীরা মেধা বিকাশে অনন্যা। গৃহে অবস্থান করেই নারীরা প্রভূত অর্থোপার্জনে সক্ষম হয় বিভিন্নভাবে। গৃহপালিত হাঁস-মুরগি লালন-পালন করে, বাড়ির অব্যবহৃত স্থানে শাক-সবজি উৎপাদন করে, হাতের কাজ যেমন সেলাই ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে সংসারের প্রয়োজন মেটানো যায়। এভাবে নারীরা গৃহাভ্যন্তরে বাস করেও প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারে, যেমন করেছেন মহিলা সাহাবীগণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি একজন হস্তশিল্পে দক্ষ ব্যক্তি। আমি বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। এছাড়া আমার, আমার স্বামীর এবং সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। রাসূল (স) বললেন, তুমি যেভাবে উপার্জন করে তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ, তাতে তুমি বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হবে।[১৬২]

নারীর অবস্থান বাইরে নিরাপদ নয়। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) বলেন, নারী গোপন করে রাখার যোগ্য। সে যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (তদুপরি লম্পটদের উপদ্রব তো আছেই)।[১৬৩]

"গৃহের নিভৃত স্থানই নারীর জন্য উত্তম মসজিদ।"[১৬৪]

আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত বিধান লঙ্ঘন করে কেউ কখনও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। কবলিত হয়েছে নানাবিধ সমস্যার আবর্তনে। কাজেই এরাও কখনও সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাই আল্লাহর নির্দেশ–

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যারা স্রষ্টার নির্ধারিত ক্ষেত্র লঙ্ঘন করল, তারা আত্মপীড়িত সাজল।"[১৬৫] পক্ষান্তরে যেসব নারী হিজাব তথা পর্দা পালন করে, তারা তাদের স্থানে অবস্থান করছে নিরাপদেই। অক্ষুণ্ন রয়েছে তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু। বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা বর্তমান বিশ্বে নারী স্বাধীনতার কথা বলে, আসলে

---

১৬১. নূমান ইবনে আবুদর রাজ্জাক, আন নিযামুস সিয়াসী ফিল ইসলাম, (মিশর : আল মাকতাবাতুল ওয়াকফিয়্যাহ, ২০১১) পৃ. ৩০৭।
১৬২. আত তাবকাত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০১।
১৬৩. সুনান তিরমিযী প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।
১৬৪. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৭।
১৬৫. সূরা আল বাকারা : ২২৯।

তারা নারীর স্বাধীনতা চায় না বা সঠিকভাবে তা বুঝতে পারে না। তারা চায় নারীকে ভোগ্য-সামগ্রী বানাতে। স্বাধীনতার নাম দিয়ে নারীকে গৃহ থেকে বের করে অফিস-আদালতে চাকরি দিয়ে নারীর নারীত্ব, ইজ্জত, সম্ভ্রম, সতীত্ব তথা যথাস্বর্বস্ব লুট করতে, যা পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে। পরিশেষে নারীজাতিকে বলতে চাই যে, আপনারা আপনাদের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সচেতন হোন, ভেবে দেখুন আপনাদের কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনাদের করণীয় কী? কুরআন, বিজ্ঞান, প্রকৃতির বিধান সম্বন্ধে বুঝে জেনে নিন আপনাদের কর্মক্ষেত্র। ইনশাআল্লাহ আপনারাও ফিরে পাবেন আপনাদের প্রকৃত মান-মর্যাদা, নারীত্ব, সতীত্ব; যেমন পেয়েছিলেন মহিলা সাহাবীগণ ও সোনালি যুগের রমণীগণ।

আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

১. আধুনিক পাশ্চাত্য মানসিকতায় ঘরের বাইরে যেমন অফিস-আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাট এবং এ ধরনের অন্য যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ না করা পর্যন্ত নারীকে বেকার বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয়, নারীরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ না করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ হয়ে পড়ে পশ্চাৎপদ। এমনকি আধুনিক চিন্তায় নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্রের বিষয়কেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয় না। বরং নারী-পুরুষ উভয়কেই সকল কাজের জন্য সমান উপযোগী বলে ধরে নেয়া হয় এবং এরূপ অবস্থায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে কোনো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলেও বিবেচনা করা হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ এই চিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. (ক) ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলাম নারী নয়, বরং পুরুষের উপরই জীবিকা উপার্জন এবং সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অন্য দিকে গৃহকর্মের পরিচালনা, শিশু পালন ও তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন নারীর উপর।

কাজেই পুরুষের সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকা আর নারীর সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকার মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য বিদ্যমান। আর এই পার্থক্য বা ভিন্নতর ফলে সামাজিক দায়িত্বের কারণেই চাকরির ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষের অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।[১৬৬]

(খ) নর-নারীর এরূপ কর্মবিভাগ কল্পনাপ্রসূত নয় বা কোনো বে-ইনসাফীর উপর ভিত্তি করেও এ বিধান প্রণয়ন করা হয়নি। বরং, ইসলাম-নির্দেশিত এ কর্মবিভাগ নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও প্রকৃতির সাথে একান্ত সংগতিশীল ও বাস্তব। সকল গবেষণাতেই তাদের উভয়ের শারীরিক ও মানসিক গড়নের এ পার্থক্য একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্য।

(গ) ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী করেছে। এসব সম্পত্তি দেখাশোনার কাজে আমরা তাকে বাধা দিতে পারি না কিংবা বেতনভুক্ত কর্মচারী বা ব্যবস্থাপকের দ্বারা কাজ করাতে বাধ্য

১৬৬. নারীর ভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

করতেও পারি না। আসল কথা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অনুরূপ কাজে কখনো কোনো মহিলা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে তিনি বাইরে যেতেন।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সে যুগে স্ত্রীলোকেরা কৃষিকাজে তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্য মাঠে কাজ করত। হযরত যুবাইর (রা)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) নিজ বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে তার স্বামীর খেজুর বাগানে কাজ করতে যেতেন। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আসমা বিনতে মুহার্‌রামা নামের এক মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসা করতেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন করেছেন যে, ওমরা বিনতে তাবজা (রা) নামে আর একজন মহিলা সাহাবী তার গৃহস্থালির দরকারি জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে যেতেন। ইবনে আবদুল বার (র) তার 'আলি ইস্তিয়াব' গ্রন্থে হযরত সিফা (রা) নামে এক মহিলা সাহাবী প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হযরত ওমর (রা) এই সাহাবীর উপর বাজার-ব্যবস্থাপনার কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।[১৬৭]

অবশ্য এই মুসলিম নারীরা যখন বাইরে যেতেন, তখন কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত একখানা লম্বা চাদর জড়িয়ে নিতেন। তা ছাড়া মুসলিম নারীরা যে নার্স ও সাহায্যকারী হিসেবে ইসলামের যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করতেন এরূপ বহু বর্ণনা হাদীস গ্রন্থ ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। কখনো দরকার পড়লে তারা প্রকৃত যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন।

(ঘ) বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক নারীকে সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে বাইরে যেতে হতে পারে।

১. সামাজিক প্রয়োজন যেমন– বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা হাসপাতাল, মাতৃসদন, মহিলা ডিসপেনসারি, মহিলা ক্লিনিক, মহিলা শিল্প, খামার, এতিমখানা এবং বালিকা ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং এতে কাজ করার জন্য মহিলাদের দায়িত্ব পুরুষের হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। সেজন্য এসব জায়গায় কাজ মহিলাদেরকেই করতে হবে।

২. নারীর ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জনশীল পুরুষ না থাকলেও নারীকে তার জীবিকা উপার্জনের তাগিদে বাইরে কাজে যেতে হতে পারে। শহুরে জীবনে যেসব বিধবা বা অবিবাহিতা নারীর জন্য পুরুষ উপার্জনকারী নেই, সেসব নারীকে বাইরে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়।

৩. নারীর নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদ-সম্পত্তি থাকলে সে সবের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তদারকির জন্য তাকে বাইরে যেতে হবে।

৪. যে পরিবারের সন্তানের সবাই কন্যা অথবা কন্যাসন্তানেরা, পুত্রসন্তান অপেক্ষা বড় অথচ পিতা-মাতা এমন বৃদ্ধ যে উপার্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেখানে ঐ কন্যাকে উপার্জনের তাগিদে অবশ্যই বাইরে যেতে হয়। একইভাবে কোনো পরিবারে স্বামীর আয় ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট না হলে তখনও স্ত্রীকে বাইরে কাজ করতে যেতে হতে পারে।

---

১৬৭. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, মুসলিম নারীর পোষাক ও কর্ম, (ঢাকা : এশা রাহনুমা সাইন্স ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮) পৃ. ১০৫।

৫. উপর্যুক্ত প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা শুধু বাস্তবতার পরিপন্থিই নয়, বরং ইসলামেরও পরিপন্থি। কাজেই, যে কোনো সমাজে নারীদের এসব প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের জন্য কাজের সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। যাতে প্রয়োজন হলে যে কোনো নারী কাজ পেতে পারে। তা ছাড়া কতিপয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কর্মক্ষেত্রকে শুধু নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য রিজার্ভ রাখাও যেতে পারে।

শিশু হাসপাতাল ও মাতৃসদনের দায়িত্ব মহিলাদের উপর দেয়া যায়। দেশের মোট হাসপাতালের অর্ধেক হাসপাতালকে মহিলা হাসপাতালে রূপান্তরিত করে অথবা সকল হাসপাতালে একটি পৃথক মহিলা শাখা খুলে সে সবের ভার মহিলাদের উপর ন্যস্ত করা যায়। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতার কাজ মহিলাদের জন্য রিজার্ভ রাখা যেতে পারে। অনুরূপ মহিলা বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি শুধু মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করা যায়। তা ছাড়া নারীদের জন্য আলাদা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন গঠন করে এবং পরিচালনায় মহিলা নিয়োগ করলে চাকরির সাথে সাথে ছিন্নমূল ও দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনে বিশেষ সহায়তা হতে পারে। বয়স্ক মহিলাদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহজতর কাজে নিয়োগ করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত মহিলা আসামী ও কয়েদিদেরকে গ্রেফতার ও তদারকি, বাড়ি-ঘর তল্লাশি প্রভৃতি প্রয়োজনে ক্ষুদ্র মহিলা পুলিশ বাহিনীও গঠন করা যেতে পারে। এমনিভাবে মুসলিম-সমাজে দরকার হলে মহিলাদের আরো বহু সুযোগ সৃষ্টি করে মহিলা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়।[১৬৮]

৬. পাশ্চাত্য ধারণামতে ঘরের কাজে নিয়োজিত মহিলাদের সাধারণত বেকার বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসংগত। কৃষিপ্রধান দেশে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে মহিলারা শুধু শিশু পালন ও গৃহস্থালির কাজই করে না, সেখানে তারা কৃষির সাথে জড়িত নানাবিধ কাজও আঞ্জাম দিতে থাকে। কাজের ঘণ্টা ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সেখানে মহিলাদেরকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। অন্যান্য কাজের কথা ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র শিশুপালন ও শিশুকে শিক্ষাদানের কাজটাই একটা সার্বক্ষণিক কাজ। একটি শিশুকে যথার্থ মানুষ করতে হলে কমপক্ষে বারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ঐ শিশুর পরিচর্যা ও সেবা-যত্ন করা এবং তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার হয়। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, একটি ছোট পরিবার যেখানে মাত্র দুই বা তিনটি মাত্র সন্তান রয়েছে, সেখানেও মাকে ঐ দুই-তিনটি সন্তান মানুষ করতে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে ঐ সন্তানদের পেছনে ক্রমাগত নিয়োজিত থাকতে হয়। এরপরও ঐ মাকে বেকার বলা যায় কোনো ন্যায়বিচারের যুক্তিতে!

সিভিল কোর্ট

১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত 'ওমেন ফর ওমেন'-এর সম্মেলনে অন্যান্য দাবির সঙ্গে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টের' দাবি করা হয়। সিভিল কোর্টের অর্থ : পার্লামেন্ট কর্তৃক বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার সম্পর্কে এমন একটি আইন তৈরি করা, যার ভিত্তি শরীয়ত হবে না। অর্থাৎ পার্লামেন্ট মর্জিমাফিক স্বাধীনভাবে এ সম্পর্কে একটি আইন তৈরি করবে। তারা অবশ্য ইচ্ছা করলে শরীয়তের কোনো কোনো অংশকে সিভিল কোর্টে গ্রহণ করতে পারবেন। আবার না চাইলে তারা শরীয়তকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারবেন। পার্লামেন্টে প্রয়োজনমতো এবং মর্জিমাফিক সময়ে সময়ে অন্যান্য আইনের মতো এ আইনও সংশোধন করতে পারবেন। ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টের অর্থ, এ আইনটি সব নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হবে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে। আমাদের অনেকেই

---

১৬৮. নারীর ভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

না বুঝে যে এ ধরনের দাবি করছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা যদি সুষ্ঠভাবে জানতেন যে, এ ধরনের আইন ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, তবে তারা এ দাবি করতেন না। তাদের অবশ্যই বুঝানো প্রয়োজন যে, এসব বিষয়ে শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করা বা ইসলামী শরীয়তের বিধানকে পার্লামেন্টের মর্জির অধীন করা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল। কারণ ইসলামী শরীয়তকে কখনো কোনো পার্লামেন্টের অধীন করে দেয়া যায় না।

এরূপ করা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মৌলিক ধর্ম অধিকারসংক্রান্ত অধ্যায়ের ৪১ নং অনুচ্ছেদেরও[১৬৯] বিপরীত। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম বিশ্বাস, আমল ও প্রচারের অধিকার রয়েছে। যদি কাউকে তার নিজস্ব ধর্মের বিধান মোতাবেক বিবাহ, তালাক বা উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তা তার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে।

আমাদের শিক্ষিত বোনদের একটি অংশ আরো একটি বড় ভুল করছেন। অবশ্য আমাদের শিক্ষিত ভাইদের একটি অংশ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। তারা ভাবছেন যে, ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট হলে পুত্র-কন্যা এবং স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার সমান হয়ে যাবে। তালাকের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সমান হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে কী ঘটছে, তার উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। পাশ্চাত্যের বর্তমানে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় 'উইল' বা অসিয়তের মাধ্যমে, শতকরা ৯৯ জন উইল রেখে যান। সে উইলেও বলে দেয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তির স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা তার মৃত্যুর পর কে কতটা সম্পত্তি পাবেন, তিনি যে কোনোভাবে তার সম্পত্তি সম্পর্কে উইল করে যেতে পারেন। তিনি যে কাউকে সম্পত্তির কিছু নাও দিতে পারেন। তিনি তার পরিবারের বাইরের কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সব সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেন। 'উইল'-এর এই নিরঙ্কুশ ধারণা পাশ্চাত্যের নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ উইলের ব্যাপারে পাশ্চাত্যে যে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। কাজেই সেখানে কে কতটা সম্পত্তি পাবে তা ধরা-বাঁধা নেই বা সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। উইলের মাধ্যমে যে মেয়েরা বা স্ত্রীরা বেশি পাবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মানুষকে এ ধরনের সেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ ইসলাম দেয়নি। ইসলামে প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য বিচার করে নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব দেয়া হয় (স্ত্রী মোহরানা পায় এবং স্বামী তা দেয় তা বিচার করা হয়) তা হলে কিছুতেই বলা যায় না যে, স্ত্রী স্বামী থেকে কম পায়। এখানে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে কোনো দেশের অধিকাংশ সম্পদ পুরুষের মালিকানাধীন। তার তাৎপর্য এ দাঁড়ায় যে, স্ত্রীরা অঙ্কের বিচারে স্বামীর অর্ধেক (অর্থাৎ স্বামীর সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ পেলেও তা পরিমাণে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে যা পেতে পারে (অর্থাৎ দুই ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ) তা থেকে বেশি হবে। নিম্নে একটি ছক আকারে উদাহরণ দেয়া হলো। ধরে নিন স্বামীদের সাধারণ তিনগুণ সম্পত্তি আছে। যেমন–

সম্পত্তির পরিমাণ	সন্তান থাকা অবস্থায় স্বামী পাবে	সন্তান না থাকা অবস্থায় স্বামী পাবে	সন্তান থাকা অবস্থায় স্ত্রী পাবে	সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী পাবে
স্বামী ৩ লক্ষ	×	×	৩৭,৫০০	৭৫,০০০
স্ত্রী ১ লক্ষ	২৫,০০০	৫০,০০০	×	×

১৬৯. অ্যাডভোকেট সাঈদুল হক সাঈদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (ঢাকা : হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটি, সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং)।

তৃতীয় অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর স্বাধীনতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে প্রাপ্য অধিকার

বিবাহের বিধান

নারী পুরুসের বৈধ বন্ধন ও দাম্পত্য সুখী জীবন মহান আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে অন্যতম। বিবাহের বিধান সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন হয়ে থাকে, তা সবসময় একই থাকে না। বরং বিবাহ কখনো মোবাহ, কখনো মুস্তাহাব, কখনো ওয়াজিব, কখনো হারাম, আবার কখনো মাকরূহ। আল্লামা ইবনে রুশদ বলেন, জমহুরের মতে, বিবাহ মুস্তাহাব। আহলে জাহেরের মতে ওয়াজিব। পরবর্তী মালেকীদের মতে, কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ওয়াজিব, কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব, আবার কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে মোবাহ।

বিবাহের সংজ্ঞায় ইবনে আবেদীন হানাফী (র) বলেন–

النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالانثى قصدا.

এটি এমন চুক্তি যা স্ত্রীকে উপভোগ করার অধিকার দেয়।"[১]

উল্লিখিত সংজ্ঞার ওপর কেহ কেহ আপত্তি পেশ করে বলেন, দৈহিক চাহিদা মেটানোই বিবাহ নয়; বরং দাম্পত্য জীবনে দুজন সভ্য মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্বও রয়েছে। আল কুরআন প্রদত্ত ভাষ্যটি যথার্থ সংজ্ঞার পরিচায়ক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"তাঁর নিদর্শনাবলির মাঝে রয়েছে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মাঝে দয়া-মায়া স্থাপন করেছেন।"[২]

ইসলাম বিবাহের দায় দায়িত্বসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজেই দৈহিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে দায় দায়িত্বও ইসলামের পক্ষ থেকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কাজেই বিবাহে নিছক জৈব চাহিদার বিষয় নয়।

নারীর প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা

একজন তরুণীর অভিভাবক কোনোভাবেই নিজেদের পছন্দের পাত্রের সাথে তরুণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে পারবে না। প্রত্যেক পাত্রীর পিতার দায়িত্ব হলো, যখন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে তখন সে প্রস্তাবদাতার চরিত্র ও তার পরিচয় যাচাই বাছাই করবে, যেন পাত্র পাত্রী সমপর্যায়ের কি না তা নির্ণয় করা যায়।

---

১. আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, (কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শাউনিল ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩), ৪১ খণ্ড, পৃষ্ঠা.২০৫।

২. সূরা আর রূম : ২১।

ইসলাম পাত্রীর অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করেছে। তার বিশেষ অধিকারগুলো হলো–

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে নারীর বিভিন্ন অধিকার

১. স্বামী পছন্দ করার অধিকার

সুখী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর পছন্দের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই নারী এক্ষেত্রে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ অধিকার রাখে। বিবাহ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। বরং তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসা ও অনুকম্পা সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

উক্ত আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম জোর করে বিবাহ দেওয়াকে সমর্থন করে না। কারণ জোর জবরদস্তির মাঝে দয়া-মমতা থাকার প্রশ্নই আসে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, স্বামী-পরিত্যক্ত নারীর মতামত নেওয়া ব্যতীত তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। কুমারী নারীর অনুমতি নেওয়া ব্যতীত তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তার অনুমতি কেমন হবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাই হবে তার অনুমতি।[৪]

নারীর অনুমতি ব্যতীত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিবাহ দেয়া হলে সেই বিবাহ সহীহ হবে না। এরূপ অবস্থার শিকার হলে নারী তার বিবাহ বাতিল করার আইনগত ক্ষমতা রাখে।

অবশ্য ইসলাম এমন বিধানও রাখেনি যে, অভিভাবক পাত্রীকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেবে। হাদীসে এসেছে, যে নারী যদি অভিভাবকদের বাদ দিয়ে বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। মূলত উভয় হাদীসের মর্ম হলো, অভিভাবক ও পাত্রী যৌথ পরামর্শের ভিত্তিতে বিবাহের কাজটি সম্পন্ন করবে। তাদের প্রত্যেকে নিজ সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূল (স)-এর যুগে হযরত খানসা বিনতে খেযাম আনসারিয়াকে তার পিতা বিবাহ দেয়। সে ছিল স্বামী পরিত্যক্তা। কিন্তু সে ঐ বিবাহ পছন্দ করেনি। নবী করীম (স)-কে জানালে তিনি এ বিবাহ প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে কাইয়েম (র) বলেন, সাবালিকার কাছ থেকে তার সম্মতি গ্রহণ না করে তাকে বলপূর্বক বিবাহ প্রদান করা যাবে না। আবু হানীফা ও ইমাম আহমদও এক বর্ণনায় এ অভিমত পোষণ করেন।

দু'ভাবে বিবাহের অনুমতি গ্রহণ করা যায়। স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলার ক্ষেত্রে তাদের সুস্পষ্ট কথার মাধ্যমে সম্মতি নিতে হবে। আর কুমারীদের ক্ষেত্রে তাদের চুপ থাকার মাধ্যমে সম্মতি গ্রহণ করা হবে এবং সুস্পষ্ট কথার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যানের কথা জানা যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি পিতা ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক বিবাহ প্রদান করে, সে ক্ষেত্রে কুমারীর সম্মতি সুস্পষ্ট শব্দে প্রকাশ করা আবশ্যক, মৌনতা অবলম্বন বা চুপ থাকলে তা বৈধ হবে না।

---

৩. সূরা আর রূম : ২১।

৪. সহীহ আল বোখারী, বিবাহ অধ্যায়, হাদীস নং ৫১৩৬; সহীহ মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, হাদীস নং ১৪১৯।

রশিদ রেজা বলেন, পিতা যদি বিবাহ ঠিক করে তবে কন্যাকে বিবাহের বর্ণনা অবগত করানো তার জন্যে আবশ্যক। নতুবা তার চুপ থাকা যথেষ্ট হবে না। এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল, ইসলাম স্বামী নির্বাচনে নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। যে ক্ষেত্রে কুফু তথা সমতা থাকবে না, কেবল সে ক্ষেত্রেই অভিভাবক হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কারণ, নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষায় অভিভাবক সবসময় সচেতন থাকে। তার মতো কল্যাণকামী আর কেউ পৃথিবীতে নেই। সে ক্ষেত্রে সে তার জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেন নারী অপাত্রে পাত্রস্থ করা না হয়। জাহেলী যুগে নারীর সাথে দাসীসুলভ আচরণ করা হতো, ইসলাম এসে নারীর সম্মান বাড়িয়েছে, তার মানবিকতা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার ক্ষেত্র বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছে।

২. বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

জাহেলী যুগে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের ব্যক্তিগত কোনো মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল না। অভিভাবকরা তাদের ইচ্ছেমতো মেয়েদের বিয়ে দিত। রাসূলে কারীম (স)-এ প্রথা রহিত করে দেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে, বালেগা যে কোনো মেয়েকে তার কাছ থেকে মতামত নেওয়া ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন–

لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يارسول الله كيف اذنها قال ان تسكت۔

"পূর্বে বিবাহিতা অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা কোনো মেয়ের বিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া যাবে। আর কোনো কুমারী মেয়েরও বিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কীভাবে পাওয়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর চুপ থাকাই হবে তার অনুমতি।"[৫]

রাসূলে কারীম (স) আরো বলেন–

الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى نفسها واذنها صماتها وفى رواية قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها ابوها فى نفسها واذنها صمتها۔

"পূর্বে বিবাহিতা মেয়েরা তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে তাদের অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। আর কুমারী মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে। তবে চুপ থাকাই তাদের অনুমতি বলে প্রমাণিত হবে। রাসূলে কারীম (স) অন্য একটি বর্ণনায় বলেন– পূর্বে বিবাহিতা কোনো মেয়ে নিজের বিয়ের ব্যাপারে মতামত প্রদানে তার অলীর চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। আর কোনো কুমারী মেয়ের বিয়ের সময় তার পিতা তার মতামত জানতে চাইবে। যদি সে চুপ করে থেকে তবে সেটা তার অনুমতি বলে বুঝতে হবে।"[৬]

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলেন–

انها احق اى شريكة فى الحق بمعنى انها لا تجبر وهى ايضا احق فى تعيين الزوج۔

---

৫. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭১।

৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

"পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের মত জানানোর ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখে। এ কথার অর্থ হলো, মত জানানোর অধিকারে সেও শরীক রয়েছে। কাজেই কোনো বিয়েতে রাজি হওয়ার জন্যে তাকে মোটেই বাধ্য করা যাবে না। আর স্বামী নির্বাচনে সেই সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে।"[৭]

আর الايم কথাটির ব্যাখ্যা করে ইমাম যুফার (র) বলেন–

الايم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا ۔

এখানে ايم বলতে এমন সব মেয়েকে বোঝানো হয়েছে যার স্বামী নেই। চাই তার পূর্বে বিয়ে হোক বা না হোক।[৮]

কোনো ইয়াতীম মেয়ের বিয়ের সময়ও তার মতামত নেওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (স) বলেন–

لا تنكح اليتيمة الا باذنها ۔

"কোনো অনাথ ইয়াতীম মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না।"[৯]

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন–

اليتيمة تستامر فى نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها ۔

"ইয়াতীম মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার কাছ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে সে চুপ থাকলে বুঝতে হবে এটাই তার অনুমতি। আর অস্বীকার করলে তাকে মোটেও এতে বাধ্য করা যাবে না।"[১০]

একই মর্মে অন্য একটি বর্ণনায় নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

تستامر اليتيمة فى نفسها فان سكتت فقد اذنت وان ابت لم تكره ۔

"বিয়ের ব্যাপারে ইয়াতীম মেয়ের কাছ থেকে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ তথা অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য সে যদি চুপ করে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, সে অনুমতি দিয়েছে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রতি চাপ প্রয়োগে বাধ্য করা যাবে না।"[১১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

ان جارية بكرا اتت رسول الله ﷺ فذكرت ان اباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى ﷺ۔

"একজন কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল যে, তার পিতা তাকে এমন একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছে যাকে সে অপছন্দ করে। এ কথা শোনার পর নবী করীম (স) মেয়েটিকে সে ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করলেন।"[১২]

عن خنساء بنت خذام ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها ۔

"হযরত খানসা বিনতে খিযাম (রা)-এর একবার বিয়ে হয়েছিল। এরপর তিনি স্বামীহীনা হন। এমতাবস্থায় তার পিতা তাকে অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খানসা এ বিয়ে পছন্দ করেননি। তিনি

---

৭. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।
৮. হাদীস শরীফ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৯. সুনান দার কুতনী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১।
১০. সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০।
১১. মুসনাদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
১২. সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৩।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ কথা অবহিত করেন। ঘটনাটি শোনার পর নবী করীম (স) এ বিয়ে বাতিল করে দেন।”[১৩]

৩. মোহরের অধিকার

পুরুষ নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার সন্তুষ্টিলাভ এবং ও তার স্বামীর কর্তৃত্ব স্থাপনের বিনিময়ে মোহরানা ধার্য, উন্নত জীবন যাপনের সামগ্রী ইত্যাদি স্বামীর ওপর ওয়াজিব বলা আবশ্যক হয়ে যায়। স্ত্রী প্রত্যাশিত, প্রত্যাশাকারী নয়; আগ্রহের বিষয়, আগ্রহী নয়। ফলে পুরুষ তার সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে, তারপরই দাম্পত্য জীবনে সুখের পরশ নেমে আসে। স্বামী নগদ দেনমোহর প্রদান করুক বা কিছু অংশ বাকি রাখুক, এ মোহর পরিশোধ করা তার জন্যে ফরয তথা অপরিহার্য। ইসলাম পুরুষের জন্য বিবাহ ব্যবস্থাকে কঠোর না করে সহজ করে দিয়েছে। এ কারণে মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ধনী গরিবের সামর্থ্যানুযায়ী মোহর নির্ধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। মোহরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান বিসাম বলেন, বিবাহের সময় বা পরে নারীর সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে তার বিনিময়ে যা কিছু প্রদান করা হয় তাকে মোহর বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা মোহর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

“তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেয়েদেরকে মোহর প্রদান করো।”[১৪]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (র) বলেন–

هذه الاية تدل على وجوب الصداق للمرأة- وهو مجمع عليه لاخلاف فيه-

উক্ত আয়াতের দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীকে মহর দেওয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীগণ একমত পোষণ করেন। এতে কোনো বিরোধ নেই।[১৫]

নর-নারীর জীবন সুখময় এবং শান্তিময় করার লক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

“তোমরা জীবনে আরাম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ, তাদেরকে মোহর দিয়ে দাও। আর জেনে রাখো যে, এটা একটা ফরয কর্তব্য।”[১৬]

لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن ان تفرضوا لهن فريضة-

“কোনো অপরাধ হবে না তোমরা যদি তাদের স্পর্শ না করে কিংবা তাদের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্ধারণ না করে তালাক প্রদান করো।”[১৭]

---

১৩. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭১-৭২।
১৪. সূরা আন নিসা : ৪।
১৫. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
১৬. সূরা আন নিসা : ২৪।
১৭. সূরা আল বাকারা : ২৩৬।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে মোহর ওয়াজিব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে মোহর নির্ধারণের পূর্বে তালাকের বৈধতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর বিবাহ ব্যতীত তালাক হয় না। অতএব বোঝা গেল যে, মোহর উল্লেখ না করেও বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয আছে।

তবে হাদীসে মোহরের পরিমাণ কম হওয়াকে নারীর জন্যে বরকতের বিষয় এবং অধিক হওয়াকে অশুভ বলা হয়েছে। মূলত যুবকদের বিবাহ সম্পাদনে জটিলতায় না জড়ানোই সর্বোত্তম। যুবকদের ওপর অধিক মোহরের শর্তারোপ করা হলে অনেক যুবক বিবাহ করার সাহস হারিয়ে ফেলবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে। রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে ১২ উকিয়া মোহর দিয়ে বিবাহ করেন। রাসূলের চেয়ে অধিক সম্মানী কেউ নেই, কাজেই একথা মাথায় রেখে মোহরের পরিমাণ না বাড়ানোই উত্তম।

একবার হযরত ওমর (রা) বললেন, তোমরা নারীদের মোহর বেশি দিয়ো না। তখন জনৈকা মহিলা বলল, হে ওমর! তুমি একথা বলতে পারো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا তোমরা তাদের কাউকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দান করেছ।"[১৮]

এ আয়াতে নারীকে অধিক মোহরদানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হযরত ওমর (রা) ঐ মহিলার কথা শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

হানাফী ফিকহ বিশেষজ্ঞদের মতে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। কিন্তু শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে মোহর কোনো বস্তু হওয়া শর্ত নয়; বরং যে কোনো কিছু মোহর হতে পারে, যেমন– কুরআন মজীদ শিক্ষা দান করা ইত্যাদি। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) আবু তালহাকে ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে বিবাহ করেন। তাঁরা বিবাহকে জৈবিক চাহিদার ওপর আরো মূল্যবান বিষয় বলে গণ্য করতেন। মুহাম্মদ আব্দুহু তাফসীরে মানারে বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোহর যৌনাঙ্গের বিনিময় নয়; বরং ব্যক্তি ও দাসের সম্পর্কের চেয়ে এ সম্পর্ক ও বন্ধন অতি মূল্যবান। মোহর ভালোবাসার একটি নিদর্শন। এটি ইচ্ছাধীন ওয়াজিব নয়; বরং তা প্রদান করা জরুরি।

জাহেলী যুগে আরব সমাজে মহরের কোনো গুরুত্ব ছিল না। অনেক সময় মহর ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো। আর মোহরের ওপর মেয়েদেরও কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। মোহর হিসেবে যা কিছু আদায় হতো, তা মেয়েদের অভিভাবকরাই লুটপাট করে খেত। বিবাহোত্তরকালে অনেক সময় স্বামীও এ সম্পদ আত্মসাৎ করতো। কিন্তু ইসলাম নারীকে মোহরের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করেছে। সে ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে মোহর হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করতে পারে। এতে অভিভাবক, স্বামী বা অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না।

জাহেলী যুগে পুরুষের জন্য স্ত্রী গ্রহণ এবং স্ত্রী বর্জন করা একটা মামুলি ব্যাপার ছিল। ইচ্ছা হলেই যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতো, আবার ইচ্ছা হলে তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের আর্থিক কোনো দণ্ড দেওয়ার বিধান ছিল না।

---

১৮. সূরা আন নিসা : ২০।

নারীদের প্রতি পুরুষদের এই অমানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্য, নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে ইসলামি শরিয়ত মোহরকে একটি বাধ্যতামূলক অনুদানরূপে নির্ধারিত করেছে। কাজেই বিয়ের সময় স্ত্রীকে মোহর দেওয়া স্বামীর জন্যে অপরিহার্য। জাহেলী যুগে দাসীদেরকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হতো। তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। তাদেরকে মুক্ত করে বৈবাহিক মর্যাদা দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন–

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"তোমরা দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে কর এবং শরিয়তের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাদের মোহর প্রদান কর।"[১৯]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (র) বলেন–

(فانكحوهن باذن اهلهن) قال باذن مواليهن (واتوهن اجورهن) قال مهورهن-

(তোমরা দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করো।) আল্লামা শাওকানী বলেন, তোমরা তাদেরকে তাদের مواليهن বা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো। (আর তোমরা তাদেরকে اجورهن বা তাদের পাওনা প্রদান করো) আল্লামা শাওকানী (র) বলেন তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান করো।[২০]

উপরিউক্ত দু'টি আয়াতে বিয়ের ক্ষেত্রে মোহর প্রদানের নির্দেশ পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে মোহর হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরি শর্ত। প্রথম আয়াতে আযাদ ও স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসীদেরকে বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এ উভয় স্থানেই বিয়ের বিনিময়ে মোহর দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) বলেন–

ان الله سبحانه وتعالى جعل الصداق عوضا واجراه مجرى سائر اعواض المعاملات المتقابلات- فوجب ان يخرة به عن حكم النحل الى حكم المعاوضات-

"মহান আল্লাহ মোহরকে বিনিময়স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং পারস্পরিক বিনিময়সূচক সকল বিষয়ে একটা বস্তুর পরিবর্তে আপর এক বস্তুকে দেওয়ার কারবারের মতোই ধরে নিয়েছেন। অতএব, একে অনুগ্রহের দান মনে না করে একটির পরিবর্তে অপর একটি পাওয়ার মতো ব্যাপার বলে মনে করতে হবে।"[২১]

বিয়ের সময় মোহরের যে চুক্তি করা হয় তা পূর্ণ করা স্বামীর ওপর আবশ্যক। এটা তার ওপর এমনই এক দায়িত্ব যার ব্যাপারে গড়িমসি করার কোনো উপায় নেই। কাজেই এ বিষয়ে খুব চিন্তা-ভাবনা করে আর্থিক অবস্থা এবং সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বামী মোহর ধার্য করবে। কারণ এ বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। সুতরাং শরিয়ত

১৯. সূরা আন নিসা : ২৫।
২০. তাফসীর ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।
২১. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

কারো জন্য মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। প্রত্যেক স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করবে। বিত্তবান কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর হিসেবে মোট সম্পদও দিয়ে দিতে পারে। তবে ধার্যকৃত মোহরের অংশ বিশেষ সে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে রাশি-রাশি সম্পদও প্রদান করতে পার। তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তা ফেরত নেয়ার ইচ্ছা করো? এরূপ করলে তোমরা সুস্পষ্টরূপে গুনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত হবে।"[২২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র) বলেন–

اور ان میں سے ایک بیوی کو مال کا ایک خزانہ بھی دے چکی ہو تو تم اس دئے ہوئے مال میں سے کوئی چیز واپس نہ لو - کیا تم اس دئے ہوئے مال تہمت لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعہ واپس لینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم بلا وجہ اور بقصور بیوی سے مہر واپس لوگے؟ تو یہ ناحق ہے -

"তোমরা যদি স্ত্রীকে সম্পদের ভাণ্ডারও দিয়ে থাক, তবে তোমরা ঐ সম্পদ থেকে সামান্য পরিমাণও ফেরত নিয়ো না। তোমরা কি প্রদত্ত সম্পদ কোনো দোষ দিয়ে এবং অন্যায়ভাবে ফেরত নিতে চাও। তোমরা যদি বিনা কারণে এবং বিনা দোষে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর ফেরত নাও তা হলে তা ঠিক হবে না।"[২৩]

আলোচ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

"তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তা থেকে কিছু ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।"[২৪]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র) বলেন–

ان من الاحسان ان لا يأخذ الزوج من امرأته شيئا واستثنى من هذه الحالة قصة الخلع - فاباح للرجال ان يأخذ منها -

"উত্তম নীতি হলো, স্বামী স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছে তা থেকে কিছু ফেরত নেবে না। অবশ্য খুলআর ব্যাপারটা ভিন্ন। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু ফেরত নিতে পারে।"[২৫]

তবে মোহর ধার্য করে বিয়ে করার পর এবং তা আদায়ের পূর্বে স্বামীর আর্থিক অবস্থা যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি সদয় আচরণ করবে। আবশ্য মোহর ধার্য করে বিয়ে করার পর এবং তা আদায়ের পূর্বে স্বামীর আর্থিক অবস্থা যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি সদয় আচরণ প্রদর্শন করতে

---

২২. সূরা আন নিসা : ২০।

২৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী, তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, (লাহোর : মাকতাবাতু উসমানিয়া, ১৯৮২), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

২৪. সূরা আল বাকারা : ২২৯।

২৫. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, আল বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয় কিংবা তার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট মনে মোহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা তার প্রতি অনুগ্রহ বশত খুশির সাথে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তা খুবই ভালো কথা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"স্ত্রীরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয়, তবে তোমরা তা খুশিমনে ভোগ করতে পার।"[২৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাওয়ার্দী (র) বলেন–

يعنى الزوجات ان طبن نفسا عن شيىء من صداقهن لازواجهن.

"স্ত্রীরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহরের কিছু অংশ তাদের স্বামীদেরকে ছেড়ে দেয়, তবে তারা তা বিনা দ্বিধায় ভোগ করতে পারে।[২৭]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

"মোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রীরা পারস্পরিক সন্তুষ্টির বিধান যদি তার পরিমাণ কম-বেশি করে নাও, তাহলে সেক্ষেত্রে দোষের কিছু নেই।"[২৮]

জাহেলী যুগে স্ত্রীর মোহরের কোনো গুরুত্ব ছিল না। নামমাত্র মোহরের সামান্য প্রচলন থাকলেও এতে স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। মহরের নামে সামান্য অর্থকড়ি আদায় হলেও তা অভিভাবকরাই ভোগ করত। কিন্তু ইসলামে বিয়ের সময় স্ত্রীকে মোহর প্রদান করাকে একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত বলা হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত নারীকে মোহরের ওপর পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। সে তার ইচ্ছেমতো খরচ করতে, তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না।

মোহরের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলে কারীম (স) বলেন–

احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج.

"বিবাহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো, তোমরা স্ত্রীকে মোহর আদায় করবে। কারণ এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য অধিকার লাভ করে থাক।"[২৯]

মোহর ধার্য করে তা শুধু উল্লেখ করলেই চলবে না। বরং তা আদায় করতে হবে। যদিও তা কিছুটা বিলম্বে হোক। মোহর নির্ধারিত করে মনে মনে তা প্রদান না করার ইচ্ছা পোষণ করলে স্বামীকে শক্ত গুনাহগার হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নবী (স) ইরশাদ করেন–

من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى ادائه فهو زان ومن دان دينا وهو لا ينوى قضائه فهو سارق.

---

২৬. সূরা আন নিসা : ৪।

২৭. আবুল হাসান আলী ইবনে হাবীব আল মাওয়ারদী, আন নুকাত ওয়াল উয়ুনু-তাফসীরুল মাওয়ারদী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১।

২৮. সূরা আন নিসা : ২৪।

২৯. সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে এবং পাশাপাশি মনে মনে নিয়ত করে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, তাহলে সে একজন ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং মনে মনে নিয়ত করে যে তা পরিশোধ করবে না, তা হলে সে একজন চোর।"[৩০]

عن علقمه عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتي مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث۔ فقام معقل بن سنان الاشجعى فقال قضى رسول الله ﷺ فى بروع بنت واشق امراة منا بمثل ما قضيت۔ ففرح بها ابن مسعود۔

হযরত আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো যে, সেই লোকটি মোহর নির্ধারিত না করেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পূর্বেই ঐ লোকটি মারা গেছে। ঘটনাটি শোনার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, এ বিধবা মহিলা মোহরে মেছেল পাবে। অর্থাৎ, তার পরিবারের অন্যান্য মহিলার মোহরের সমপরিমাণ মোহর পাবে। এর কমও নয়, বেশিও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে তার মৃত স্বামীর সম্পদে মীরাসও পাবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই সিদ্ধান্ত শুনে মাকাল ইবনে সিনান আল আশজায়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের গোত্রের বিরউয়া বিনতে ওয়াশিক নামের এক মহিলার ব্যাপারেও রাসূলে কারীম (স) ঠিক আপনার এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।[৩১]

শরিয়ত কর্তৃক পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব করার রহস্য

পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব হওয়ার বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। যেমন–

১. প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ শক্তিধর। সে যেখানে সেখানে গিয়ে আয়-রোজগার করতে সক্ষম।
২. শরিয়ত পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ মিরাসের বিধান দিয়েছে, তার দায়িত্ব ঘর সংসার ও স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা। কাজেই পুরুষই মোহর প্রদান করবে।
৩. নারী তার স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দিয়ে পরিচিত বাসভূমি, আত্মীয়স্বজন রেখে স্বামীর বাড়িতে চলে যায়, এ অবস্থায় তার হৃদয় মনকে প্রশান্তি দিতে মোহর প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে।

বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য ও কর্তৃত্বের আওতায় চলে যায়। প্রিয় নিবাস ছেড়ে স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। কাজেই যার ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব চলবে, তার জন্যে সন্তোষজনক বিষয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি। আল্লাহর বিধানে নারীকে পুরুষের প্রশান্তির স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী বংশধারার ফসলী ক্ষেতস্বরূপ। সে তার কাছে গমন করে দুঃখ-দুশ্চিন্তা লাঘব করে। নারী স্বামীর গৃহ তদারকি করে, সন্তান লালন পালন করে, এসবের বিনিময়ে তার জীবনের বোঝা বহনের দায়িত্ব স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বামী তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে। অতএব এ কারণে স্বামীর ওপর মোহর ওয়াজিব করা হয়, স্ত্রী তার সন্তানের লালন পালনকারী, দুগ্ধদাতা ও রক্ষক। আর তার প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বশীল হিসেবে স্বামীই বিবেচিত হবে।

---

৩০. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৩১. আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাঈ, সুনান নাসায়ী, কিতাবুন নিকাহ, (মিশর : দারুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২০১১), ৫ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯।

মোহর ফরয করার মাধ্যমে ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জাহেলী যুগে অভিভাবকগণ মোহর নিয়ে যেত, নারীরা কিছুই পেত না। ইসলাম এসে মোহর নারীর হক বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

"আর নারীকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহর প্রদান কর।"[৩২]

সুতরাং অভিভাবক বা পিতা নারীর মোহরের কোনো অংশই পাবে না। পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা মোহর পায় না, তাদের পিতাগণ পাত্রকে যৌতুক দিয়ে থাকে। এ কারণে নারীকে শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হয়। অর্থোপার্জন করতে গিয়ে কোমলমতি নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে বাধা বিঘ্নতার মুখে পড়তে হয়। সুতরাং ভেবে দেখা দরকার, ইসলাম নারীর জন্যে অধিক যত্নশীল, নাকি পশ্চিমা রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থা অধিক যত্নশীল।

ইসলাম নারীর নারীত্বের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে পুরুষের ওপর মোহর আদায় করাকে ওয়াজিব করেছে। নারী অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম যে ন্যায়নীতি অনুসরণ করেছে, তা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের উচিত জীবনে সুখী হতে ইসলামের এ অমূল্য নীতির অনুসরণ করা। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ ছেড়ে দেয়, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ.

"যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে ফিরে যায় তার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব।"[৩৩]

৪. পোশাকাদি ও আহারের অধিকার

খোরাক, পোশাক ও বাসস্থান নর-নারী নির্বিশেষে সব মানুষেরই মৌলিক অধিকার। নারীর এ অধিকার পূরণের দায়িত্ব তার অভিভাবক পুরুষের ওপর বর্তাবে। নারীজীবনের তিনটি স্তরেই পুরুষ অভিভাবক তার এ অধিকার পূরণ করে থাকে। বিবাহের পূর্বে নারীর খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার পিতার। বিবাহের পর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর ওপর। আর স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর এ তিনটি মৌলিক অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার ছেলেদের ওপর।

বাপের সাথে মেয়ের সম্পর্ক এবং মা-এর সাথে ছেলের সম্পর্ক বড়ই গভীর, বড়ই নিবিড়। এ সম্পর্ক রক্তের জন্মগত কারণেই বাপের হৃদয় মেয়ের জন্যে দরদে পরিপূর্ণ থাকে। আর ছেলের হৃদয় মায়ের জন্যে মমতায় থাকে পরিপূর্ণ। কাজেই স্বভাবজাত কারণেই বাপ ভরণ-পোষণ করে মেয়ে এবং ছেলে সেবা-যত্ন করে মায়ের। তদুপরি ইসলাম বাপ ও ছেলেকে এ গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। বাপের দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের সুব্যবস্থা করা।"[৩৪]

---

৩২. সূরা আন নিসা, আয়াত-৪।

৩৩. সূরা ত্বহা : ১২৪।

৩৪. সূরা আল বাকারা : ২৩৩।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ আলী আসসাবূনী (র) বলেন–

ای علی الاب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بما هو متعارف بدون اسراف ولاتقتير لتقوم بخدمته حق القيام۔

"তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের খোরাক ও পোশাকের দায়িত্ব সন্তানের পিতার ওপর বর্তাবে। এ ব্যাপারে অপব্যয়ও করবে না, আবার কৃপণতাও করবে না। বরং ন্যায়-নীতি অনুসারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। যেন সে মহিলা সুস্থ ও সবল হয়ে যথাযথভাবে সন্তানের সেবা-যত্ন করতে পারে।[৩৫]

ইমাম যাহহাক (র) বলেন, স্বামী যদি সন্তান থাকাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তাহলে তার ভরণ পোষণ স্বামীকেই দিতে হবে। আবার ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্বও স্বামীর ওপর বর্তাবে। এটি আল্লাহর এক মহা কৌশল।

যে স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাতে পারবে না, তার উচিত স্ত্রীকে তালাক দেয়া। কেননা আল্লাহর নির্দেশ হলো–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"তাদের সাথে ন্যায়সংগতভাবে জীবন যাপন করো"।[৩৬]

যেহেতু নারীকে নিয়ে সুন্দরভাবে বসবাসের যোগ্যতা স্বামীর নেই, ফলে তাকে তালাক দেওয়াই উচিত। ভরণ পোষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে নবী কারীম (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। কারণ তোমরা তাদের আল্লাহর আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার বিনিময়ে তাদের যৌনাঙ্গ হালাল করে নিয়েছ। তাদের কারো উচিত নয় তোমাদের অনিচ্ছায় অন্যের বিছানায় যাওয়া। যদি তারা তা করে তবে লঘু প্রহার করবে। তাদের ভরণ পোষণ ও পোশাকাদি যথাযথভাবে দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব।[৩৭]

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নারীর ভরণ পোষণ ও পোশাকাদি সরবরাহ করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। স্বামীর ওপর ভরণ পোষণ ওয়াজিব করার কারণ হলো, বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীরা স্বামীদের বাড়িতে আটকা পড়ে। উপভোগ করার জন্যে নিজেকে স্বামীর নিকট সঁপে দেয়। তার উচিত স্বামীর আনুগত্য করা, ঘরে অবস্থান করা, বাড়ির কাজ পরিচালনা করা, সন্তান প্রতিপালন করা ও শিক্ষা দেয়া। অনুরূপভাবে স্বামীর দায়িত্ব নারীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা, তার জন্যে ব্যয় করা, যতদিন সে অবাধ্য না হবে ততদিন তাকে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অন্যের কাজে যে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, তার উচিত তার ব্যয়ভার বহন করা।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, স্ত্রী ধনী হোক বা গরিব হোক, স্বামী যেহেতু তাকে ভোগ করে, ফলে তার ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হবে। স্ত্রী রুগ্ণ হোক বা সুস্থ হোক, স্বামী সাথে থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

---

৩৫. মুহাম্মদ আলী আস সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, (সৌদিআরব : দারুস সাবূনী, ২০০৩), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৩৬. সূরা আন নিসা : ১৯।

৩৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভিন্ন ধরনের। স্বামী এক পরিবারের ছেলে এবং স্ত্রী অন্য একটি পরিবারের মেয়ে। ভিন্ন পরিবারের দুইটি প্রাণী বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার গড়ে তোলে। মহান আল্লাহ উভয়ের হৃদয়েই পরস্পরের জন্যে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করেন। তাই তাদের পক্ষে সারাটি জীবন এক সাথে কাটানো সম্ভব হয়। ইসলাম স্ত্রীর মৌলিক অধিকার তথা, আহার পোশাক ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। স্বামীকে এ কঠিন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন–

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।"[৩৮]

এ ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (র) বলেন–

فيه الامر لاهل السعة بان يوسعوا على المرضعات من نساءهم على قدر سعتهم ومن كان رزقه بمقدار القوت او مضيق ليس بوسع فلينفق ما اعطاه الله من الرزق ليس عليه غير ذلك۔

উক্ত আয়াতে সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী করবে। আর যাদের রিযিক সচ্ছল নয়, নিম্নমানের প্রয়োজন মাফিক অথবা সংকীর্ণ, তারা আল্লাহর দেওয়া রিযিক অনুযায়ীই ব্যয় করবে। এর চেয়ে অধিক ব্যয় করার কোনো বাধ্যবাধকতা তাদের ওপর নেই।[৩৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

"তোমরা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের উপঢৌকন দাও। এ ব্যাপারে ধনী ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী উপঢৌকন দেওয়ার যথাসম্ভব উত্তম ব্যবস্থা করবে। এটা সৎকর্মশীলদের ওপর অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।"[৪০]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আব্দুল আযীয (র) বলেন–

"সামান্য পরিমাণ অর্থ বা বস্তু দেওয়াকে মুতআ বলা হয়ে থাকে, যাকে উপঢৌকনও বলা যায়। মুতআর কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকলেও তা স্বামীর অবস্থানুপাতে হতে হবে। অবস্থাপন্ন স্বামীর অবস্থানুপাতে মূল্যবান মুতআ দেবে। আর স্বামী গরীব হলে তার সামর্থ্য অনুযায়ী মুতআ হবে। এটা ন্যায়সংগতভাবে হতে হবে। মুতআ দেয়া বাধ্যতামূলক।"[৪১]

---

৩৮. সূরা আত তালাক : ৭।

৩৯. ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৪০. সূরা আল বাকারা : ২৩৬।

৪১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয, তায়সীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, (ঢাকা : দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৫১।

আর স্ত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

"তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যেও তদ্রূপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের জীবনকে সংকটাপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট দিয়ো না।"[৪২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

(واسكنوهن) انزلوهن يعنى المطلقات يقول للازواج (من حيث سكنتم) من اين سكنتم (من وجدكم) من سعتكم على قدر ذلك من النفقة والسكنى (ولا تضاروهن) يعنى المطلقات فى النفقة والسكنى (لتضيقوا عليهن) بالنفقة والسكنى فتظلموهن بذلك.

"তোমরা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের বসবাসের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট করে দাও। তোমরা যেরূপ স্থানে বসবাস কর তাদেরকেও এরূপ স্থানে বসবাস করার ব্যবস্থা কর। তোমাদের সামর্থ্য মোতাবেক তাদের খাওয়া-পরা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের কষ্ট দেবে না। এ ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো প্রকার অবিচার করবে না।"[৪৩]

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী তার আর্থিক সামর্থ্য মোতাবেক স্ত্রীর খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর ওপরে তার সাধ্যাতীত কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। আবার স্বামীও তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করে স্ত্রীকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার অধিকার রাখে না। তার সাধ্যানুযায়ী উত্তম ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর এ মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার ছেলেদের ওপর। মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে মায়ের প্রতি ছেলেদের কর্তব্য সম্পর্কে অনেকবার গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে দুগ্ধদান করে থাকেন।"[৪৪]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইউসুফ আলী (র) বলেন–

The set of milk teeth in a human child is completed at the age of two years, which is therefore the natural extreme limit for breast-feeding. In our artificial life the duration is much less.

---

৪২. সূরা আত তালাক : ৬।

৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা), তানবীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, (করাচী : খাদীমী কুতুবখানা, তা.বি.) পৃ. ৬০২।

৪৪. সূরা লুকমান : ১৪।

মানবশিশুর দুধ-দাঁত উঠা শেষ হয় দুই বছর বয়সে। কাজেই এটিই মাতৃস্তন্য পানের প্রাকৃতিক শেষ সময়সীমা। কিন্তু আমাদের কৃত্রিম জীবনব্যবস্থায় এর সময়সীমা আরো অনেক কম।[৪৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি, বিশেষ করে মায়ের সাথে। কেননা মা তাকে খুব কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করে থাকেন। আর তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং স্তন্য দান করতে সময় লাগে কমপক্ষে ত্রিশ মাস।"[৪৬]

কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তোমার প্রতিপালক তোমাকে আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের যে কোনো একজন কিংবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তুমি তাদের সামনে 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে খুব আদবের সাথে কথা বলো। তাদের জন্য বিনয়ের ডানাকে অবনমিত করো এবং বলো, হে প্রভু! আপনি তাদের দয়া করুন, যেমনি তারা শৈশবে দয়ামায়ার সাথে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"[৪৭]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) বলেন–

"তাওহীদের পর পর সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো পরিবারের সাথে সংযোগ। এজন্যে পিতা-মাতার সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর ইবাদতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে এ সদ্ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মৃদু ও কোমল ভাষায় উচ্চারিত এই নির্দেশসমূহ এবং এই তাৎপর্যময় দৃশ্যসমূহ দ্বারা কুরআন মাজীদ সন্তানদের হৃদয়ে মাতাপিতার প্রতি দয়া ও সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি করেছে। শুধু সন্তানদের নয়, গোটা নতুন প্রজন্মের মনোযোগ আকর্ষণ করে পিতৃপুরুষ তথা পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি। এভাবে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্ম তথা পিতা-মাতার প্রতি দয়া ও মমতা জাগ্রত হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক।"[৪৮]

---

৪৫. Allama Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, U.S.A : Amanf Corp. 1983. P. 1083.

৪৬. সূরা আল আহকাফ ১৫।

৪৭. সূরা বনী ইসরাঈল ২৩-২৪।

৪৮. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, অনুবাদ : হাফেজ যুনীর উদ্দীন আহমদ, (লন্ডন : আল কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮), ১২তম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

এভাবে জীবনের সর্বস্তরে ইসলাম নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ করার জন্যে সুব্যবস্থা নিশ্চিত করে দিয়েছে।

হাদীসের বাণী : স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলে কারীম (স) ঘোষণা করেছিলেন–

فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔

"স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের কাছ থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, উত্তমরূপে তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।"[৪৯]

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

وان لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف۔

"স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য হলো, তোমরা উত্তমরূপে তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে।"[৫০]

রাসূলে কারীম (স) অন্যত্র বলেন–

الا واستوصوا بالنساء خيرا فان هن عوان عندكم۔ الا ان لمك على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا۔ الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن۔

"হে লোকসকল! খুব খেয়াল রাখো, তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। কেননা, তারা তো তোমাদের কাছে বন্দীর মতো। মনে রেখ, স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের ঠিক তেমন অধিকার আছে। সাবধান, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।"[৫১]

জনৈক সাহাবী (রা) একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার কী? রাসূলে কারীম (স) বললেন–

ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت۔

"তুমি যখন খাবে, তখন তাকেও খেতে দেবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরতে দেবে।"[৫২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) বলেন–

اى يجب عليك اطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليها لنفسك۔

"স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা তোমার কর্তব্য, যখন তুমি এগুলোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হও।"[৫৩]

---

৪৯. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, আবুওয়াবুর রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৫২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪।

৫৩. খলীল আহমদ সাহারানপুরী, বযলুল মজহুদ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন–

فى هذا ايجاب النفقة والكسوة لها ـ ليس فى ذلك حد معلوم وانما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج ـ واذا جعله النبى ﷺ حقا لها فهو لازم للزوج حضر او غاب ـ وان لم يجده فى وقته كان دينا عليه الى ان يوديه اليها كسائر الحقوق الواجبة ـ

"উক্ত হাদীসটি স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করে। এ ব্যাপারে কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তা করতে হবে। আর করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। রাসূলে কারীম (স) যখন একে অধিকার বলেছেন, তখন স্বামীর তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। সে উপস্থিত থাকুক কিংবা অনুপস্থিত থাকুক। সময়মতো আদায় করতে না পারলে তা স্বামীর ওপর অবশ্য আদায়যোগ্য একটা ঋণ হয়ে থাকবে। যেমন অন্যান্য হক বা অধিকারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।"[৫৪]

প্রত্যেক স্বামী তার সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্যে ব্যয় করবে। স্ত্রী নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ভরণ পোষণের অধিকার লাভ করবে–

১. বিবাহ বন্ধন সঠিক হওয়া।

২. স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছে সোপর্দ করা।

৩. স্বামী তার প্রয়োজনে যেখানে নিয়ে যেতে চায় তাতে স্ত্রী বাধা না দেওয়া বা আপত্তি না উঠানো।

৪. স্বামীর ভোগযোগ্যতায় সন্তুষ্ট থাকা।

সাইয়্যেদ সাবেক (র) উল্লিখিত শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এসব শর্ত যদি বর্তমান না থাকে তবে ভরণ পোষণ ওয়াজিব হবে না।

৫. মাতৃত্বের সম্মান

নারীরা সাধারণত দশ মাস পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে থাকে। ইসলাম নারীকে মাতৃত্বের মহান মর্যাদা দান করেছে।

নারী স্বীয় গর্ভে ভ্রূণ ধারণ করে, তারপর আল্লাহ একে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তন করেন। নারী গর্ভধারণ করে কোনো প্রকার কষ্ট প্রকাশ করে না; বরং সে সন্তান ধারণের কষ্টকে পরম তৃপ্তিবোধ করে, তার প্রতি যত্নশীল থাকে। গর্ভের সন্তান কোনোরূপ কষ্টে থাকুক তা সে চায় না; বরং তার জন্যে সব দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে। এজন্য গর্ভকালে ইসলাম তার প্রতি বিভিন্ন বিষয় শিথিল করেছে। যেমন গর্ভের কষ্টের কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তান ও প্রসূতির জীবনের ঝুঁকি থাকায় এ সময়ও রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। এভাবে তালাকের পর নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে, সে ক্ষেত্রে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্বামীর ওপর ভরণ পোষণ ওয়াজিব করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"নারীরা যদি গর্ভবতী হয় তবে তোমরা প্রসব পর্যন্ত তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থায় করবে।"[৫৫]

---

৫৪. আবু সুলাইমান হামদ আল খাত্তাবী, মালিমুস সুনান, (মিশর : আল মাতবাআতুল ইলমিয়্যাহ, ২০১০), ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১।

৫৫. সূরা আত তালাক : ৬।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, গর্ভবতী নারীকে তিন তালাক বা তার কম তালাক প্রদান করা হলে তার ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তায়। প্রসবের পর সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর পারিশ্রমিকও স্বামীর ওপর ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

"তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুগ্ধ পান করায় তবে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে।"[৫৬]

যদি সন্তান তার তালাকপ্রাপ্ত মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কারো দুধ পান করতে না চায়, সে ক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব সন্তানকে দুধ পান করানো এবং স্বামীর দায়িত্ব পারিশ্রমিক প্রদান করা। মাকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে সন্তানের প্রতি ইসলামের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, আর পিতামাতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো।"[৫৭]

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

"আর তোমার প্রভু সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, তোমরা শুধু কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার প্রতি সদয় হবে। তাদের দুজনের একজন বা দুজন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের দুঃখ দেবে না, বিরক্তকরভাবে ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে।"[৫৮]

পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছি, মা তাকে দুর্বল থেকে দুর্বল অবস্থায় গর্ভে ধারণ করেছে, দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার ও তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে তোমাদের।"[৫৯]

আলোচ্য আয়াতে গর্ভের ক্ষেত্রে মাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, মা সন্তানের প্রতি পূর্ণরূপে স্নেহ মায়া মমতা প্রদর্শন করেন।

---

৫৬. সূরা আত তালাক : ৬।
৫৭. সূরা : আন নিসা : ৩৬।
৫৮. সূরা আল ইসরা : ২৩।
৫৯. সূরা লোকমান : ১৪।

রাসূল (স) মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার সান্নিধ্য পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা, লোকটি বলল, এরপর কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বলল, তারপর কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার বাবা।[৬০]

আলেমগণ বলেন, মায়ের হকের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করার কারণ হলো, মা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে থাকেন, সন্তানকে অধিক স্নেহ করেন, তার সেবা করেন, তাকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও দুধপান, লালন পালন ও তার সেবা শুশ্রূষায় কষ্ট স্বীকার করে থাকেন।

রাসূল (স) মায়ের সেবাকে জেহাদের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি জেহাদ করতে চাই, এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। রাসূল (স) বললেন, তোমার মা আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তুমি তোমার মাকে নিয়ে থাক, কারণ তাঁর পায়ের নিচে তোমার জান্নাত।[৬১]

ইসলাম নারীকে মা, বোন ও স্ত্রী হিসেবে যে মর্যাদা দিয়েছে তার তুলনা কোথাও নেই। আজকে যারা নারী অধিকার রক্ষার কথা বলে বিভিন্ন সভা সেমিনার করছে, তাদের উদ্দেশ্য হীন কপট ও রহস্যঘেরা। তারা নারীর কোন অধিকারের জন্যে তৎপর, তা সুস্থ বোধবুদ্ধির অগম্য। আল্লাহর দেওয়া সম্মান অধিকার ত্যাগ করে তারা যে অধিকারের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, তা মোটেও সঠিক ও সুখবর নয়। মূলত এ সকল কিছুই গভীর ষড়যন্ত্র। পশ্চিম থেকে আসা ইসলাম বিধ্বংসী দৃষ্টিভঙ্গির বিষাক্ত আবর্জনা মুসলমানদের মনোজগতকে ক্রমাগত আঁধারে নিমজ্জিত করছে। তারা নারীর অতীত বর্তমান সম্মান কীভাবে এসেছে তা জেনেও না জানার ভান করছে। এ সকল লানতপ্রাপ্ত পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

“তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতের বাইরে প্রকৃতির কামনা-বাসনার অনুসরণ করছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।”[৬২]

ড. মুহাম্মদ রাফাত (র) বলেন, নারীরা বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন অধিকার লাভ করে থাকে। যেমন–

১. যৌন মিলনের অধিকার।

২. ন্যায়সংগত ও ভদ্রোচিত জীবন যাপনের অধিকার।

৩. সন্তানের বংশ সাব্যস্ত করার অধিকার।

৪. মিরাস বা উত্তরাধিকার লাভের অধিকার।

---

৬০. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ৫৬২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৮।

৬১. সুনান নাসাঈ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১।

৬২. সূরা আল কাসাস : ৫০।

৬. দাম্পত্য অধিকার

জাহেলী যুগে দাম্পত্য জীবনে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। দাম্পত্য অধিকার বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবটুকুই ছিল স্বামীর আয়ত্তে। নারীর সব কিছুই ছিল পুরুষের জন্যে নিবেদিত। পুরুষের ওপর তার একেবারেই অধিকারই ছিল না। কিন্তু ইসলাম দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সমঅধিকার নিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ কালামে পাকে ইরশাদ করেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যে রকম অধিকার আছে, স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের ঠিক অনুরূপ অধিকার রয়েছে।"[৬৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

"(হে স্বামীকুল জেনে রাখো) স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও তাদের ভূষণ।"[৬৪]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুস সউদ (র) বলেন–

جعل كل من الرجل والمرأة لباس للاخر لاعتناقهما واشتمال كل منهما على الاخر بالليل او لان كلا منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور.

"স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই একে অন্যের জন্যে পোশাকস্বরূপ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাতে উভয়ের নিকটতম অবস্থান এবং নিবিড় সম্পর্কের জন্য এরূপ মনে করা হয়। আর এরূপ মনে করার কারণ হলো, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের অবস্থা গোপন রাখে এবং পরস্পরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে।"[৬৫]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী (র) বলেন–

المعنى هن لكم بمنزلة الثوب ويفضى كل واحد منكم الى صاحبه و يستتربه ويسكن اليها.

এর অর্থ হলো, স্ত্রীরা হলো পুরুষদের জন্যে পোশাকস্বরূপ। পরস্পরের নিকট তারা খুব সহজেই মিলিত হতে পারে। তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ঢাকতে পারে এবং শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে।"[৬৬]

উক্ত আয়াতদু'টিতে দাম্পত্য জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো, সকল ব্যাপারে ও বিষয়েই নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মানবীয় সকল অধিকারেই নারী ও পুরুষ সমান। পোশাক নারীদের জন্যে যেরূপ প্রয়োজন, পুরুষদের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন। পোশাকের প্রয়োজনীয়তা কারো জন্যে সামান্য পরিমাণেও কম বেশি নয়। একেবারেই সমান সমান। আর পুরুষদের সেই পোশাক হলো নারীরা এবং নারীদের পোশাক হলো পুরুষেরা। দুনিয়ার ব্যবস্থাসমূহের মাঝে একমাত্র ইসলামই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে।

---

৬৩. সূরা আল বাকারা : ২২৮।

৬৪. সূরা আল বাকারা : ১৮৭।

৬৫. ইমাম আবুস সউদ মুহাম্মদ আল আমাদী, তাফসীরে আবিস-সউদ, (বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১।

৬৬. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

এছাড়া দাম্পত্য জীবনে একচেটিয়া অধিকারের সুযোগ নিয়ে পুরুষরা নারীদেরকে নানাভাবে মনঃকষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিত। ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের এ সকল অন্যায় অবিচারের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

জাহেলী যুগে নারী নির্যাতনের একটি অপকৌশল হলো, স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হলে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই আবার তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। তাকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখত। আবার পূর্ণরূপে তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণেরও সুযোগ দিত না। ইসলাম এই অমানবিক অত্যাচার থেকে নারীকে মুক্তি দান করেছে। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেন–

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী রেখে দাও কিংবা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এবং জুলুম করার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। আল্লাহর নির্দেশাবলিকে তোমরা তামাশা ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না।"[৬৭]

উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী (র) বলেন–

هذا نهى اريد به الامر بضده اى جدوا فى الاخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها.

"উক্ত নিষেধাজ্ঞায় এর বিপরীত কাজ সম্পাদন করার আদেশ এসেছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলিকে পালন করো, তদানুযায়ী আমল করো এবং তা যথাযথভাবে পালন করো।"[৬৮]

জালেম স্বামীর এই আচরণের ফলে পরিবারে চরম অশান্তির অভিশাপ নেমে আসে। এতে কেবল ঐ স্ত্রীই কষ্ট পায় না। পরিবারের সকল সদস্য এ অশান্তির অংশীদার হয়। এমনকি ঐ জালেম স্বামীও এ অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়। এ আয়াতে উল্লিখিত فقد ظلم نفسه (প্রকৃতপক্ষে সে তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে)– দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জাহেলী যুগের নারী নির্যাতনের আরেকটি কুপ্রথা ছিল– অনেক সময়েই স্বামীরা কারণে-অকারণে স্ত্রীর কাছে গমন না করার শপথ করে বসত। কখনো এ শপথের সময় উল্লেখ করত আবার কখনো সময় উল্লেখ করত না। এমনি করে কখনো অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার অনেক সময় কখনো সারাজীবনের জন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত। তাকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আবার তালাক দিয়ে অপর স্বামী গ্রহণ করার সুযোগও দিত না। ইসলাম নারীকে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

---

৬৭. সূরা আল বাকারা : ২৩১।

৬৮. শিহাবুদ্দীন আল আলূসী, রূহুল মায়ানী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন–

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"যারা স্ত্রীদের কাছে গমন না করার কসম করে, তাদের জন্য চার মাসের সুযোগ রয়েছে। এরপর তারা যদি মেলামেশা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি স্ত্রীকে একেবারে পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পই করে থাকে, তবে তালাক দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবে। মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"[৬৯]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র) বলেন–

يعنى الذين يحلفون ان لا يجامعوا نساءهم لهم اربعة اشهر بعد اليمين - فان رجعوا عن اليمين وجامعوا نساءهم من قبل ان تمضى اربعة اشهر بعد اليمين وكفروا عن ايمانهم لا تبين المرأة عن الزوج - وان اوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت اربعة اشهر وقعت عليها تطليقة بمضى اربعة اشهر-

"যারা কসম করে যে, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে না, কসমের পর তাদের অবকাশকাল হলো চার মাস। অতঃপর তারা যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই কসম থেকে ফিরে আসে এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয় এবং কসমের জন্যে কাফফারা আদায় করে, তবে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটবে না। আর তারা যদি স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হয়ে তালাকের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং এভাবে চার মাস চলে যায়, তবে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।"[৭০]

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, চার মাসের অধিককালের জন্য স্বামী স্ত্রীর কাছে গমন না করে তাকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। চার মাস পর সে তাকে গ্রহণ করবে। অন্যথায় যুলআ অথবা তালাক দেবে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরব সমাজে নারী নির্যাতনের আরো দুটি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। একটি হলো, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য করত। তাকে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত এবং তার সম্পদ আত্মসাৎ করত। আর ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরাও তার স্ত্রীর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত। আর দ্বিতীয় প্রথাটি ছিল, স্বামী স্ত্রীকে মোহর হিসেবে দেওয়া সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত। সে মোহরের সম্পদ নিয়ে যেন চলে যেতে না পারে এজন্যে তাকে তালাকও দিত না। ইসলাম নারীকে এই উভয় প্রকারের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

---

৬৯. সূরা আল বাকারা : ২২৬-২২৭।

৭০. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী, তাফসীরুস্ সমরকন্দী বাহরুল উলূম, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.

"হে ঈমানদারগণ, জোর করে নারীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদরূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে তোমরা মোহর হিসেবে যা দিয়েছ, তার অংশবিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখে কষ্ট দিয়ো না।"[৭১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

(يايها الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء) نساء ابائكم (كرها) جبرا (ولا تعضلوهن) لا تحبسوهن من التزويج نزلت هذه الاية فى كبشة بنت معن الانصارية ومحصن بن ابى قيس الانصارى وكانوا يرثون قبل ذلك (لتذهبوا بعض ما اتيتموهن) ما اعطاهن اباؤكم۔

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পিতাদের স্ত্রীদেরকে জোরপূর্বক পরিত্যক্ত সম্পদরূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়। আর তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রেখে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বাধা প্রদান করো না। কাবশা বিনতে মিআন আনসারিয়া ও মিহসান ইবনে আবু কায়েস আনসারী সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়। এর পূর্বে আরবরা তাদের পিতাদের স্ত্রীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদরূপে গণ্য করত। তাদের পিতারা স্ত্রীদেরকে যা কিছু দান করে যেত, তা আত্মসাৎ করার জন্যেই তারা এরূপ করত।"[৭২]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে নারীকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদরূপে গণ্য করা এবং জোরপূর্বক তার মোহরের অংশবিশেষ ভোগ করাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এমনিভাবে ইসলাম নারীকে যাবতীয় জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং দাম্পত্য জীবনে তার সমঅধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

৭. নারীর সদাচরণ পাওয়ার অধিকার

জাহেলি যুগে নারীরা ছিল ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার পাত্রী। তাদের সাথে সদাচরণ করা তো দূরের কথা, তাদেরকে মানুষই গণ্য করা হত না। কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলাম এ অমানবিক আচরণকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের বাণী– মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

"তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। কোনো কারণে যদি তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল না লাগে, তবে এভাবে চিন্তা কর যে, তোমরা হয়তো এমন একটি বস্তুকে খারাপ মনে করছে, যার মাঝে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে মহাকল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"[৭৩]

---

৭১. সূরা আন নিসা : ১৯।
৭২. তানবীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৭৩. সূরা আন নিসা : ১৯।

صاحبوهن بالانصاف فى الفعل والاجمال فى القول حتى لا تكونوا سبب النشوز او سوء الخلق- فلا يحل لكم حينئذ-

"স্ত্রীদের সঙ্গে কাজকর্মে সুবিচার করো এবং ভাল ও সম্মানজনক কথাবার্তা বলে একসঙ্গে বসবাস করো। যেন তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহী হওয়ার কিংবা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না হয়ে যাও। এ ধরনের কোনো কিছু করা তোমাদের জন্যে মোটেও হালাল নয়।"[৭৪]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী (র) বলেন–

بالانصاف فى الفعل واداء الحقوق والاحسان فى القول-

"স্ত্রীদের সঙ্গে সুবিচার প্রসূত কাজকর্ম করবে, ইনসাফের সাথেই তাদের হক আদায় করবে এবং ইহসানের সাথে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।"[৭৫]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"ক্ষমা এমনই এক মহৎ গুণ যা মানুষকে তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী করে থাকে। আর তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহানুভূতির কথা ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ অবশ্যই তা দেখেন।"[৭৬]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন–

By `fadl' is meant here the doing of an act of grace of bounty, that which one is not in duty bound to do; and therefore what is implied is the giving of free gifts.

এখানে 'ফাদ্‌ল' দ্বারা এমন কোনো অনুগ্রহ অথবা বদান্যতার কাজ করা বোঝায়, যা করতে কেউ বাধ্য নয়। সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে বিনামূল্যে কোনো কিছু প্রদান করা।[৭৭]

সাধারণত স্বামী ও স্ত্রী দুটি ভিন্ন পরিবারের সন্তান হয়ে থাকে। বিবাহের পর তারা একত্রিত হয়ে সংসার গড়ে। জীবনব্যাপী এক সাথে বসবাস করে। অনেক সময় তাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মানোমালিন্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একজনের কোনো আচরণে অপরজনের মন খারাপ হলে, তখন সে যদি মনে মনে এ চিন্তা করে যে, এটা তার একটি দোষ। আবার তার অনেক গুণও আছে। ঐ গুণগুলোর কথা স্মরণ করলেই তাকে ক্ষমা করা সহজ হয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যেই এই মনমানসিকতা থাকলে, অতি সহজেই সামান্য ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। ফলে উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হবে। উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের সারমর্ম এটাই।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر-

"কোনো মু'মিন স্বামী যেন তার মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কারণ তার কোনো একটি অভ্যাস যদি তার পছন্দ নাও হয়, তবে তার মধ্যে এমন অভ্যাসও আছে যা তার কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে।"[৭৮]

---

৭৪. আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাসেমী, মাহাসিনুত তাবীল, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫৮।

৭৫. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আল মাযহারী, আততাফসীরুল মাযহারী, (পাকিস্তান : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৪১২ হি.) সূরা নিসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০।

৭৬. সূরা আল বাকারা : ২৩৭।

৭৭. মাওলানা মোহাম্মদ আলী; The Holy Quran. op. cit. iii

৭৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১০৯১।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (র) বলেন–

فيه الارشاد الى حسن العشرة و النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهية خلق من اخلاقها فانها لا تخلو مع ذلك عن امر يرضاه منها۔

"আলোচ্য হাদীসে স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার স্ত্রীর কোনো একটা স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা হয়েছে। কারণ তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোনো গুণ থাকবে, যার ফলে সে তার প্রতি খুশি হতে পারবে।"[৭৯]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন– خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর জেনে রাখ যে, আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।"[৮০]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم۔

"যাদের চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, তারাই পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম বলে স্বীকৃতি পাবে।"[৮১]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله۔

"তারাই পূর্ণ ঈমানদার, যারা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের সাথে সবচেয়ে বেশি নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করে থাকে।"[৮২]

হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (র) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, তাঁর পিতা রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন–

يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعماها اذا طعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا فى البيت۔

"হে আল্লাহর রাসূল! একজন স্বামীর ওপর স্ত্রীর কতটুকু অধিকার আছে? উত্তরে রাসূলে করীম (স) বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকে খাওয়াবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় পরিধান করাবে। আর স্ত্রীর মুখমণ্ডলে কখনো আঘাত করবে না, তাকে গালি দেবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে কখনো ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে না।"[৮৩]

রাসূলে কারীম (স) আরো ইরশাদ করেন– ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم "একমাত্র মহান ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নারীদের সম্মান করে না। আর নীচ ও হীনমন্য লোক ছাড়া আর কেউ তাদের অবমাননা করে না।"[৮৪]

---

৭৯. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, নাইলুল আওতার, (মিশর : দারুল হাদীস, ১৯৯৩), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৮৯।

৮০. আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩২।

৮১. সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, আবওয়াবুর রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

৮২. সুনান তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৮৩. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫৯।

৮৪. নাসিরুদ্দীন আলবানী, আসসিল সিলাতুদ দায়ীফা ওয়াল মাউযুআ, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৯৯২), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১।

كان رسول الله ﷺ اذا خلا بنسائه الين واكرم الناس ضحاكا بساما ـ

"রাসূল করীম (স) যখন নিজ গৃহে স্ত্রীগণের কাছে যেতেন, তখন তাঁদের সাথে অতি নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার করতেন এবং তাদের সাথে হাঁসিমুখে কথা বলতেন।"[৮৫]

৮. স্বামীর ধনসম্পদ ব্যয় করার অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধন-সম্পদ ব্যয়, ব্যবহার এবং দান-খয়রাত করার অধিকার দিয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ খরচ ও দান করার জন্য স্বামীর অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

اذا نفقت المراة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب ـ

"স্ত্রী যদি স্বামীর খাদ্যদ্রব্য থেকে শরিয়ত বিরোধী এবং অহেতুক নয় এমন কাজে ব্যয় করে, তাহলে ঐ খরচ করার জন্য সে সওয়াব পাবে। আবার উপার্জন করার জন্য তার স্বামীও সওয়াব পাবে।"[৮৬]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

اذ انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره ـ

"স্ত্রী যদি স্বামীর অর্জিত সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।"[৮৭]

হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) একদিন নবী করীম (স)-কে বলল–

يا رسول الله ليس لى شيئ الا ما ادخل على الزبير فهل على جناح ان ارضخ مما يدخل على ـ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী যোবায়ের আমাকে সংসার খরচ করার বাবদ যা কিছু দেন, তাছাড়া আর আমার কিছুই থাকে না।" এ থেকে দান খয়রাত করলে কি আমার গুনাহ হবে? তখন নবী করীম (স) বললেন– اضخى ما استطعت و لا توعى فيوعى الله عليك "যতটুকু সম্ভব সদকা করতে পার, তবে নিজের তহবিলে কিছুই জমা করতে পারবে না। অন্যথা আল্লাহও তোমার শাস্তি জমা করে রাখবেন।"[৮৮]

মুযার কবিলার এক স্ত্রীলোক রাসূল (স)-কে বললেন–

يا نبى الله انا كل ابائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم

"হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের ওপর বোঝাস্বরূপ।" এ অবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ থেকে খরচ করার কোনো অধিকার আমাদের আছে? উত্তরে রাসূলে করীম (স) বললেন, الرطب تاكلنه وتهدينه "হ্যাঁ, তোমরা যাবতীয় তাজা খাদ্য খাবে এবং অপরকে হাদীয়া-তোহফা দেবে।"[৮৯]

---

৮৫. আত তাবাকাত, অনুচ্ছেদ, পরিবারের সাথে রাসূল (স)-এর আচরণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫।
৮৬. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।
৮৭. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নাফাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭।
৮৮. প্রাগুক্ত, ৫২০ পৃ.।
৮৯. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

অপর একটি হাদীসে এসেছে– وما نفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره "স্ত্রী স্বামীর আদেশ ছাড়াই যা কিছু ব্যয় করে, তার অর্ধেক সওয়াব স্বামীও পেয়ে থাকে।"[৯০] ইমাম শাওকানী (র) বলেন, এ সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে,

يجوز للمرأة ان تاكل من مال ابنها وابيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى-

অর্থাৎ, মেয়েদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা এবং অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া জায়েয আছে।

তিনি আরো মন্তব্য করেন– انه يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها بغير اذنه "স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ছাড়া ধন-সম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে জায়েয আছে।"[৯১]

ইবনে আরাবী (র) বলেন, স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-সদকা করা স্ত্রীর জন্যে জায়েয কি না– সে ব্যাপারে প্রথম যুগের মনীষীগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

অনেকের মতে দানের পরিমাণ যদি তেমন বড় না হয় বরং সামান্য হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কেউ কেউ বলেন, স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন, অবশ্য ঐ অনুমতি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম বুখারী (র)-ও এই মত পোষণ করেন। তবে অন্যায় কাজে কিংবা স্বামীর ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সর্বসম্মতভাবে সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। আবার কারো কারো মতে স্বামীর ধনসম্পদে যেহেতু স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত, কাজেই তা থেকে দান-সদকা করাও স্ত্রীর পক্ষে অবশ্যই বৈধ হবে।"[৯২]

উল্লেখ্য যে, স্বামীর অর্থ-সম্পদ এমনকি স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় স্বয়ং স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার এবং দান-সদকা করা সম্পর্কেও মুসলিম মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে–

لا يجوز لامراة عطية الا باذن زوجها وفى رواية لا يجوز للمرأة امر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها-

"স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে দান-সদকা করা বা উপহার উপঢৌকন দেওয়া স্ত্রীর জায়েয নেই। অন্য বর্ণনায় স্ত্রীর দাম্পত্য সত্তার মালিক যেহেতু স্বামী, কাজেই তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ধনসম্পদ ব্যয়-বণ্টন করা স্ত্রীর জন্যে জায়েয নয়।"[৯৩]

আলোচ্য হাদীস থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য তার নিজের ধন-মাল হতেও দান-সদকা করা ও উপহার উপঢৌকন দেওয়া জায়েয নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

তাউস ও ইমাম মালেক (র) বলেন, انه يجوز لها ان تعطى مالها بغير اذنه فى الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز الا باذنه- "স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তার ধন-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দান-সদকা করতে পারে; তার বেশি পারে না।"[৯৪]

---

৯০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০৭।

৯১. নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১২৬।

৯২. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯।

৯৩. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১।

৯৪. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

আর ইমাম লাইস (র) বলেন– لا يجوز لها ذلك مطلقا لا فى الثلث ولا فيما دونه لا فى الشيئ التافه "স্ত্রীর জন্যে তা আদৌ জায়েয নেই, এক-তৃতীয়াংশের ওপরও নয় এবং তার কম পরিমাণের ওপরও নয়। তবে খুব সামান্য পরিমাণ হলে তা ধর্তব্য হবে না।"[৯৫]

অধিকাংশ ফকীহের মত হলো, يجوز لها مطلقا من غير اذن من الزوج اذ لم تكن سفيهة فان كانت سفيهة لم يجز "স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা না হয়, তবে স্বামীর কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই সে তার নিজের ধনসম্পদ থেকে ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে। আর সে যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা হয়, তবে তা তার জন্যে জায়েয হবে না।"[৯৬]

তঁদের দলীল, রাসূলে করীম (স)-এর আহ্বানে মহিলা সাহাবীগণ তাদের অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন কিংবা যাকাত বাবদ দিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম (স) তা গ্রহণও করেছিলেন। কাজেই এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, স্বামীর অনুমতি এমনকি তার উপস্থিতি ছাড়াই স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-সদকা করা যেহেতু স্ত্রীর জন্য জায়েয, সেহেতু স্ত্রীর নিজের ধন-সম্পদ থেকে দান-সদকা করা তো সুস্পষ্টভাবে জায়েয হওয়ার কথা।"[৯৭]

ঈদের ময়দানে উপস্থিত মহিলাগণ নবী করীম (স)-এর আহ্বানক্রমে তাদের অলংকারাদি যাকাত বাবদ কিংবা জিহাদের জন্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

فذكر هن و وعظهن وامرهن بالصدقة وبلال قائد بثوبه فجعلت المراة تلقى الخاتم والخرص والشيئ-

"নবী করীম (স) মহিলাদের কাছে (ধর্মীয়) আলোচনা করলেন, তাদের উপদেশ দিলেন এবং সদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় হযরত বেলাল (রা) কাপড় ধরলেন আর মহিলারা তার উপর আংটি, কানের বালা ইত্যাদি ফেলতে লাগলেন।"[৯৮]

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলেন–

فى هذا الحديث جواز صدقة المراة من مالها بغير اذن زوجها ولا يتوقف على ثلث مالها-

"উক্ত হাদীস এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, মহিলারা তাদের ধনসম্পদ থেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই দান-সদকা করতে পারে। এ দান মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে এ জাতীয় কোনো শর্ত এখানে নেই।"[৯৯]

ইমাম শাওকানী (র) বলেন– يمكن ان يقال ان النهى للكراهة فقط وكراهة التنزيه لا تنافى الجواز "এ নিষেধের অর্থ শুধু মাকরূহ, হারাম নয়। মাকরূহ তানযীহ জায়েয হওয়ার পরিপন্থি হয় না।"[১০০]

---

৯৫. প্রাগুক্ত।
৯৬. প্রাগুক্ত।
৯৭. নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
৯৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈদায়েন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
৯৯. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৩।
১০০. নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৯. পরামর্শদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার

ইসলামি সমাজে নারীকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে। কারণ, নারী জাতি আমাদের সমাজেরই অন্যতম ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মায়ের জাতি হলো নারী। তাই পরিবারের ও সমাজের উন্নয়ন, অগ্রগতি উত্থান-পতন প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মতামত, পরামর্শ অভিযোগ ইত্যাদিকে যথাযোগ্যভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথা সমাজের সফলতা অর্জন করা মোটেও সম্ভব নয়।

শরিয়তে মহিলাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বিয়ে, খুল'আ, তালাক ইত্যাদির ব্যাপারে নারীদের মতামত নিতে হবে। অন্য কেউই তাদের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না।[১০১]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন– لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن "অকুমারী তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীদেরকে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ না নেওয়া পর্যন্ত পুনরায় বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েদেরকে তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না।"[১০২]

উক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

ان الولى لا يجبر الثيب ولا البكر على النكاح فالثيب تستامر والبكر تستاذن-

"কোনো অভিভাবক তারা অকুমারী মেয়েকে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবে না। অকুমারী মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্যে স্পর্শভাবে নির্দেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।"[১০৩]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে– لا تنكحوا اليتامى حتى تستامروا هن "তোমরা ইয়াতীম মেয়েদেরকে তাদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত এবং তাদের মতামত নেয়া ব্যতীত বিবাহ দিয়ো না।"[১০৪]

এছাড়া সমষ্টিগত বিষয় ও সামাজিক বিষয়েও ইসলাম নারীদের কাছ থেকে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দান করেছে। হযরত হাসান বসরী (র) নবী করীম (স)-এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন–

كان النبى ﷺ يتشير حتى النساء فيشرن عليه بما ياخذ به-

"রাসূলে করীম (স) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। অনেক সময় তারা এমন মতামতও পেশ করতেন, যা তিনি গ্রহণ করতেন।"[১০৫]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতিও রাসূল (স)-এর ন্যায় ছিল। হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে আল্লামা ইবনে সিরীন (র) বলেন–

ان كان عمر ليستشير فى الامر حتى ان كان ليستشير المرأة - فربما ابصر فى قولها او الشئ يستحسنه فيأخذ به-

---

১০১. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১০২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭১।

১০৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আল আইনী, উমদাতুল কারী, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০৫), ২০শ খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৮।

১০৪. আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

১০৫. ইবনু কুতাইবা আদ দিনওয়ারী, উয়ুনুল আখবার, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

"হযরত ওমর (র) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমনকি তিনি মহিলাদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের পরামর্শে কল্যাণকর কোনো বিষয় উঠে এলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।"[১০৬]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র) শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন–

اسلمت الشفاء قبل الهجرة فهى من المهاجرات وبايعت النبى ﷺ وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان عمر يقدمها فى الراى ويرضيها ويفضلها-

"শিফা (রা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তিনি হলেন হিজরতকারিণী মহিলাদের একজন। তিনি নবী করীম (স)-এর কাছে বাইয়াতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও মর্যাদাশীল সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁকে তিনি সন্তুষ্ট রাখতেন এবং অন্যদের তুলনায় অধিক মর্যাদা প্রদান করতেন।"[১০৭]

হযরত আয়েশা (রা) ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের কাছ থেকে কেসাস গ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণকালে তিনি বলেছিলেন–

كان الناس يتجنون على عثمان ويذرون على عماله فنظرنا فى ذلك فنجده بريا تقيا وفيا ونجدهم فجرة غدرة يحاولون غير ما يظهرون-

"জনগণ হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করেছিল এবং তাঁর গভর্নরদের দোষারোপ করেছিল। আমরা এ ব্যাপারে পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পেয়েছি যে, হযরত ওসমান নির্দোষ, আল্লাহভীরু ও দায়িত্ব সচেতন ছিলেন। আমরা আরো দেখতে পেয়েছি যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তারাই অপরাধী ও প্রতারক। তারা মুখে যা বলে কর্মে তার বিপরীত করে থাকে।"[১০৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, নবী করীম (স) ও তার সাহাবীগণ ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে মহিলাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং যৌক্তিক ক্ষেত্রে তাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করতেন।

এখানে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতেই নারীদের অধিকারসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। মহিলাদের উচিত, অধ্যয়ন করে তাদের এসব অধিকারের বিষয়গুলো জেনে নেওয়া এবং এ সম্পর্কে সজাগ থাকা। তাহলে রাসূলে করমি (স) তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে অবদান রেখেছেন, তারা তা অনুধাবন করতে পারবে এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্ট হতে সক্ষম হবে।

---

১০৬. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

১০৭. আল ইসতিয়াব ফী আসমাঈল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬৮-৬৯।

১০৮. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭; Zakia A. Siddiquee and Anwar Jahan Juberi, Muslim Women, New Delhi : M. D. Publication, 1993. P. 26-30.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

নর-নারীর বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনকে স্বর্গীয় পবিত্র জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই একজন পুরুষকে পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। কারণ স্ত্রী তার জীবনের অর্ধাংশ বলেই সে বিবাহের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর মাধ্যমে জীবনের আশ্রয় ও স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়। তবে অনেক সময় সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতির ভিন্নতা দেখা দিলে কিংবা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাদের মধ্যকার ঐ সম্পর্ক বহাল থাকে না। অনেক সময় তারা একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। তাই প্রকৃতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলাম তাদের জন্যে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের মতো আইন সিদ্ধ করেছে। কিন্তু একে খুবই নিকৃষ্ট কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথমত তাদের সমস্যাটি যদি সহ্য করা কষ্টকর হয় সমঝোতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করা সম্ভব না হলে উভয়ের অভিভাবককে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের অভিভাবকরা তখন স্বামীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন বিচারক নিযুক্ত করবেন। এই দুই বিচারক নিরপেক্ষভাবে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ জানার চেষ্টা করে উভয়ের মাঝে সমঝোতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মাজীদে বলেন−

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

"তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক পাঠিয়ে দাও। তারা যদি আন্তরিকভাবে স্বামী স্ত্রীর বিরোধের মীমাংসা করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব জানেন এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখেন।"[১০৯]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা ওসমানী (র) বলেন, "উভয় পক্ষের সালিস স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সদুদ্দেশ্য ও সৎ চেষ্টার বদৌলতে তাদের মাঝে বনিবনা করিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও খবর রাখেন। ফলে এখন আর স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে কোনো কষ্ট হবে না।[১১০]

উক্ত দুই বিচারক আপ্রাণ চেষ্টা করেও যদি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে অপারগ হয়ে যান, তাহলে বুঝতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ অনিবার্য। এ ধরনের অবস্থায় ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই বিবাহ-বিচ্ছেদের

---

১০৯. সূরা আন নিসা : ৩৫।

১১০. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, তাফসীরে উসমানী, অনুবাদ মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

অধিকার দিয়েছে। স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারকে তালাক এবং স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারকে শরিয়তের ভাষায় খুল'আ বলা হয়।

ইসলাম-পূর্বযুগে একমাত্র স্বামীই বিবাহ-বিচ্ছেদের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। তাতে স্ত্রীর কোনো অধিকার ছিল না। সাম্যের ধর্ম ইসলাম স্ত্রীকেও এ অধিকার দিয়েছে। দাম্পত্য জীবন সুখময় ও শান্তিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শরিয়ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই কিছু বিধি-নিষেধ জারি করেছে। তাদেরকে এই বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্যে নির্দেশও দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের পরিভাষায় এই বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনের পরিভষায় এই বিধি-বিধানগুলোকে حدود الله বা আল্লাহর সীমারেখা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো দম্পতির জীবনে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে সেই সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বামী যেভাবে তালাক দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, স্ত্রীও তেমনি খুল'আর মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম।

তালাক হলো স্বামীর পক্ষ থেকে সংঘটিত বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর খুল'আ হয়ে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। কাজেই তালাকের সময় স্বামী স্ত্রীকে মোহর হিসেবে প্রাপ্য সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে। পাশাপাশি ইদ্দতকালের খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় খরচও স্বামী বহন করতে বাধ্য। আর খুল'আর সময় স্ত্রীকে মোহরের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তদুপরি আরো কিছু অর্থ-কড়ি স্বামীকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে।[১১১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে সামান্য কিছুও ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করতে না পারার ব্যাপারে আশঙ্কা করে, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। আর তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু দিয়ে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।"[১১২]

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন–

فلا جناح على الرجل فى أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت وعلى المراة فى اعطائه-

"খুল'আর মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রী তার স্বামীকে যা কিছু দিতে রাজি হয়, স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।"[১১৩]

উক্ত আয়াত থেকেই স্ত্রীর খুল'আ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী খুল'আর জন্য যা কিছু দেয়, স্বামী তা গ্রহণ করতে পারে এবং এতে কোনো দোষ নেই।

---

১১১. Abul Hamudah, The Family Structure of Islam, India : American Trust Publications, 1977. P.50 ; Tanzilur Rahman, A Code of Muslim Personal Law, Karachi : Hamdard Academy, 1978, P. 94-101 ; Asaf A. A. Fayezi, Outlines of Muhammadan Law, Second Edition, London : Oxford University Press, 1955, P.112-13.

১১২. সূরা আল বাকারা : ২২৯।

১১৩. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০।

এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। যথা–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

ان امراة ثابت بن قيس اتت النبى ﷺ فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى اكره الكفر فى الاسلام قال رسول الله ﷺ اتردين حديقته ـ قالت نعم! قال رسول الله ﷺ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ـ

"সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাবিত ইবনে কায়েসের চরিত্র এবং ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি চাই না যে, তার সাথে ঘরসংসার করতে গিয়ে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার স্বামী তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তাকে তা ফিরিয়ে দিতে রাজি আছ? সে উত্তর দিল হ্যাঁ, আমি রাজি আছি। তখন রাসূলে করীম (স) সাবিত ইবনে কায়েসকে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।"[১১৪]

عن عائشة قالت خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا الله و رسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا ـ

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বললেন যে, তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর নবীর সহধর্মিণীরূপে থাকতে পার, আবার ইচ্ছা করলে এ বন্ধন থেকে মুক্তও হতে পার। তখন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্যাদাকে প্রাধান্য দিলাম এবং নবী-পত্নীরূপে জীবন যাপন করাকেই আমরা মেনে নিলাম। আর এ কারণে আমাদের কোনোরূপ দোষারোপও করা হয়নি।"[১১৫]

হযরত নাফি' (র) সাফিয়া বিনতে আবু ওবাইদ (রা) সম্পর্কে বলেন–

انها اختلعت من زوجها بكل شيئ لها للكم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ـ

"তিনি তার যা কিছু ছিল সব দিয়ে খুল'আ করে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)ও তা মানতে অস্বীকৃতি জানাননি।"[১১৬]

একবার ইকরামা (র) তাবেয়ীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– هل كان للخلع اصل খুল'আর কোনো ভিত্তি আছে কী? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন– ان اول خلع كان فى الاسلام فى اخت عبد الله بن ابى امراة ثابت بن قيس "ইসলামী সমাজে প্রথম খুল'আ তালাক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বোন সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রীর ব্যাপারে।"[১১৭]

হযরত ওমর (রা) একজনকে বলেছিলেন– اخلعها ولو بقرطها "তোমার স্ত্রীর কানের একটি বালার বিনিময়ে হলেও তাকে খুল'আ প্রদান করো।"[১১৮]

---

১১৪. সহীহুহ আল বুখারী, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৪।

১১৫. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪৯৬২।

১১৬. ইমাম মালেক ইবনে আনাস, মুয়াত্তা মালেক, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৫), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫।

১১৭. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

১১৮. ইবনে রুশদ আল হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৪), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীকে খুল'আর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অধিকার প্রদান করেছে। তবে এই অধিকার শর্তহীন নয়। অর্থাৎ যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, কেবল খেয়াল-খুশিমতো এ অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার নেই। যদি এমন কোনো অবস্থা দাঁড়ায়, যখন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে সে ক্ষেত্রেই স্ত্রী এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। যারা অকারণে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় হাদীসে তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন–

ايما امراة سالت زوجها طلاقا فى غير باس فحرام عليها رائحة الجنة -

"যে স্ত্রীলোক কোনো দুর্বিষহ কারণ ব্যতীত তার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।"[১১৯]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) বলেছেন– المنتزعات والمختلعات هن المنافقات "যে সকল মহিলা অকারণে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং খুল'আ প্রার্থনা করে, তারা মুনাফিক।"[১২০]

নবী (স) আরো ইরশাদ করেন– تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات "তোমরা বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিয়ো না। কারণ যে সকল পুরুষ ও মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বার বার বিয়ে করে এবং যৌনতৃপ্তির বৈচিত্র তালাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন না।"[১২১]

মহান আল্লাহ তালাক ও খুল'আ– এ দু'টি কাজকে মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁর কাছে যাবতীয় বৈধ কাজের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হলো নিকৃষ্টতম। কোনো দম্পত্তির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে আল্লাহ পাকের আরশ কেঁপে উঠে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (স) বলেছেন– ابغض الحلال الى الله الطلاق "হালাল বস্তুসমূহের মধ্যে তালাকই হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ।"[১২২]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে বললেন, হে মুয়ায!

ما خلق الله شيئا على وجه الارض احب اليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق -

"আল্লাহ তায়ালা ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে তাঁর নিকট প্রিয়তম কাজ হলো ক্রীতদাসকে মুক্ত করা। আর ভূ-পৃষ্ঠে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হলো তালাক।"[১২৩]

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন– تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش "তোমরা বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিয়ো না। কারণ তালাকের কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।"[১২৪]

---

১১৯. সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুত তালাক, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।
১২০. সুনান নাসায়ী, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৩।
১২১. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
১২২. সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫;
১২৩. সুনান দারু কুতনী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫।
১২৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী, আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, (মিশর : দারুল কুতুব, ২০১১), ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৪৯; ইসলামের সামাজিক বিধান, ৩য় খণ্ড, পৃ. প্রাগুক্ত ১৪১-১৪৫।

স্বামীর পক্ষ থেকে অবজ্ঞা অবহেলা আর উপেক্ষা পেতে পেতে নারী যখন দেখতে পাবে, তার শান্তির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তখন স্বামী তার প্রাপ্য অধিকার যেমন মেলামেশা, ভরণপোষণ থেকে তাকে বঞ্চিত করে, অথবা তার সাথে রাত যাপন করে না বা বিদেশ বিভূঁইয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করে, এ সকল অবস্থায় স্ত্রী বিচারকের কাছে গিয়ে তালাক প্রার্থনা করতে পারেন।

স্বামীর নিকট স্ত্রীর তালাক চাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ

যে সকল কারণে স্ত্রী তালাক চাইতে পারেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ–

১. অসদ্ব্যবহারের কারণে তালাক

প্রতিটি মানুষেরই দাম্পত্য জীবনে মায়া-মমতা ও সদ্ভাব ও সদাচরণ একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "স্ত্রীকে হয় ভালোভাবে রেখে দেবে না হয় উত্তমরূপে ন্যায় সংগতভাবে বিদায় করে দেবে।"[১২৫] স্ত্রী যদি দেখতে পায় যে, স্বামী তার সাথে সদাচরণ করছে না, তাহলে মামলা করলে বিচারক এক তালাকে বায়েন ঘোষণা দেবেন।

২. যৌনরোগ

স্বামী যদি যৌনক্ষম না হয় কিংবা মারাত্মক যৌনরোগে আক্রান্ত হয়, যেমন সিফিলিস, গানোরিয়া, এইডস ইত্যাদি। তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী বিচারকের নিকট আবেদন জানালে বিচারক এক তালাকে বায়েন ঘোষণা করবেন।

৩. স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি

স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রেও স্ত্রী তালাকের অধিকার রাখে। যদি তার অনুপস্থিতির মেয়াদকাল এক বছরের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিচারক তাকে এ মর্মে খবর দেবেন, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে কিংবা স্ত্রীকে তার নিজের কাছে নিয়ে নেয়। স্ত্রীকে নিজের কাছে নেওয়া কিংবা নিজে স্ত্রীর কাছে আসা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তালাক দিয়ে দেবে। স্বামী যদি এ প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিচারক এক তালাকে বায়েন ঘোষণা করবেন।

আর যদি সাক্ষী গ্রহণেযোগ্য কোনো ওযর, যেমন জ্ঞান অর্জন, চাকরি-বাকরি জাতীয় ওযর দেখতে পায়, তাহলে বিচারক তাকে একটা সময় বেঁধে দেবেন। এ সময়ের মধ্যে তাকে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসতে হবে। আদালত স্বামীকে তিন বছর সময় প্রদান করার পর স্ত্রী যদি এ সময়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে আপিল করেন, তাহলে বিচারক এক তালাকে বায়েন ঘোষণা করবেন।

৪. স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন না করা

স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন না করে, তাহলে স্ত্রী বিচারকের কাছে আবেদন করলে বিচারক তাকে এক তালাকে বায়েন ঘোষণা করবেন। আর যদি স্বামী তার অভাবের কথা জানায়, সেক্ষেত্রে আদালত তাকে সুযোগ দেবে। ঐ সুযোগের মঝে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা তার জন্যে আবশ্যক।[১২৬]

যে স্বামীর সামর্থ আছে; কিন্তু সে স্ত্রীর পাওনা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, সেক্ষেত্রে আদালত তার সম্পদ থেকে ব্যয় করার আদেশ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে তার কফিল জিম্মাদার যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ বহন করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেবে না। অবশ্য ফকীহ ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন ইমাম মালেক (র),

---

১২৫. সূরা আল বাকারা : ২২৯।

১২৬. ড. ইমাম মুহাম্মদ উমারা ইয়ামীন, হারাকাতু তাহরীরিল মারআতি ফী মীযানিল ইসলাম, (রিয়াদ : দারুল কিবলাতাইন, ২০০৩), পৃ. ৩৪৩।

শাফেয়ী ও আহমদ (র) বলেন, যে স্বামী স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয় তবে তাকে তালাক দেওয়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্বামীর অভাবের মুহূর্তে তালাকের নির্দেশ দেওয়া সঠিক নয়।

খোলা

স্ত্রীর তালাক চাওয়ার পদ্ধতিকে খোলা বলা হয়। আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন, স্ত্রী তার অপছন্দের স্বামীর কাছ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য যদি বিনিময় প্রদান করে তবে সেই তালাক গ্রহণকে খোলা বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ, বিবাহ বিচ্ছেদের দরুন স্বামী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। স্ত্রী সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, তা তাকে প্রদান করে তার থেকে তালাক প্রার্থনা করবে। আর স্বামী বিনিময় গ্রহণ করে স্ত্রীকে তালাক দেবে।

খোলার শর্তাবলি

১. স্বামী যদি স্ত্রীকে ঘৃণা বা অপছন্দ করে, তবে খোলা হয় না। স্ত্রী যদি স্বামীকে ঘৃণা করে, তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রী বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে। অপর দিকে স্বামী যদি স্ত্রীকে অপছন্দ করে, তাহলে হয় তালাক দেবে, নতুবা ধৈর্য ধারণ করে থাকবে।
২. স্ত্রী যে পর্যন্ত এমন আশঙ্কা করবে যে, এ স্বামীর সাথে বসবাস করা এবং এ সংসারে আল্লাহর বিধান রক্ষা করা সম্ভব নয়, ততক্ষণ খোলা তালাক প্রার্থনা করতে পারবে, নতুবা পারবে না।
৩. স্বামী যদি স্ত্রীকে এ কারণে কষ্ট দেয়, স্ত্রী যেন খোলা করতে বাধ্য হয়, তাহলে স্বামীর জন্যে বিনিময় নেয়া হালাল হবে না। স্বামী যে পরিমাণ অর্থ স্ত্রীকে মোহর ও অন্যান্য কারণে দান করবে, খোলার ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ অর্থই ফেরত চাইবে, তার চেয়ে বেশি নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“তালাক হবে দুটি। তারপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রেখে দেবে কিংবা উত্তমভাবে বিদায় করে দেবে। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়েছ তন্মধ্য থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। হ্যাঁ, যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে মুক্তি চাইলে তাতে কারো অপরাধ নেই। এ হলো আল্লাহর সীমা, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না।”[১২৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, সাবেত ইবনে কায়স (রা)-এর স্ত্রী রাসূল (স)-এর নিকট এসে বলল হে রাসূল! আমি সাবেতের চরিত্র ও দ্বিনদারীর ব্যাপারে কোনোরূপ দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমি ইসলামের মাঝে কুফরী অপছন্দ করি না। রাসূল (স) বললেন, তোমাকে সে যে বাগানটি দিয়েছে, তুমি কি তা ফেরত দেবে? সে বলল হ্যাঁ।[১২৮]

---

১২৭. সূরা আল বাকারা : ২২৯।
১২৮. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ৪৯৭৩।

দাম্পত্য জীবনে সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত ইসলামের যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আলোচনা করলাম তাতে স্পষ্ট হয়, ইসলামই মানুষের বন্ধু, নারীর মর্যাদাদানকারী। আর যারা মানব রচিত ধারণা থেকে মানুষকে ও মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তারা সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস করেছে, নারীর ইজ্জত সম্মান নিয়ে টানাহেঁচড়া করেছে। এরপরও যারা ইসলামি রীতিনীতির সমালোচনা করবে তারা পথভ্রষ্ট, শয়তানের দোসর। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

"তুমি কী লক্ষ করেছ সে খেয়ালখুশিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ। অতঃপর, আল্লাহ ব্যতীত কে তাকে পথনির্দেশ করবে।"[১২৯]

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

"হে রব! তুমি হেদায়াতদানের পর আমাদের অন্তরসমূহকে গোমরাহ করো না এবং আমাদেরকে তোমার নিকট হতে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি অনেক দানকারী।"[১৩০]

নারীর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা

নারী স্বামীর মৃত্যুর কারণে বৈধব্য বা তালাকপ্রাপ্তা অথবা খুলয়ার কারণে স্বামীহারা হলে ইসলাম তাদেরকে পুনরায় বিয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু নির্দেশনা রয়েছে, নিচে তা উল্লিখিত হলো।

ক. দ্বিতীয় বিবাহে আল কুরআন-এর নির্দেশনা

মহান আল্লাহ কালামে পাকে ইরশাদ করেন– أَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ "তোমরা বিধবা এবং তালাক ও খুলয়া প্রাপ্ত মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও।"[১৩১]

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

(و انكحوا) زوجوا (الايامى منكم) بناتكم واخواتكم ويقال بنتكم اخواتكم ممن ليس لهن ازواج -

"তোমরা বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের ঐ সকল মেয়ে এবং বোনদেরকে, যাদের স্বামী নেই।"[১৩২]

আল্লামা মুফতি শফি (র) বলেন– আলোচ্য আয়াতের ايامى শব্দটি ايم-এর বহুবচন। এর অর্থ খুব ব্যাপক। যে মেয়েদের বিয়েই হয়নি, স্বামীর মৃত্যুর ফলে যারা বিধবা হয়েছে এবং তালাক অথবা খুলয়ার কারণে যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে– এসব শ্রেণির মেয়েরাই ايامى-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হলো কৌমার্য, বৈধব্য, তালাক এবং খুলয়ার কারণে স্বামীহীনা মেয়েদেরকে তোমরা বিয়ে দিয়ে দাও।[১৩৩]

---

১২৯. সূরা আল জাসিয়া : ২৩।

১৩০. সূরা আলে ইমরান : ৮

১৩১. সূরা আন নূর : ৩২।

১৩২. তানবীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

১৩৩. তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২।

বিধবা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, সেই বিধবা মহিলারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত থাকবে।"[১৩৪]

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ কতদিন বিয়ে থেকে বিরত থাকবেন সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদের নির্দেশ হচ্ছে–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔

"তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন হায়েয কাল পর্যন্ত বিয়ে করা হতে বিরত থাকবে।"[১৩৫]

মাওলানা দরিয়াবাদী (র) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন–

"স্ত্রীর জন্য এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হিকমত, রহস্য ও স্বার্থ-কুশলতা নিহিত আছে। একদিকে স্বামী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়।"[১৩৬]

আর বেশি বয়স্কা এবং গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"বয়স বেশি হওয়ার দরুন যে মহিলাগণের হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সন্দেহ দূর করার জন্য তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর অল্প বয়সের দরুন যে মেয়েদের হায়েয আরম্ভই হয়নি, তাদের ইদ্দতও তিন মাস। আর গর্ভবতী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"[১৩৭]

ইমাম তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

التى قد ارتفع حيضها فعدتها ثلاثة اشهر واجل كل حامل ان تضع ما فى بطنها ـ

"যে মহিলার মাসিক হয় না, তার উদ্দত তিন মাস; আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত তার গর্ভের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"[১৩৮]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

---

১৩৪. সূরা আল বাকারা : ২৩৪।

১৩৫. সূরা আল বাকারা : ২২৮।

১৩৬. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

১৩৭. সূরা আত তালাক : ৪।

১৩৮. আবু জাফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী, জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআন, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ২০০০), ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

“বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে শরীয়ত অনুযায়ী এবং প্রচলিত রীতি নীতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, সে জন্যে তোমাদের পুরুষদের কোনো দায়িত্ব নেই বা কোনো কিছু করণীয় নেই।”[১৩৯]

ইমাম শাওকানী (র) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন–

اذ طلقت المرأة اومات عنها زوجها فاذا نقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتصنع وتعرض للتزويج ـ

“যখন কোনো মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হবে কিংবা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করার ফলে বিধবা হবে, তখন ইদ্দত উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে যদি সুসজ্জিতা হয়, দেহে রং লাগায় এবং বিয়ের জন্যে প্রস্তুতি নেয় ও কথাবার্তা চালায়, তাতে তার কোনো গুনাহ বা দোষ হবে না।”[১৪০]

এ সম্পর্কে ইমাম রাযী (র) বলেন–

اذا انقضت هذه المدة التى هى اجل العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف ـ اى ما يحسن عقلا وشرعا ـ لانه ضد المنكر الذى لا يحسن وذلك هو الحلال من التزوج اذا كان متجمعا لشرائط الصحة ـ

“ইদ্দতের সময় যখন শেষ হয়, তখন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বুদ্ধি বিবেচনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। আর معروف কথাটি منكر-এর বিপরীতার্থবোধক। منكر-এর অর্থ যা ভালো নয়। কাজেই শুদ্ধ হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে বিবাহের সিদ্ধান্ত একটি বৈধ ব্যাপার।”[১৪১]

বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তার ইদ্দত পালনের কোনো বিধান নেই, এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দিবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দিবে।”[১৪২]

---

১৩৯. সূরা আল বাকারা : ২৩৪।

১৪০. আল ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩।

১৪১. ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী, আত তাফসীরুল কাবীর (মাফাতীহুল গাইবি), (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুবাসিল আরাবী ১৪২০ হি.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৮

১৪২. সূরা আল আহযাব : ৪৯।

আল্লামা তাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– يعنى من احصاء اقراء ولا اشهر تحصونها عليهن "কুরু কিংবা মাস কিছুই তাদের গণনা করতে হবে না।"[১৪৩] এক্ষেত্রে তাদের অর্ধ মোহর। কিংবা মোহর উল্লেখ না থাকলে সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তমভাবে বিদায় দিবে। অন্য আয়াতে তাদেরকে ইদ্দত পালনের নামে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন– ولا تمسكوا هن ضرارا لتعتدوا "আর তোমরা তাদেরকে জ্বালতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।"[১৪৪]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা তাদের জন্যে নির্ধারিত ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ে করতে পারবে। এ বিষয়ে তাদের সামনে আর কোনো বাধা নেই। অতএব, নারীদের দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশও নেই।

খ. দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর হাদীস

কোনো নারী যেন বৈধ উপায়ে যৌনতৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত না হয়, এ জন্য ইসলাম তাদের জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং বৈধব্য, তালাক, অথবা খুলয়ার কারণে কোনো মহিলা স্বামীহীনা হলে অবিলম্বে তাকে পুনর্বিবাহ দেওয়ার জন্যে ইসলাম তাগিদ দেয় এবং উৎসাহিত করে। রাসূল (স)-এর এ ব্যাপারে বহু হাদীস বিদ্যমান। নবী করীম (স) এবং তাঁর চার খলিফার যুগে অতি সহজেই মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যেত।[১৪৫]

মিসওয়ার ইবনে মাখযাম (র) বর্ণনা করেন–

ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفات زوجها بليل فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت۔

"সুবাইয়া আল আসলামিয়া স্বামীর মৃত্যুর একদিন পর সন্তান প্রসব করেন। নিফাসের অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত হলে তিনি নবী (স)-এর কাছে যান এবং দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলে কারীম (স) তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।"[১৪৬]

হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর সঙ্গে আতিকা বিনতে যায়েদের বিয়ে হয়েছিল। বিশেষ কোনো কারণে হযরত আবু বকর (রা) তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ মোতাবেক আবদুল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দেন। কিন্তু এ কাজের জন্য তাঁর খুব মনস্তাপ ও দুঃখ হয়। কারণ, তিনি আতিকাকে খুব ভালোবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ দেখে হযরত আবু বকর (রা) আতিকাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য অনুমতি দিলে তিনি তাকে আবার বিয়ে করেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শহীদ হন। এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতিকাকে বিয়ে করেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত উমর (রা) এবং তারপর হযরত

১৪৩. জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২১।
১৪৪. সূরা আল বাকারা : ২৩১।
১৪৫. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৫৬; মুহাম্মদ আবদুল মাকসুদ, আল মারআতু ফী জামিয়েল আদইয়ান ওয়াল উসূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।
১৪৬. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২।

যুবায়ের (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত যুবায়ের (রা) শহীদ হলে হযরত আলী (রা) তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতিকা নিজেই তা অস্বীকার করেন।

সুহায়লা বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিল পর পর চারজন অর্থাৎ হযরত হুযাইফা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আউফ (রা), আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ এবং শামাখ ইবনে সাঈদের সঙ্গে।

আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত আলী (রা)-এর ভাই হযরত জাফর (রা)-এর সাথে। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে হযরত আলী (রা) তাঁকে বিয়ে করেন।

হযরত আলী (রা)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত উমর (রা)-এর সাথে। হযরত উমর (রা) শহীদ হলে আওন ইবনে জাফরের সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত হয়। আওনের ইন্তেকালের পর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ তাঁকে বিয়ে করেন।[১৪৭]

আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের মেয়ে জামিলার বিয়ে হয়েছিল হযরত হানযালা (রা)-এর সাথে। হযরত হানযালা (রা) ঐতিহাসিক উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তখন সাবিত ইবনে কায়েস তাঁকে বিয়ে করেন। সাবিতের মৃত্যুর পর মালিক ইবনে দুখশাম এবং সর্বশেষে হাবীব ইবনে লিয়াফ তাকে বিয়ে করেন।

মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ও প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের দ্বিতীয় বিয়ে দূষণীয় বা অপছন্দনীয় ছিল না। এ কারণে সে যুগে ব্যাপকভাবে নারীদের অধিকবার বিয়ে হয়েছে।

পুরুষের একাধিক বিয়েতে বাধা প্রদান

ইসলামী আইনই সর্বপ্রথম মানুষের স্বভাবের কথা বিবেচনা করে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য উপযোগী বিধান প্রণয়ন করেছে। প্রাক ইসলামি যুগে কোনো কোনো জাতির মাঝে স্বভাববিরোধী নানা নীতিমালা বিরাজমান ছিল। ইসলাম স্বভাববিরোধী সকল নীতিমালার পরিবর্তন সাধন করেছে, যাবতীয় পবিত্র জিনিস হালাল করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"বলুন, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তা এবং পবিত্র রিযিকসমূহকে কে হারাম করেছে? বলুন, পার্থিব জীবনে এসব নেয়ামত মুমিনদের জন্য, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এ সব মুমিনদের জন্যে।"[১৪৮]

ইসলামি শরিয়তে পার্থিব জীবনে পবিত্র জিনিস ত্যাগ করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি; বরং পবিত্র জিনিস ভোগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন— يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

"হে রাসূল! তোমরা পবিত্র জিনিসসমূহ খাও এবং নেক কাজ কর।"[১৪৯]

---

১৪৭. আত তাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।

১৪৮. সূরা আল আরাফ : ৩২।

১৪৯. সূরা আল মুমিনূন : ৫১।

আল্লাহর বাণী– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা খাও।[১৫০]

ইসলাম মানুষকে বৈরাগী জীবন পরিত্যাগ করে সংসারমুখী হতে নির্দেশ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

"তোমাদের যা খুশি নারীদের বিয়ে কর, দুই দুইটি বা তিন তিনটি বা চার চারটি।"[১৫১]

ইসলাম মানুষকে বস্তু ত্যাগ করতে বলেনি; বরং বৈধভাবে তা উপার্জন করার উৎসাহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র জিনিস থেকে ব্যয় কর।"[১৫২]

সব বিষয়ে ইসলাম মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। অপব্যয় মনস্তাত্ত্বিক ও ইন্দ্রিয় রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া অপচয়কারী স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে পড়ে। সে তার অর্জিত পবিত্র জিনিস দ্বারা আল্লাহর ইবাদতে সাহায্য নেয় না।

ইসলামের এ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি সকল বিবেক-বোধসম্পন্ন লোকের নিকট যথার্থ এবং যৌক্তিক। তবু ইসলামের কোনো কোনো বিষয়ে প্রাচ্যবিদ ও তাদের দোসর সাঙ্গরা আপত্তি উত্থাপন করে। এর মধ্যে একাধিক বিয়ের বিষয়টি অন্যতম। যারা একাধিক বিয়ের বিরোধী তাদের যুক্তি হচ্ছে, একাধিক বিয়ের দ্বারা প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোই প্রধান উদ্দেশ্য। মনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে একাধিক বিয়ে করা হয়। তাছাড়া একাধিক বিয়ে করলে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। বিশেষত আধুনিক যুগে নারীরা পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে। একাধিক বিয়েতে নারীর সামাজিক অগ্রগতি থেমে যায়, তার মানবিকতা বিনষ্ট হয় আর অধিকার হয় ধ্বংস।

যেসব লোক একাধিক বিয়ে ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন তাদের মধ্যে কাসেম আমিন অন্যতম। তিনি বলেন, لا ارى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمة، وهو علامة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره فى طلب اللذائذ. "একাধিক বিবাহ পাশবিক চাহিদা মেটানোর জন্যে একটি শরয়ি কলা-কৌশল। এটি স্বাদ অন্বেষণে গিয়ে চরিত্র বিনষ্ট ও অনুভূতি ত্রুটিপূর্ণ করার হাতিয়ার।"[১৫৩]

কাসেম আমিন ছাড়াও প্রাচ্যবিদরা না বুঝে না শুনে বিষয়টি নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছে এবং নানা অপবাদ দিয়েছে। তাদের বক্তব্যের গোপন রহস্য প্রফেসর আবদুল মাহমুদ আবদুল ফাত্তাহ তার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

---

১৫০. সূরা আল বাকারা : ১৭২।

১৫১. সূরা আন নিসা : ৩।

১৫২. সূরা আল বাকারা : ২৬৭।

১৫৩. কাসেম আমিন, তাহরীরুল মারআহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৬) ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২।

انهم - اى المستشرقين وغيرهم من اعداء الاسلام ينظرون اليه على انه نظام بدائى ينتقص من مكانة المرأة لصالح الرجل وعلى حساب كرامتها وانه بمثابة الاغلال والقيود التى تعوق حركتها وتهضهم حقوقها وتهدر ادمتها .. وان تحريرها منه يعتبر خطوة فى سبيل تقدمها لانه فى رأيهم نظام لايتمشى وتطور المجتمع وانه لابد ان تتساوى المرأة بالرجل وتعدد الزوجات لايحقق تلك المساواة.

"ইসলামের শত্রু প্রাচ্যবিদগণ মনে করে, একাধিক বিয়ে আদিম সভ্যতা, এটি নারীর মর্যাদাহানিকর, নারীর সম্মান ও মনুষ্যত্ববিরোধী। একাধিক বিয়ে থেকে নারীকে পরিত্রাণ দেওয়া তার উন্নতি অগ্রগতির শামিল। তাদের মতে, একাধিক বিয়েতে সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত এবং পুরুষের মাঝে যে ভারসাম্য থাকা জরুরি তা বাধাগ্রস্ত হয়।"[১৫৪]

প্রাচ্যবিদরা একাধিক বিয়েকে মন্দ মনে করেন এবং এজন্য ইসলামকে দায়ী করেন। তারা মনে করেন, একাধিক বিয়ের ফলে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে যায়। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি তো আছেই।

এ মত সমর্থন করে প্রফেসর আদেল আহমদ সারকেস বলেন, একাধিক বিবাহ নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে। কেননা একাধিক বিয়ের দরুন নারীরা খেয়ানতের প্রতি পা বাড়ায়। কোনো নারী তার স্বামীকে অন্য কোনো নারীর সাথে মিশতে দিতে পছন্দ করে না। তাই এরূপ মেশা তার দৃষ্টিতে খেয়ানত। এভাবে সমাজে যদি দাম্পত্য অসততা হাঁটু গেড়ে বসে, তাহলে নারীরা স্বামী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। যে মুহূর্তে বিভিন্ন সংস্থা জন্মনিয়ন্ত্রণের আওয়াজ তুলেছে, সেক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে বিরোধপূর্ণ। তাছাড়া একাধিক বিয়ে অধিক সন্তান জন্মদানের পথ তৈরি করে। তবে বিস্ময়ের কথা হলো, যারা একাধিক বিবাহের বিরোধিতা করে তারাই একাধিক বিবাহের সঙ্গে জড়িত এবং যারা নারীর অধিকার খেয়ানতের কথা বলেন তারাই নারীর অধিকারের খেয়ানত করছেন।[১৫৫]

প্রকৃতপক্ষে একাধিক বিবাহের নিয়ম শুধু ইসলাম প্রথম অনুমোদন করেনি, তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও একাধিক বিবাহের অনুমোদন আছে। ইসলাম শুধু চার বিবাহ পর্যন্ত সীমিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

তাওরাতে বর্ণিত একাধিক বিবাহ

তাওরাতে বর্ণিত আছে, "কোনো নারী তার বোনকে সতীন হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতো না। কারণ জীবদ্দশায় তার নিকট তার গোপন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার আশংকা আছে।"[১৫৬]

অন্যত্র আছে, "তারা দেখলো, রমণীগুলো সুন্দরী, তারপর তারা পছন্দমতো নারী গ্রহণ করলো।"[১৫৭]

এছাড়া হযরত দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে, তাঁরা শত শত স্ত্রী ও দাসী গ্রহণ করেছেন। তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর সাতশ স্ত্রী ও তিনশ দাসী ছিল। পরবর্তীতে ইয়হুদীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল তালমুদ গ্রন্থের অনুসরণে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করে। তাদের মতে একাধিক বিবাহ বৈধ নয়। দ্বিতীয় দলের মতে পূর্বের স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ অবিচার না করে একাধিক বিবাহ করা বৈধ।[১৫৮]

---

১৫৪. শায়খ আবদুল মুনসিফ মাহমুদ, দাহযু শুবহাতিন ওয়ামুফতারায়াতি হাওলাল ইসলাম, (মিশর : মাজমাউ বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ১৩২।
১৫৫. অধ্যাপক আদেল আহমদ মারকেস, আযযাওয়াজু ওয়া তাতাওয়ারুল মুজতামায়ি, (মিশর : দারুল কিতাবিল আল আরাবী তা.বি.) পৃ. ২০৪।
১৫৬. হারাকাতু তাহরীরিল মারআতি ফী মীয়ানিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।
১৫৭. প্রাগুক্ত
১৫৮. মুরাদ ফারজ, শিআরুল খিদরি ফিল আহকাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৩-৮৪।

ইঞ্জিল কিতাবে একাধিক বিবাহ

হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মুসা (আ)-এর শরীয়তের পরিপূরক। সুতরাং মুসা (আ)-এর শরীয়তে একাধিক বিবাহের যে বৈধতা রয়েছে, তা ঈসা (আ)-এর শরীয়তে বহাল থাকাই যুক্তিগ্রাহ্য কথা। ইঞ্জিল কিতাবে একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত নির্দেশনা অস্পষ্ট। বর্তমানে আমাদের সামনে যে ইঞ্জিল কিতাব রয়েছে তা পরিবর্তিত ও বিকৃত। তবু একাধিক বিবাহের ব্যাপারে বর্তমান ইঞ্জিলের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. হযরত ঈসা (আ) বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য নারীকে বিয়ে করে, সে যেন তার মায়ের সাথে যেনা করে, আর কোনো নারী তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অপর ব্যক্তিকে বিয়ে করলে সেও যেন যেনা করলো।[১৫৯]

২. হযরত মাসীহ (আ) তালাক প্রদানে নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর সাথীদের বলেন, "তোমরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় হযরত মুসা (আ) তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আদিকালে এ প্রথা ছিল না।"[১৬০]

   এখানে আদিকাল দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর সময়কে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু সে সময়ের উদাহরণ দেওয়া যথার্থ হবে না। কেননা তখন ভাইবোনের মাঝে বিয়ে বৈধ ছিল, কিন্তু সে নীতি আমরা এখন অনুমোদন করি না।

৩. ঈসা (আ) বলেন, তোমরা পড়েছো, আদিকালে দুজন নারী পুরুষ তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, এজন্যে যে কোনো ব্যক্তি তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, আর দুজন মিলে এক দেহে পরিণত হয়। দু'দেহ আর দু'দেহ থাকে না, তখন তারা এক দেহে পরিণত হয়। আর আল্লাহ যাকে এক করে দেন, কোনো মানুষ তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

ড. আবদুন নাসের আত্তার বলেন, উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে কোনো কোনো মসীহ ফকীহ একাধিক বিবাহ অবৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, বিবাহ দু'দেহকে এক করে দেয়; সুতরাং তা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না,[১৬১] কিন্তু আমরা ইঞ্জিলের এ বক্তব্য গ্রহণ করতে পারি না। কেননা এ ইঞ্জিল মানব রচিত। আল্লাহ প্রদত্ত ইঞ্জিল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গির্জার পাদরীদের মধ্যে দু'টি গ্রুপ লক্ষ করা যায়, একদল জীবনের সমর্থক, অপর দল বৈরাগ্যবাদের বিরোধী। প্রথম দলের মতে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ আর দ্বিতীয় দল একাধিক বিবাহের পক্ষে।

জুরজী যায়দান বলেন, "একাধিক বিয়ে অবৈধ হওয়ার পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না। খ্রিস্টানরা চাইলে তা তাদের জন্যে বৈধ হতো, কিন্তু তাদের প্রবীণ নেতারা পারিবারিক শৃঙ্খলার জন্যে এক স্ত্রীকে উপযোগী বিবেচনা করেন। পরবর্তীকালে এ বিবেচনাই খ্রিস্ট সমাজে একাধিক বিবাহ হারাম হওয়ার ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে।"[১৬২]

প্রফেসর মুহাম্মদ ইবরাশী বলেন, জাস্টিনিয়ান রচিত সিভিল আইনে একাধিক বিবাহ না জায়েয বা হারাম করা হয়, কিন্তু ইঞ্জিলে তা স্পষ্ট নয়। খ্রিস্টানদের মাঝে একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে এসে একাধিক বিয়ের জন্যে শাস্তির আইন হওয়ায় খ্রিস্টানরা তা অবৈধ মনে করে।[১৬৩]

---

১৫৯. ইঞ্জিল মারকুস, দশম অধ্যায়, আয়াত ১০-১২।

১৬০. ইঞ্জিল মাতী, উনবিংশ অধ্যায়, আয়াত ১৮।

১৬১. আবদুন নাসের আল আত্তার, তাআদ্দুদিয যাওজাত। (মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ৯৮।

১৬২. ড. মুস্তফা আল সিবাঈ, আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন। (মিশর : দারুল ইসলাম, ৪র্থ সংস্করণ ২০১০) পৃ. ৭২।

১৬৩. মুহাম্মদ আতিয়্যাহ আল ইবরাশ, আযমাতুর রাসূল (স)। (মিশর : দারুস সালাম ১৯৮৮) পৃ. ২৬৩।

আধুনিককালের পাদ্রীরা একাধিক বিবাহ অবৈধ বা হারাম হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। মিসরসহ আরব অনারব দেশের খ্রিস্টান পাদরীরা একই রূপ অভিমত প্রকাশ করেন। যেমন আরসুযাকাস বলেন, বিবাহ টিকে থাকা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী কারোর পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করা বৈধ নয়।

"আরমান আরসু যাকাস আরো বলেন, বিদ্যমান বিবাহ বাতিল করার পূর্বে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ নয়।"[১৬৪] সারিয়ান অর্থোজেরাস বলেন, ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এ নীতি অবলম্বন করে। অনুরূপভাবে প্রোটেস্টানদের মতে, বিবাহ হচ্ছে জীবন যতদিন থাকে ততদিনের জন্য একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে জায়েযভাবে মিলিত থাকা।

খ্রিস্টানরা একাধিক বিবাহের বিপক্ষে থাকার কারণ দুটি–

১. তারা মনে করে, নারীরা পুরুষকে ইবাদত থেকে দূর রাখে।

২. বিবাহের প্রতি ঘৃণা।

খ্রিস্টানরা যেহেতু দ্বিতীয় বিবাহ পছন্দ করে না, তাই গির্জায় দ্বিতীয় বিবাহের অনুষ্ঠান প্রথম বিবাহের মতো জাকজমকপূর্ণভাবে হয় না; বরং সামান্য কিছু দোয়া প্রার্থনা দ্বারা এ অনুষ্ঠান শেষ করা হয়, কিন্তু কিছুসংখ্যক পাদরী দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। তাদের দলিল হলো, প্রথম শতাব্দীগুলোয় একাধিক স্ত্রী গ্রহণে গির্জার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সার্লম্যান পাদরীর দু'স্ত্রী ও কয়েকজন রক্ষিতা ছিল। হেসের রাজা ফিলিপ ও ব্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের দুজন করে স্ত্রী ছিল। তাদের বিবাহের মন্ত্র পড়ান পাদরী লুসিয়ান। তিনি চরম সাহসিকতার সাথে একাধিক বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। **১৫৩১** খ্রিস্টাব্দে তিনি মুনেসটারে এক বক্তৃতায় বলেন, যে প্রকৃত খ্রিস্টান হতে চায় তার উচিত হবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা।

ইউরোপীয় চিন্তাবিদ জোশেফ লিবান ও থমাস একাধিক বিয়ের পক্ষে অনুমোদন দেওয়ার আহ্বান জানান। তাদের মতে, একাধিক বিবাহ অনুমোদনের ফলে প্রতিটি নারী গৃহকর্ত্রী এবং বৈধ সন্তানের জননী হবে।

উল্লিখিত অভিমতসমূহ যেসকল গির্জার পক্ষ থেকে একাধিক বিবাহ হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয় সেখানে শোরগোল সৃষ্টি করে। এদিকে আফ্রিকার গির্জাগুলোও একাধিক বিবাহের অনুমোদন দেয়।[১৬৫]

একাধিক বিয়ের ব্যাপারে খ্রিস্টানরা যেহেতু একমত হতে পারেনি, তাই আমরা বলতে পারি, ইঞ্জিলে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ আইনটি নিতান্তই মানব রচিত। আর যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া কথা বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

"তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট কে আছে, যে আল্লাহর পথ ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করবেন না।"[১৬৬]

---

১৬৪. হারাকাতু তাহরীরিল মারআতি ফী মীযানিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

১৬৫. তাআদ্দুদিয যাওজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩।

১৬৬. সূরা আল কাসাস : ৫০

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তীকালে আরব সমাজে বিদ্যমান একাধিক বিবাহ

অনেকেই মনে করেন, ইসলাম পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রীতিনীতি মেনে চলেনি। তাদের মতে, একাধিক বিবাহের ধারণা ইসলামের সৃষ্টি, কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা অমূলক। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের লাগামহীন নীতিগুলো শর্তযুক্ত করেছে। মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ এমন কোনো বিধান নেই যা ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছে; বরং যেখানে কোনো পক্ষের কল্যাণে অপরপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে ইসলাম ক্ষতিরোধের নীতি গ্রহণ করেছে। ইসলামের এ উদারতার প্রমাণ, জাহেলী যুগের আরবগণ বহু বিবাহের ফলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতো। ইসলাম তাদের চার স্ত্রী রেখে বাকিদের তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের চার বিবাহ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করে দেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন−

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

“অতএব তোমরা তোমাদের পছন্দমতো দুটি বা তিনটি বা চারটি নারীকে বিবাহ কর।”[১৬৭]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন গায়লান ইবনে সালামা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। অপর বর্ণনায় আটজনের কথা পাওয়া যায়। তাঁর সাথে তার স্ত্রীরাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (স) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি তাঁদের চারজনকে রেখে বাকি স্ত্রীদের তালাক দাও।

হযরত উমাইর আসাদী (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের সময় আমার আজটন স্ত্রী ছিল। নবী করিম (স)-এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করার পর তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্য হতে চারজনকে রাখ।[১৬৮]

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাকীফ গোত্রের এক লোক মুসলমান হওয়ার সময় তার দশজন স্ত্রী ছিল, তিনি তাদের মাঝে চারজনকে রেখে বাকিদের পৃথক করে দেন।

উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, একাধিক বিবাহের বিষয়টি ইসলামের চাপিয়ে দেয়া কোনো বিধান নয়; বরং ইসলাম একাধিক বিবাহের ওপর কতিপয় শর্ত যোগ করে নারীর অধিকার সুরক্ষা করেছে। যেমন স্ত্রীদের ভরণ পোষণ নিশ্চিত করা, ইনসাফ কায়েম করা, পালা বণ্টনে সমতা রক্ষা করা প্রভৃতি। এসব শর্ত পূরণে ব্যর্থ ব্যক্তিকে এক বিবাহে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা−

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

“আর যদি ইনসাফ করতে না পারার আশংকা থাকে তবে একজনকেই বিয়ে করবে, কিংবা মালিকানাধীন দাসীদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।”[১৬৯]

ইসলাম চার বিবাহ বৈধ করেছে। একাধিক বিবাহে মোহর, ভরণ পোষণ ও ইনসাফের শর্তারোপ করেছে। যদি কেউ এসব শর্ত পূরণ করতে না পারে, বস্তুগত বিষয়ে ইনসাফ করতে না পারে, যেমন খানা পিনা, আবাসিক ঘর বাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে না পারে, তাহলে এক বিবাহে সীমিত থাকা ওয়াজিব, কিংবা দাসীদেরই যথেষ্ট মনে করবে।[১৭০]

---

১৬৭. সূরা আন নিসা : ৩৩।

১৬৮. সুনান ইবন মাজাহ, আবওয়াবুত তালাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

১৬৯. সূরা আন নিসা : ৩।

১৭০. শাইখ মুহাম্মদ আল আবাসিরী খলীফা, আল মারআতু ওয়াত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়াহ (কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮৪), পৃ. ৯৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুরুষের একাধিক বিয়েতে ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছে। নিম্নে একাধিক বিয়ের শর্তসমূহ কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হলো–

স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান

ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দান করেছে, তেমনি স্ত্রীদের মাঝে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি শর্তারোপ করেছে। কোনো পুরুষ বস্তুগত বিষয়াদি, যেমন খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, বাসস্থান ও রাত বণ্টনে ইনসাফ রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু মনোজগতে তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সে দায়ী থাকবে না। তবে কোনো একজনের প্রতি পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে অপরজনকে বঞ্চিত করা বা ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ.

“আর তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, কাজেই তোমরা একজনের প্রতি পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে অন্যজনকে ঝুলন্ত রেখে দেবে না।”[১৭১]

একদল লোকের মতে, একাধিক বিবাহ জায়েয না হওয়ার কারণ হলো ইসলাম যেসব শর্ত সাপেক্ষে তার অনুমোদন দিয়েছে, কেউ খুব সহজে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে না। তাই একাধিক বিবাহ হারাম হওয়াই যৌক্তিক,[১৭২] কিন্তু তাদের এ অভিমত কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। যেমন–

প্রথমত : ইসলাম নতুনভাবে একাধিক বিবাহ প্রথা চালু করেনি; বরং পূর্ব হতেই একাধিক বিবাহের যে প্রচলন ছিল তা পরিমার্জিত করেছে এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় চারটি পর্যন্ত জায়েয রেখেছে। এ বৈধতার জন্য আবার কতিপয় শর্তও জুড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা মানুষের সাধ্যাতীত বলা হয়েছে। এখানে উভয় আয়াতের সমন্বিত ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রথম আয়াতে যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান সংক্রান্ত আর দ্বিতীয় আয়াতে যে অসমর্থের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মনের আকর্ষণে ইনসাফ বাস্তবায়ন করা কখনো সম্ভবপর নয়। মনের মালিক আল্লাহ, তিনি যেভাবে চান তা নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং ব্যক্তির সাধ্যাতীত বিষয়ে জবরদস্তি করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত : সমতা দ্বারা স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীদের মাঝে খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় ও বাসস্থানে ন্যায়বিচার করার নিয়ত রাখা উদ্দেশ্য। যেহেতু বিয়ের আগে ন্যায়বিচার প্রকাশের সুযোগ নেই, তাই আল্লাহ ন্যায়বিচারের বিষয়কে সঠিক নিয়তের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যারা সঠিকভাবে ন্যায়বিচার করবে ও সৎকাজ করবে, তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেন–

---

১৭১. সূরা আন নিসা : ১২৯।

১৭২. তাআদ্দুদিয যাওযাতি মিনান নাওয়াহিদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল ইজতিমাইয়্যাহ ওয়াল কানূনিয়্যাহ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৮।

وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"আর তোমরা যদি সৎকর্ম কর ও আল্লাহকে ভয় কর, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে খবর রাখেন।"[১৭৩]

জাগতিক বিষয়ে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পর স্বামী যদি মনের ভালোবাসা সকল স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করতে না পারে সেজন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কারণ, মনের নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূল (স) স্ত্রীদের মাঝে রাত বণ্টনের পর বলতেন, "হে আল্লাহ! এ হলো তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়; কাজেই যে বিষয় তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আমি মালিক নই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করো না।"[১৭৪]

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, একাধিক স্ত্রীর মাঝে আন্তরিক মহব্বতের তারতম্য হতে পারে, তাই এ কারণে একাধিক বিয়ে হারাম হওয়া যৌক্তিক নয়। আমাদের যাদের একাধিক সন্তান আছে, তারা কেউ বলতে পারবেন না যে, তারা প্রত্যেক সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসেন। এ বাস্তব বিষয় আমরা সবাই বুঝতে পারি, কিন্তু এজন্য একাধিক সন্তান জন্ম না দেয়ার দাবি আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। সুতরাং একই কারণে একাধিক বিবাহ হারাম হওয়ার যুক্তি দেখানো স্বভাববিরোধী বক্তব্য বৈ আর কিছুই নয়।

কাজেই যারা একাধিক বিবাহ হারামের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং অনুমোদন প্রদান করায় ইসলামের নিন্দা করেন, তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের পশ্চিমা সমাজের অনুরূপ বিপর্যয়ে ফেলা এবং তাদের দ্বীন থেকে বিমুখ রাখা। মুসলিম জাতির ধর্মপ্রাণ সদস্যদের উচিত হবে আল্লাহর নীতি ও শিক্ষা গ্রহণপূর্বক সফল জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"আর আমার এ পথ সোজা, কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর, অন্যান্য পথসমূহের অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, এ হচ্ছে তোমাদের প্রতি তাঁর উপদেশ, আশা করা যায় তোমরা বিরত থাকবে।"[১৭৫]

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতার অধিকার

আইয়ামে জাহেলিয়াতে আরব সমাজের অনেকেই নিজেদের নিকট পালিতা ইয়াতীম মেয়েদেরকে তাদের ধন-সম্পদ এবং রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করত। কিন্তু তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করত না, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করত না, এবং স্ত্রীর অধিকারও দিত না। ইসলাম ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি এ দুর্ব্যবহার প্রতিরোধ

---

১৭৩. সূরা আন নিসা : ১২৮।
১৭৪. যাদুল মা'আদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।
১৭৫. সূরা আল আনয়াম : ১৫৩।

করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিল যে, "তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদেরকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে না পার এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করো না। বরং তোমাদের পছন্দমতো অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে কর। তাহলে তাদেরকে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে"।

সে যুগে দেখা যায়, আবার অনেকেই একাধিক বিয়ে করতো। কিন্তু তাদের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করত না, তাদের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ করত না। একাধিক স্ত্রীর প্রতি এ দুর্ব্যবহার প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইসলাম নির্দেশ দিল যে, "তোমরা যদি একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করতে না পার তবে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ কর।

উল্লিখিত দু'টি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

"তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করে তাদের প্রতি ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর, তবে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমতো দু'জন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে করতে পার। আবার যদি একাধিক বিয়ে করে তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর তবে মাত্র একজনকে বিয়ে কর অথবা তোমাদের অধিকারে দাসী হিসেবে যে সব মেয়ে আছে তাদের বিয়ে করো। এটাই হবে কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে অন্যদের প্রতি জুলুম না করার জন্যে সবচেয়ে বেশি অনুকূল তথা উত্তম ব্যবস্থা।"[১৭৬]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা আলাউদ্দীন (র) বলেন–

يعنى وان خفتم يا اولياء اليتامى ان لا تعدلوا فيهن اذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب۔

"হে ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকগণ! তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, এই ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে করলে তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে তাদের বিবাহ না করে, তোমাদের পছন্দমতো অন্য মেয়েদের বিবাহ কর।"[১৭৭]

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন–

لا يكثر من تعولون اذا اقتصر المرأة على واحدة وان اباح له اكثر منها۔

"একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও একজনমাত্র গ্রহণ করে ক্ষান্ত হলে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়, এমন লোক বেশি হবে না।[১৭৮]

১৭৬. সূরা আন নিসা : ৩।

১৭৭. আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ আল খাযেন, তাফসীরুল খাযেন, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।

১৭৮. তাফসীরে কাশশাফ, (আল কাশশাফ আন হাকায়েকে গাওয়ামিযিত তানযীল), (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

আল্লামা আলাউদ্দীন (র) এ প্রসঙ্গে বলেন–

(فان خفتم) يعنى فان خشيتم وقيل فان علمتم (الا تعدلوا) يعنى بين الازواج الاربع - (فواحدة) يعنى فانكحوا واحدة -

"যদি তোমরা আশঙ্কা কর অথবা যদি বুঝতে পার যে, চারজন স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে মাত্র একজন মহিলাকে বিয়ে কর।"[১৭৯]

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা ও সুবিচার রক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা, সমান যত্ন নেওয়া এবং মৌলিক দাবিসমূহ যথার্থভাবে পূরণ করা। আর এ সব করতে হবে আদল ও ইনসাফের সাথে।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য দাবিসমূহ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির দাবি বৈষয়িক, আরেক শ্রেণির দাবি আত্মিক তথা প্রেম, ভালোবাসা, হৃদয়ের টান বা আকর্ষণ প্রভৃতি। বৈষয়িক দাবিসমূহের ক্ষেত্রে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা সম্ভব। কেননা এগুলো বাহ্যিক বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আত্মিক দাবিসমূহের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ এগুলো হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষের হৃদয় তো আল্লাহর হাতে। এর উপর মানুষের হাত নেই।

বৈষয়িক দাবিসমূহের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মুসলিম মনীষীগণ বলেন–

العدل المشروط هو العدل المادى فى المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه العدل -

"একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে যেসব বিষয়ে আদল তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, রাতযাপন এবং দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন সব বিষয়, যাতে আদল ও ইনসাফ রক্ষা করা সম্ভব।"[১৮০]

আর মানসিক দাবিসমূহ পূরণ করতে পূর্ণমাত্রায় সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, এ ব্যাপারে যত প্রবল কামনা ও ইচ্ছাই পোষণ করো না কেন। তবে তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কোনো একজনের প্রতি এমনভাবে পূর্ণমাত্রায় আকৃষ্ট হবে না, যাতে অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে হয়। তোমরা যদি স্বীয় কর্মনীতি সংশোধন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন।"[১৮১]

---

১৭৯. তাফসীরুল খাযেন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

১৮০. আর মারআতু বায়নাল ফিকহি ওয়াল কানূন, পৃ. ৯৮।

১৮১. সূরা আন নিসা : ১২৯।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

ولن تستطيعوا ايها الرجال ان تسووا بين نسائكم فى حبهن بقلوبك حتى تعدلوا بينهن فى ذلك - لان ذلك لاتملونه ولو حرصتم فى تسويتكم بينهن فى ذلك -

"হে পুরুষগণ! তোমরা তোমাদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যে তাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণের বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। তাই এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তোমরা তো এ জিনিসের মালিক নও। কাজেই যত বেশি ইচ্ছা ও কামনাই পোষণ কর না কেন, তাদের মধ্যে তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না।"[১৮২]

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা এবং যৌন সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে আদল ও সমতা রক্ষা যে সম্ভব নয়, তার বাস্তব কারণও রয়েছে। একজনের একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কেউ অধিক সুন্দরী হবে, কেউ হবে কুশ্রী, কেউ হবে যুবতী আর কেউ হবে অধিক বয়স্কা; কেউ হবে স্বাস্থ্যবতী আর কেউ হবে রুগ্না; কেউ হবে মিষ্টভাষী, আর কেউ হবে কটুভাষী; কেউ হবে শান্তিপ্রিয়া আর কেউ হবে ঝগড়াটে, কেউ হবে খোশমেজাজী আর কেউ খিটখিটে মেজাজী;। এ সব কারণে এক স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর আকর্ষণ হয় কম আর অপর স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হয় বেশি। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য কোনো স্বামীকেই দোষ দেওয়া যায় না। এটা মনের ব্যাপার। এর উপর কারো হাত নেই। এ কারণেই এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।[১৮৩]

মোটকথা একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী স্বামীর জন্যে স্ত্রীদের মধ্যে বৈষয়িক দাবিসমূহ পূরণে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্য করণীয়। এ প্রসঙ্গেই প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আদল' এর বিশ্লেষণে ইবনুল আরাবী (র) বলেন–

معناه القسم بين الزوجات والتسوية فى حقوق النكاح وهو فرض -

"এর অর্থ হলো স্ত্রীদের মধ্যে রাত ভাগ করে দেওয়া এবং বিয়েজনিত অধিকারসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা। আর এটাই হচ্ছে ফরয।"[১৮৪]

সুতরাং বোঝা গেল, যে ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, ইসলামি শরিয়ত তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

ইসলামি শরিয়তে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে একাধিক বিবাহের অনুমোদন প্রদান করেছে। নিচে কুরআন-হাদীসের দলিল ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিরিখে তা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হবে।

১. নারীর বন্ধ্যাত্ব সমস্যা

একজন পুরুষ বিয়ের পর সন্তান কামনা করে এটিই স্বাভাবিক। তার স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তবে তার সন্তানের পিতা হওয়ার ইচ্ছা অপূরণীয়ই রয়ে যায়। এক্ষেত্রে পুরুষের সন্তানলাভের ইচ্ছা কার্যকর করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ের

---

১৮২. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৪৩।

১৮৪. আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩) ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮০।

সুযোগ দেওয়া যথার্থ, নাকি তার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ না দেয়া যথার্থ হবে? একাধিক বিয়ের আলোচনায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে।

যে কোনো বোধসম্পন্ন বিবেকবান ব্যক্তি এমন সন্ধিক্ষণে স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ দানের কথা বলবেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মঙ্গলার্থে সে নীতিরই অনুমোদন দিয়েছেন মাত্র।

জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া

কোনো কোনো সময় দেখা যায় হাড় বা গোশত বৃদ্ধির ফলে নারীর জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে যোনি ও পায়ুপথ এক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় সম্পর্কে ইসলাম যৌক্তিক সমাধান দিয়েছে। স্ত্রীর অপারগতায় পরকীয়ার চাইতে বৈধভাবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমোদন দিয়ে ইসলাম মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

আবার দেখা যায়, কখনো নারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা সেরে ওঠারও সম্ভাবনা থাকে না, তার কোনো শক্তিও থাকে না। সে ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থান কী হবে? আমরা কী তাকে বলব, জীবনসাথীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ তুমি জীবনের স্বাদ আহ্লাদ-আনন্দ বিসর্জন দাও, দ্বিতীয় বিয়ে করো না, তাহলে তার প্রতি জুলম করা হবে। এ অবস্থায় তার নিজের পরিবারের দেখা শোনা এবং প্রথমা স্ত্রীর দেখা শোনার জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের বিকল্প নেই। এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে সুযোগ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে মাত্র।

তবে জেনে রাখা উচিত, শুধু পুরুষের স্বার্থ রক্ষায় ইসলাম দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ দিয়েছে, বিষয়টা এমন নয়; বরং নারীর অধিকার বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তাকেও বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে। যেমন সে দেখল স্বামীর যৌন ক্ষমতা নেই, অথবা নপুংসক, এরূপ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ চাইতে পারে।[১৮৫]

যৌনতা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যৌবনে পৌঁছার পর মানুষ যৌনতার কারণেই বিবাহ করার প্রতি উৎসাহী হয়। কোনো স্ত্রী শারীরিক দুর্বলতার কারণে যদি যৌনতায় দুর্বল হয় আর স্বামী তাতে তৃপ্ত না হয়, সে ক্ষেত্রে স্বামী তার যৌন তৃপ্তির জন্যে কি না-জায়েয কাজে পা বাড়াবে, নাকি বৈধভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করবে। নিশ্চয় নিষিদ্ধ কাজে না জড়িয়ে তার দ্বিতীয় বিয়ে করা যুক্তিসংগত হবে।

আফ্রিকা মহাদেশে সন্তানের দুধপান ও গর্ভকালে স্ত্রী সহবাস দূষণীয়, সে ক্ষেত্রে স্বামীর যৌন বাসনা পূরণের উপায় কি হবে? নিশ্চয় জায়েয পন্থায় স্ত্রী গ্রহণই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হবে। অন্যথা যৌন চাহিদা পুরণ করতে গিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণায় স্বামীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হবে।[১৮৬]

২. নারীর প্রতি প্রেম ভালোবাসা

প্রেম-ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। সমাজজীবনে মানুষের প্রেম ভালোবাসা আছেই। তাই এমনও হতে পারে স্বামী প্রেমিকাকে বিয়ে না করে বিদ্যমান স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। কখনো এমন হয়, বিয়ের আগে স্বামী তার প্রেমিকার সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। এ ক্ষেত্রে তাদের বিয়ের সুযোগ দেওয়া না হলে অনেক ক্ষেত্রেই

---

১৮৫. হারাকাতু তাহরীরিল মারআতি ফী মীযানিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

১৮৬. ড. তাওফীক আল আত্তার, তায়াদ্দুদিয যাওজাত মিনান নাওয়াহী আদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল ইজতিমাইয়্যাহ ওয়াল কানূনিয়্যাহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ, ১৯৮৫) পৃ. ২৪।

নাজায়েয পন্থায় যৌনসম্ভোগে জড়িয়ে যেতে পারে। ইসলাম তাকে ইনসাফের শর্তে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে এবং না-জায়েয পন্থায় কোনো নারীর সাথে যৌন মেলামেশা করতে নিষেধ করেছে।

শায়খ আবু যোহরা বলেন, কোনো স্বামী যদি নিশ্চিত থাকে, দ্বিতীয় বিবাহ করলে সে ইনসাফ করতে অপারগ হবে, তবে সকল ফকীহর ঐকমত্যে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা হারাম।[১৮৭]

এ প্রসঙ্গে ড. আবদুন নাসের তাওফীক বলেন, যদিও পরনারীর প্রেম সর্বক্ষেত্রে একাধিক বিয়ের কারণ নয়। তদ্রূপ আইন করে একাধিক বিবাহ হারাম করাও যৌক্তিক নয়। বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্তির পথচ্যুত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে, সে মুহূর্তগুলোতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা উপকারী।

ইসলামে একাধিক বিয়ে করা হারাম না করার কারণ মানুষকে অপচয় ও যেনা থেকে রক্ষা করা। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়রা একাধিক বিবাহ হারাম করে যেনা ব্যভিচার জায়েয করে দিয়েছে। তাই তাদের সমাজে অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, নারীর মর্যাদা তুচ্ছ জিনিসে পরিণত হয়েছে।

প্রফেসর শালাবী বলেন, এক দেশের নেতা একাধিক বিয়ে হারাম ঘোষণা দেন। তার সামনে একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এরূপ- এক বিবাহিত লোকের কয়েকজন সন্তান আছে, এক পর্যায়ে তার স্ত্রী যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে তার জন্যে দুটি সুযোগ আছে– যেনা করা অথবা দ্বিতীয় বিয়ে করা। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে আইনে নিষিদ্ধ। এখন সে কি করবে?

সে দ্বিতীয় বিয়ে করে স্ত্রীকে দূরে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। স্ত্রী হিসেবে সে তার নিকট যাতায়াত করে, সেখানে রাত যাপন করে, কিন্তু একাধিক বিয়ে করার কারণে প্রচলিত আইনের চোখে সে দোষী। এক পর্যায়ে পুলিশ সংবাদ পেয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে সে জানায়, মহিলাটি তার প্রেমিকা, স্ত্রী নয়। তখন পুলিশ তাকে মুক্তি দেয়।[১৮৮]

১৯৭৪ সালে শায়খ গাযালী মুহাম্মদ আবদুহু হলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, তিউনেসিয়ায় এক লোকের বিরুদ্ধে একাধিক বিয়ের অভিযোগ আনা হয়, আদালতে সে স্ত্রীকে প্রেমিকা প্রমাণ করে মুক্তি পায়।

প্রফেসর শালাবী উল্লেখ করেন, প্রাচ্যবিদ ফ্রান্সিস বলেছেন, আলজেরিয়া ফ্রান্সের অধীনে থাকাকালে তিনি সেখানকার বুসাআদা শহরে দু'যুগ সময় অবস্থান করেন। এক সময় আলজেরিয়ায় বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তখন সেখানে তিনটি বিষয় অধিক পরিলক্ষিত হতো–

১. চিরকুমারী, ২. পথশিশু, ৩. গোপন রোগের আধিক্য।[১৮৯]

পরবর্তীকালে যখন বহু বিবাহ বৈধ করা হয় তখন এ তিনটি বিষয় খুব কমই দেখা যায়।

একাধিক বিয়ে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর তা ওপরের ঘটনা থেকে অনুমান উপলব্ধি করুন। ইসলামের শত্রুরা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ আইন করে মানব জাতির মাঝে ফেতনা ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়।

---

১৮৭. শেখ মোহাম্মদ আবু যোহরা, আল উসরাহ ওয়াতানযীমুল নছল (বৈরূত : দারুল ফিকর আল আরাবী, ১৯৮৫) পৃ. ৬২।

১৮৮. তায়াদ্দুদিয যাওজাত, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২।

১৮৯. মুহাম্মদ শালাবী, মাআ রাঈদিলিল ফিকরিল ইসলামী (মিশর : দারুল ওহী, ১৯৮২), পৃ. ৮৮।

৩. স্ত্রী পছন্দ না হওয়া

নানা কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনীহা অনাগ্রহ অপছন্দের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। যেমন অসুন্দর হওয়া, চরিত্র মন্দ হওয়া, আচরণ খারাপ হওয়া প্রভৃতি। মানব জীবন আবেগযুক্ত নয়। মানবহৃদয়ে কখনো ভালোবাসা কখনো ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মাঝে অপছন্দের দ্বন্দ্ব যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তারা পরস্পরের প্রতি ইনসাফ রক্ষা করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে কি করা উচিত? নিশ্চয় দুজনের দুপথে চলা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। তবে কোনো একটি অপছন্দের কারণে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয়াও উচিত নয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে নিজেদের সামান্য ভুল বুঝাবুঝি, পছন্দ অপছন্দ জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে সমাধান করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

"আর তোমরা সদ্ভাবে জীবন যাপন কর, যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর তবে হয় তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করবে, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।"[১৯০]

হাদীস শরীফে আছে, عن ابى هريرة ﷺ قال رسول الله ﷺ لايفرك مومن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বর্ণনা করেন, কোনো মুমিন কোনো মুমিনাকে যেন ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো চরিত্র অপছন্দের হয় তবে অন্য কোনো চরিত্র পছন্দের হবে।[১৯১]

তবে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে সে ক্ষেত্রে বিচ্ছেদই শান্তির উত্তম উপায়। বিচ্ছেদ হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

"আর তারা যদি পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে স্বীয় সামর্থ্য থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন; আল্লাহ সামর্থ্যবান ও বিজ্ঞ।"[১৯২]

৪. দীর্ঘ প্রবাস জীবন

অনেক পুরুষকে দেখা যায় প্রয়োজনে তারা দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকেন। এ সময় স্ত্রী সাহচর্য তার খুবই প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু সে কি করবে? হয় অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে, নতুবা জায়েয পন্থায় বিয়ে করবে। এ দুটির মাঝে তার জন্যে কোনটি উত্তম? নিশ্চয়ই বিবাহ করাটাই তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। তাহলে সমাজে অশ্লীলতা ছড়াবে না, অবৈধ সন্তানের জন্ম হবে না।

যুক্তি, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও বাস্তব সমাধান হলো একাধিক বিয়ে পুরুষকে হারাম থেকে রক্ষা করে থাকে।

---

১৯০. সূরা আন নিসা : ১৯।

১৯১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রাদাই, বাবুল ওয়াসিয়্যাতি বিন নিসা, হাদীস নং ২৬৭২।

১৯২. সূরা আন নিসা : ১৩০।

স্বামীর স্বার্থই প্রধান নয়, স্ত্রীও যদি স্বামীর দীর্ঘ প্রবাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেনায় জড়ানোর ভয় হয়, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী আদালতে তালাক চাইতে পারে। ইসলাম কারো ক্ষতি যেমন সমর্থন করে না, তেমনি কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও সমর্থন করে না।

স্বামী এক বছর বা তারও বেশি সময় অনুপস্থিত থাকলে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে। যদিও স্বামী স্ত্রীর জন্যে ব্যয় করার মতো অর্থ রেখে যায়।

অনুপস্থিত স্বামীর কাছে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হলে বিচারক তাকে একটা সময় নির্ধারণ করে দেবেন। বলে দেবেন, যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে স্ত্রীর সাথে অবস্থান না করতে পারে তবে সে তাকে তালাক দিয়ে দিলো, নতুবা স্ত্রীকে তার নিকট নিয়ে যাক। আদালতের নির্দিষ্ট করা সময়ের মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করলে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।[১৯৩]

৫. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা

কোনো কোনো সময় ঝগড়া কলহের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় এবং স্বামী অপর একটি বিয়ে করে। পরক্ষণে বোধোদয় হয়, তালাকপ্রাপ্তাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। যেমন দুধের শিশু থাকলে কিংবা অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী রাখাটাই যৌক্তিক ও মানবিক।

নিকটাত্মীয় নারী ও তার সন্তানদের রক্ষার জন্য পুরুষের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ের অনুমোদন

অনেক সময় স্বামী জিহাদে শহীদ হয়ে যায় কিংবা অল্প বয়সে ইন্তেকাল করে, আর স্ত্রী ও তার সন্তানরা তখন নিরুপায় হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক নিকটাত্মীয়, যেমন ছোট ভাই বা বড় ভাই শহীদ বা মৃত ভাইয়ের পরিবারের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বিয়ে করে থাকেন। যদি একাধিক বিয়ের অনুমোদন না দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে এরূপ নিরীহ নারী ও তার সন্তানদের রক্ষা করার কী ব্যবস্থা হবে?

দেবর বা ভাসুর যদি তাকে বিয়ে না করে আর তারা এক ঘরে থাকে, তখন শয়তান তাদের মাঝে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে, এ অবস্থায় তাদের নৈতিক পদস্থলন অসম্ভব নয়। মানুষ তাদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করারও সুযোগ পাবে। সুতরাং তাকে বিয়ে করলে সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে, বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানরাও আশ্রয় পাবে।

নিকটাত্মীয়দের কল্যাণে একাধিক বিয়ে গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে ড. আবদুন নাসের বলেন, অনেক সময় নিকটাত্মীয়ের মাঝে কারো কারো বিবাহ হয় না কিংবা রোগাক্রান্ত থাকে, তখন তাদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে আনা হয়। এসব ক্ষেত্রে নারীদের উপকারই বেশি হয় বিধায় একাধিক বিবাহ বিরোধীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৯৪]

সমাজের কল্যাণে একাধিক বিয়ে

বহু বিবাহে সমাজ তিনভাবে উপকৃত হয়। যথা–

১. অনেক সময় ছেলেদের তুলনায় অধিক কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়া।

২. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ছেলে সন্তানের মৃত্যুহার অধিক হওয়া।

৩. বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়া।

---

১৯৩. ড. আবদুন নাসের তাওফীক আল আত্তার, আল উসরাতু ওয়াকানূনুল আহওয়ালিশ শাখছিয়্যাহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাতুল হাদীসাহ ১৯৮৫), পৃ. ১০০।

১৯৪. তায়াদ্দুদিয যাওজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

উল্লিখিত তিনটি অবস্থা বিবেচনা করলে বুঝা যাবে, নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। যদি একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া না হয় তাহলে অনেক নারী চিরকুমারী থেকে যাবে, যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়বে। সমাজে গোপন রোগ যেমন এইডস মহামারী আকার ধারণ করবে।

আল আহরাম পত্রিকায় মাআল মারআহ (নারীর সাথে) শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি এখনো ভোগ করছে। জাপানের সকল পুরুষ বিবাহ করলেও ১ মিলিয়ন ৪১ হাজার ৮৮৪ জন নারী কুমারী রয়ে যাবে।[১৯৫]

আল আহরাম পত্রিকার মাআল মারআহ (নারীর সাথে) অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ফ্রান্সে ৫/৩% নারী আর ৪.৭% পুরুষ। ১৯৭১ সালের মার্চের এক জরিপে দেখা যায়, ফ্রান্সে নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে ২.৬% বেশি ছিল।[১৯৬]

কাজেই যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয় তাহলে নারীর জীবনে বিকৃতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এক গবেষণায় পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন, একাধিক বিবাহের অনুমতি না থাকায় নারীরা দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে এবং অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে একাধিক বিবাহ শুধু অনুমোদিতই নয়; বরং নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিবও বটে।

শ্রমিকের প্রয়োজন একাধিক বিয়ে

শ্রমিকরাই জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একাধিক বিবাহের মাধ্যমে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে সে অভাব পূরণ করা যায়।

আফ্রিকানদের সম্পর্কে ওয়েস্টার মার্ক এক গবেষণায় মন্তব্য করেছেন, তাদের একজনের একাধিক স্ত্রী হলে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা কম তন্মধ্যে আফ্রিকা অন্যতম। আরব বিশ্বেও কর্মসংস্থানের তুলনায় জনবল অনেক কম। এ সকল অঞ্চলের উন্নতির জন্যে জনসংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক।[১৯৭]

সুতরাং আমরা বলতে পারি, একাধিক বিবাহ ব্যবস্থার মাঝে ব্যক্তি ও সমাজের বিশেষ কল্যাণ লুক্কায়িত রয়েছে। কাজেই এ পদ্ধতি চালু থাকা প্রয়োজন। যে সকল জাতি একাধিক বৈধ বিবাহের বিরোধিতা করে, তাদের সমাজে এক একজন পুরুষ বহুসংখ্যক নারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে। তাই বাস্তবতার বিরোধিতা না করে সত্য মেনে নেওয়াই ভালো।

আল্লাহর এ বিধান বিশ্বাস করে মেনে চলায় খাঁটি মুসলমানদের মাঝে আল্লাহর রহমত বিরাজ করছে। জগতে এ সকল মানুষরাই বেশি সুখী। কেননা আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। আর পশ্চিমা বন্ধুরা যারা এ নীতির বিরোধিতা করছেন তাদের মাঝে শান্তি নেই; বরং এ নীতির বিরুদ্ধাচরণের কারণে পশ্চিমা সমাজে নিম্নরূপ সমস্যাবলি সৃষ্টি হয়েছে−

১. পরকীয়ার ছড়াছড়ি।

২. অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৩. অনেক নারীর অশ্লীলতায় জড়ানো বৃদ্ধি পাওয়া।

---

১৯৫. মিশর : জারীদাতু আল আহরাম, তারিখ ৪/১০/১৯৭১ ইং।

১৯৬. মিশর : জারীদাতু আল আহরাম, তারিখ ২৭/১০/১৯৭১ ইং।

১৯৭. ওয়েস্টার মার্ক, কিসসাতুয যিওয়াজ, অনুবাদ : আবদুল মুনয়িম আয যিয়াদী, (মিশর : ১৯৭৯), পৃ. ২৬২।

৪. চিরকুমারী নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

৫. যেনার মাধ্যমে যৌন রোগের লাগামহীন বৃদ্ধি।[১৯৮]

ইসলাম মানবজাতিকে একাধিক বিবাহের অনুমোদন প্রদান করে এক উন্নত জীবনব্যবস্থা দান করেছে। এ নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে নারীরা। সকল অমুসলিম পশ্চিমাবিশ্ব এ নীতির বিরোধিতা করে বাস্তবতার নিরিখে তারাও এখন এ সুমহান ইসলামী নীতির প্রতি ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। ইতোমধ্যে তাদের অনেক বুদ্ধিজীবী একাধিক বিবাহ অনুমোদনের দাবি জানাতে আরম্ভ করেছেন।

পুরুষের হাতে তালাকের ক্ষমতা রাখার কারণ

ইসলাম পুরুষের ওপর স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। পুরুষের ধৈর্য ও শক্তি সাহস থাকায় তার পক্ষে আয় রোজগার করা সহজ। নারীর চেয়ে পুরুষের দূরদৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির গভীরতা অনেক বেশি। তাই ইসলাম তালাকের ক্ষমতা পুরুষের হাতে অর্পণ করেছে। যে কোনো কাজ পুরুষ খুব ভেবে চিন্তে করে। কিন্তু নারী তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুব সহজেই হিংস্র হয়ে ওঠে। তার হাতে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হলে সে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিচার বিবেচনায় না নিয়েই আবেগের বশীভূত হয়ে তুচ্ছ ঘটনার কারণে যখন তখন তালাক দিয়ে বসবে।

এ প্রসঙ্গে ড. আবদুন নাসের আত্তার বলেন, স্বামীর হস্তে তালাকের ক্ষমতা রাখা যৌক্তিক। এতে নারী, পুরুষ ও পরিবারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ পরিবারের মূল চাবিকাঠি হলো স্বামী। সে-ই পরিবারের পরিচালক, দায়িত্বশীল ও ব্যয়ভার বহনে বাধ্য ব্যক্তি। সে যদি স্ত্রীর সাথে সহযোগিতা করতে না চায়, জোর করে তার ওপর সে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। বিচারক মায়া মমতাহীন সংসার চাপিয়ে দিলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে না। ইসলাম মানুষকে যেনতেনভাবে তালাক প্রদানের অনুমতি দেয়নি; বরং পুরুষকে নানাভাবে সুখের নীড় গড়ার পরামর্শও দিয়েছে।[১৯৯] তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর ইসলাম তালাক দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেন–

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

"আর তোমরা তা কীভাবে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছো, আর তারা তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।"[২০০]

স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। তালাকের পর বকেয়া মোহর, তিন মাস দশ দিনের থাকা খাওয়া, পোশাক-আশাক প্রদান করা, স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ব্যয়ভার স্বামীর দায়িত্ব। তারপর শিশু সন্তানকে দুধপান করানোর বিনিময়েও স্ত্রীর খরচ বহন করতে স্বামী বাধ্য থাকবে।

পশ্চিমাদের এক শ্রেণি তালাক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আর অপর শ্রেণি তালাক প্রথা বাতিলের কথা বলে। এদিকে তাদের মধ্য থেকেই তালাকের বৈধতা প্রদানের আওয়াজ উঠেছে। ইতোমধ্যে উত্তর আমেরিকায় তালাকের অনুমোদন পাস হয়েছে। এতে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমারা ইসলামী নীতির কাছে ফিরে আসবে বলে মনে করা হয়।

---

১৯৮. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রেজা, হুকূকুন নিসা ফিল ইসলাম, (মিশর : মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী ১৯৭৮), পৃ. ৫৫।

১৯৯. আল উসরাতু ওয়া কানূনুল আহওয়ালিস সাখছিয়্যাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

২০০. সূরা আন নিসা : ২১।

মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলাম আইন করেছে, ফেরেশতাদের জন্যে নয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ, দ্বন্দ্ব যখন চরমে পৌঁছে যাবে, তখন তারা কী করবে? তাদের সমস্যা সমাধানের পথ কী হবে? ইসলাম সে পথ বর্ণনা করে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে। তালাকের পূর্বে জীবনের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্যেও ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছে। নারী পুরুষের আবেগ রয়েছে, আবেগ থেকেই তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এরপর স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে দ্বন্দ্ব বিরোধ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। দ্বন্দ্বের কারণ যদি স্বামীর দায়িত্বহীনতা হয়, যেমন পরিবারের খরচ না দেওয়া, পরিবার রক্ষায় অসমর্থ প্রকৃতি। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা পরিবারের কর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“আর তোমরা তাদের সাথে ভালোভাবে জীবনযাপন কর, যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর, তবে হয় তো তোমরা কোনো কাজ অপছন্দ কর, আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”[২০১]

অবাধ্য নারীর ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত

যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হয় তবে পরিবার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এরূপ অবস্থায় ইসলাম ফলদায়ক পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

“আর যাদের পক্ষ থেকে তোমরা বাড়াবাড়ির (অবাধ্যতার) আশঙ্কা করবে তাদের উপদেশ দেবে, তাদেরকে তাদের বিছানায় ত্যাগ করবে এবং মৃদু প্রহার করবে। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিপক্ষে কোনো পথ তালাশ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান ও বড়।”[২০২]

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত نشوز শব্দের অর্থ আনুগত্য না করা, অবাধ্য হওয়া। সমতল ভূমি থেকে উপরে উঠা।[২০৩]

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়াকে نشوز (অবাধ্যতা) বলা হয়।

তাফসীরে আল মানারে উল্লেখ রয়েছে, যে নারী স্বামীর অধিকার প্রদান করে না, সে স্বামীর ওপরে উঠে গেল। সে তার নেতার ওপর চড়ার চেষ্টা করলো। সে তার স্বভাব থেকে দূরে সরে গেল। যেন সে সমতল ভুমি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো বেরিয়ে গেল।[২০৪]

ইবনে কাসীর (র) বলেন, যে নারী স্বামীর কথার ওপর কথা বলে, স্বামীর নির্দেশ লঙ্ঘন করে, স্বামীকে ঘৃণা করে, তাকে অবাধ্য নারী বলা হয়।[২০৫]

---

২০১. সূরা আন নিসা : ১৯।

২০২. সূরা আন নিসা : ৩৪।

২০৩. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরাব নূন বর্ণ, মাদ্দাহ نشز (মিশর : দারুল হাদীস ২০০১) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪২৫।

২০৪. শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, তাফসীরুল মানার, (মিশর : আল হাইআতুল মিসরিয়্যাহ ১৯৭৩) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হতে পারে। যদি স্ত্রী অবাধ্য হয়, সেক্ষেত্রে তার প্রতিবিধানের জন্যে ইসলাম নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। যথা–

১. নরম/কোমলভাবে উপদেশ দেওয়া।

২. শয্যাত্যাগ করা।

৩. মৃদু প্রহার করা।

পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে এ তিনটি পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

১. নরম/কোমলভাবে উপদেশ দেওয়া

স্বামী তার স্ত্রীর স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত। স্বামী জানে তার স্ত্রী কোন কথায় নরম হয়। স্বামী-স্ত্রীর সাথে শুধু কোমল কথাই বলবে না; বরং ভালো পরিবারের উদাহরণও দেবে। স্ত্রীকে তার অবাধ্যতার ক্ষতি বোঝাবে। স্ত্রীর অবাধ্যতার ফলে পরিবার, সন্তান সন্ততির যে ক্ষতি হবে তা সুন্দরভাবে বোঝাতে চেষ্টা করবে।

নারী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে পড়ে, তখন স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার মতো ব্যবহার দেখাবে, তাকে উপদেশ প্রদান করবে। 'তাফসীরে আল মানার' প্রণেতা বলেন, অবস্থাভেদে উপদেশের ধরনও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন– কারো জন্য আল্লাহর ভয় দেখানো যথেষ্ট, আবার কাউকে পার্থিব অশুভ পরিণতির ভয়-ভীতি দেখানো যেতে পারে, যেমন শত্রুরা মন্দ বলবে। কখনো তার পছন্দের জিনিস সরবরাহ না করেও হুমকি দেওয়া যায়। কীভাবে স্ত্রীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা জানেন।[২০৬]

ইবনে কাসীর (র) বলেন, যখনই নারীর পক্ষ থেকে অবাধ্য আচরণ প্রকাশ পাবে, তাকে নসীহত করবে এবং আল্লাহর ভয় দেখাবে। বলবে, আল্লাহ তায়ালা স্বামীর হক ও আনুগত্য তার ওপর ওয়াজিব করেছেন। সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে গোনাহগার হবে।[২০৭] ইমাম আলুসী (র) বলেন, তোমরা তাদের উপদেশ দাও অর্থ, তাদের বল, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা থেকে ফিরে আস।[২০৮]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেন, কোনো কোনো সময় নারীর রূপ সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও পারিবারিক মান মর্যাদার কারণে আদেশ উপদেশ কাজে আসে না। সেক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দ্বিতীয় মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।[২০৯]

২. স্ত্রীর শয্যা ত্যাগ করা

অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী ভালোভাবে আদেশ উপদেশ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে। এতে যদি তার চরিত্রে পরিবর্তন না আসে তবে তাকে বিছানা ত্যাগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন– وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ "তোমরা তাদের থেকে বিছানা ত্যাগ কর।"[২১০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, الهجران ان لايجامعها ويضاجعها على فراشه ط ويوليها ظهره "তার সাথে সহবাস করবে না, একই বিছানায়

২০৫. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

২০৬. তাফসীরুল মানার, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।

২০৭. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

২০৮. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আল আলুসী, তাফসীরে রূহুল মায়ানী, (বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরামিল আরাবী, ১৯৮৯), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

২০৯. সাইয়্যেদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, (মিশর : দারুশ শারূক, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৮), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৪।

২১০. সূরা আন নিসা : ৩৪।

পিঠ প্রদর্শন করে শুবে।"[২১১] কখনো বিছানা ছাড়বে না। কেননা স্বামী এক বিছানায় না থাকলে স্ত্রী পরপুরুষকে শয্যাসঙ্গী করে অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে পারে।

নারীকে বিছানায় ত্যাগ করার মাধ্যমে তার অহংকারের অবমাননা এবং নারীত্বের অসম্মান হয়, এ অপমানবোধ থেকে নারী শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। স্বামীর উদ্দেশ্য যেহেতু স্ত্রীকে সংশোধন করে অনুগত বানানো, কাজেই কথায় কথায় এ অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। নতুবা এটি হালকা হয়ে যাবে। নারীকে শয্যাত্যাগ করার জন্যে কতকগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন–

১. স্ত্রী অবাধ্য না হলে তাকে শয্যাত্যাগ করা যাবে না।

২. উপদেশ না দিয়ে সরাসরি স্ত্রীকে শয্যাত্যাগ করা যাবে না।

৩. সংশোধন হয়ে গেলে তাকে শয্যাত্যাগ করা থেকে ফিরে আসতে হবে। নতুবা স্বামী গোনাহগার হবে।

৪. এ সব মাধ্যম প্রয়োগের জন্য এক মাস সময় নেবে।

যদি স্বামী মনে করে, স্ত্রীর সংশোধনের জন্যে এক মাসের বেশি সময় প্রয়োজন, তাহলে সে সর্বোচ্চ চার মাস স্ত্রীকে শয্যাত্যাগ করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. "যারা তাদের স্ত্রীদের সংস্রব থেকে বিরত থাকার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমাশীল করুণাময়।"[২১২] ফকীহরা ঈলা তথা শপথের ওপর কেয়াস করে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

শয্যাত্যাগ করা বাহ্যত নারীকে অপমানিত করা হচ্ছে মনে হলেও তাতে তার সুরক্ষা রয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে সে সংশোধিত হয়ে গেলে তার স্বার্থই রক্ষা পাবে।

হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রাসূল (স) একটি গোপন কথা বলেছেন, তিনি সে কথা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে ফাঁস করে দেন। রাসূল (স) হযরত হাফসার প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাঁকে সংশোধনের জন্যে এক মাস সময় দেন।

উল্লিখিত দু'পদ্ধতি ব্যবহারের পরও স্ত্রীর অবাধ্যতা দূর না হলে তৃতীয় অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আর তা হচ্ছে হালকা প্রহার।

৩. হালকা প্রহারকরণ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অবাধ্য স্ত্রী আদেশ উপদেশ ও শয্যা ত্যাগের পরেও সংশোধন হয় না, তখন শরীয়ত তাকে হালকা প্রহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

নিন্দুকেরা বলে, প্রহার নারীর সম্মান মর্যাদা বিরোধী। আমরা জবাবে বলবো, তোমরা নারীদের পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির যে সুযোগ করে দাও, তা কী নারীর সম্মান মর্যাদার হানি নয়? একেই কি তোমরা নারী স্বাধীনতা বলছ?

---

২১১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

২১২. সূরা আল বাকারা : ২২৬।

নারীকে প্রহার করার উদ্দেশ্য হবে তাকে সংশোধন অবগত করা। প্রহারের মাধ্যমে সংশোধন করে তার সম্মান রক্ষা করা উত্তম, নাকি অবাধ্য রেখে তার ও তার সন্তানদের জীবন ঝুঁকিতে ছেড়ে দেওয়া উত্তম? মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত। তিনি জানেন, কিভাবে নারী তার মর্যাদার পথে ফিরে আসবে। তাই নারীকে সামলানোর জন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রহার করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রহারের অর্থ এ নয়, যথেচ্ছ প্রহার করতে পারবে; বরং এ প্রহারের সীমা রয়েছে। যেমন লঘু প্রহার করবে। এজন্য মিসওয়াক ও মোটা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

এরূপ শাস্তি কেবল স্বামীরা নয়, পিতামাতাও তাদের সন্তানদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকেন।

যেসব পুরুষ স্ত্রীর অবাধ্য তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান

প্রতিটি সংসারের উন্নয়ন স্বামীর ওপর নির্ভর করে। আর স্বামী স্ত্রীর অবাধ্য হলে সেই পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য। তাই পরিবারের বন্ধন অটুট রাখার জন্য মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা ছিন্নকারী যে কোনো কারণ যে কোনো মূল্যে দূর করতে হবে। কখনো স্বামী অবাধ্য হয়ে পড়লে স্ত্রী তার অবাধ্যতার কারণ খুঁজে বের করে সংশোধনের চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"আর যদি কোনো নারী স্বামীর অবাধ্যতা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা মীমাংসা করে নিলে ক্ষতি নেই, আর মীমাংসাই উত্তম; মানুষকে কৃপণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমরা সৎ ব্যবহার করবে ও আল্লাহকে ভয় করবে; নিশ্চয় আল্লাহ তোমার কর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন।"[২১৩]

যেসকল কারণে পুরুষ/স্বামী তার স্ত্রীর অবাধ্য হয়

পুরুষ নারীর অবাধ্য হতে পারে। যেমন–

১. স্ত্রীর চরিত্র মন্দ হওয়া ও স্বভাব ধারালো হওয়ার কারণে।

২. স্ত্রী সুশ্রী না হওয়ার কারণে।

৩. স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও অহংকারী মনোভাবের কারণে।

৪. স্বামীর একাধিক স্ত্রীর মাঝে কারো মধ্যে ভালো গুণাবলি না থাকার কারণে।

পুরুষের অবাধ্যতার স্তরসমূহ

কোনো স্ত্রী যখন দেখবে যে তার স্বামী তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর মনোভাব লক্ষ্য করবে। তার মনোভাব তিন ধরনের হতে পারে। যথা–

১. অবাধ্যতার পাশাপাশি বিচ্ছেদ কামনা।

২. শুধু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবাধ্যতা।

৩. শুধু বিচ্ছেদ কামনা।

---

২১৩. সূরা আন নিসা : ১২৮।

১. অবাধ্যতার পাশাপাশি বিচ্ছেদ কামনা

عن ابن عباس قال حشيت سودة ان يطلقها النبى ﷺ فقالت لاتطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) মনোভাব আঁচ করেন, তিনি তাঁকে তালাক দিতে পারেন, তখন তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত রাতটি হযরত আয়েশা (রা)-কে ছেড়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তাঁকে তালাক না দেওয়ার আবেদন জানান। রাসূল (স) সাওদা (রা)-এর মনোভাব বুঝে তাঁকে তালাক না দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনে রেখে দেন।[২১৪]

তাই প্রথমটির ক্ষেত্রে স্ত্রী তার সাধ্যমতো স্বামীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। অধিকারে ছাড় দিয়ে হলেও স্বামীর মন জয় করার জন্যে সদা কাজ করে যাবে।

২. শুধু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবাধ্যতা

অবাধ্য স্বামীর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, সে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, স্ত্রীকে মারধর করে। এটি স্বামীর স্বভাব। তবে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ কামনা করে না। এ ক্ষেত্রে স্বামীর আচরণে স্ত্রীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, তার মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করতে হবে। এটি খুবই সহজ কাজ। কখনো কখনো স্ত্রীর আচরণে স্বামীর মনে এমন মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে যাদের একাধিক স্ত্রী রয়েছে, তারা এক স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রীর নিকট স্থায়ীভাবে রাত যাপন শুরু করে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্ত্রীদের এভাবে ঝুলিয়ে না রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"আর তোমরা স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না যদিও কামনা কর; সুতরাং পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ে তাকে ঝুলন্ত রেখে দিও না, মীমাংসা করে নাও, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[২১৫]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন।"[২১৬]

আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

عالم بذلك الذى تصبرون عليه وتشحملون بسببه المشاق، وسيجازيكم على ذلك اوفر الجزاء-

২১৪. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

২১৫. সূরা আন নিসা : ১২৯।

২১৬. সূরা আন নিসা : ১২৮।

"আল্লাহ তোমাদের ধৈর্য্যধারণ এবং একারণে তোমরা অনেক কষ্ট স্বীকার করছ তা অবহিত আছেন। তিনি অচিরেই তোমাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।"[২১৭]

৩. শুধু বিচ্ছেদ কামনা

পরিবারে শান্তি বিদূরিত হয়ে যদি অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়, তাহলে বিচ্ছেদই শেষ প্রতিকার। আল্লাহ তায়ালা এরূপ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ মেনে নিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন–

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ـ وكان الله واسعا حكيما ـ

"আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তাঁর সামর্থ্য থেকে প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করবেন, আর আল্লাহ সামর্থ্যবান ও জ্ঞানী।"[২১৮]

এরূপ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

"আর যদি তোমরা উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাবে। যদি তারা মীমাংসা চায়, আল্লাহ তাদের মাঝে সমঝোতা করে দেবেন; নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানী ও খবরদার।"[২১৯]

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সালিসদের গুণাবলি

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সালিসদের যেসব গুণাবলি থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে–

১. দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া।

২. আমানতদার ও মুত্তাকী হওয়া।

৩. ফিকহী জ্ঞান রাখা।

৪. কোনো পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা।

৫. গোপনীয়তা ফাঁস না করা।

৬. নির্ভয়ে সকল তথ্য অবগত হওয়া।

গুণাবলিসমৃদ্ধ সালিসগণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারবেন।

সালিসগণ নিযুক্ত হবেন স্বামী-স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে। কেননা নিকটাত্মীয়রাই স্ব স্ব পক্ষের স্বভাব ও সমস্যা সম্পর্কে বেশি অবগত। তাছাড়া তারা নিজস্ব লোকের নিকট নিজের গোপন কথা বলতে দ্বিধা করবে না, যা দূরের কাউকে বলতে চাইবে না। সালিসগণের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিরোধের কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা বিদূরিত করতে চিন্তাভাবনা করা।[২২০]

---

২১৭. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩।

২১৮. সূরা আন নিসা : ১৩০।

২১৯. সূরা আন নিসা : ৩৫।

২২০. আল উসরাতু ওয়া আহকামুহা ফিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৩৮।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, তারা এক তালাক, দুই তালাক বা তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন। ইবনে কাসীর (র) বলেন, সালিসগণ একত্রিত করতে পারেন, আবার বিচ্ছেদও করে দিতে পারেন। ইমাম মালেক (র) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে হাসান বসরী (র) বলেন, সালিসগণ মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না, বিচ্ছেদ করতে পারেন না। হযরত কাতাদা, যায়েদ বিন আসলাম, আহমদ, আবু সাওর ও দাউদ (র) প্রমুখ এ মত স্বীকার করেন।[২২১] তারা তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন মহান আল্লাহর বাণী– إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“তারা মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মাঝে সমঝোতা করে দেবেন”[২২২] এ আয়াতে সালিসদের বিচ্ছেদের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।[২২৩]

সালিসদের যেসব কাজ করা কর্তব্য

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সালিসগণ দৃষ্টি রাখবেন। যেমন–

১. বিচ্ছেদ করার অর্থ পরিবার ধ্বংস করা। আর সমঝোতা করলে পরিবার টিকে যায়। তাই মীমাংসার যত রাস্তা তাদের জানা আছে, সব কয়টি প্রয়োগ করবেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন– من افضل الشفاعة ان يشفع بين الاثنين فى النكاح “সবচেয়ে উত্তম মিলন হচ্ছে, বিবাহের মাঝে দু’জনের মিলন।”[২২৪]

২. সালিসগণ কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। তারা ন্যায়নীতির ওপর দণ্ডায়মান থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ.

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে ন্যায়নীতির ওপর দণ্ডায়মান থাক, যদিও তা তোমাদের বিপক্ষেই হোক না কেন।”[২২৫]

৩. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বক্তব্যের যে অংশ অপরপক্ষ অপছন্দ করত, তা গোপন রাখতে হবে। কারণ স্বামী-স্ত্রী মীমাংসা হওয়ার পর পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন আরম্ভ করবে। আর যে কথা তাদের কাছে শুনতে খারাপ লাগবে, তা অভিভাবক হিসেবে সালিসদের নিকট আরো বেশি খারাপ লাগার কথা। কাজেই গোপন কথা প্রকাশ না করাই উত্তম।

বিবাহ বিচ্ছেদকরণে সালিসদের ক্ষমতা আছে কিনা?

১. সালিসগণের বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা আছে কি-না? এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র) বলেন, স্বামী স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত সালিসগণ বিচ্ছেদ করতে পারবে না। তাদের দলিল, উকিল আর মোয়াক্কেলের অনুমতি ব্যতীত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

---

২২১. তাহরীরু হারাকাতিল মারআতি ফী মীযানিল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫।
২২২. সূরা আন নিসা : ৩৫।
২২৩. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪।
২২৪. সুনান ইবনে মাজাহ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
২২৫. সূরা আন নিসা : ৩৫।

ইমাম মালেক (র)-এর মতে সালিসগণ যা কল্যাণকর মনে করেন, চাই তা তালাক হোক বা সমঝোতা হোক- তাই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি বক্তব্য রয়েছে−

১. সালিসগণ শুধু মীমাংসাই করতে পারেন। এ বক্তব্যের দলিল আল্লাহর বাণী− إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا (তারা যদি মীমাংসা চায়)।

২. সালিসগণ দুই পক্ষের বিচারক। বিচারক তার বিবেচনা মোতাবেক যে কোনো রায় দিতে পারেন। দলিল হিসেবে তারা উপস্থাপন করেন আল্লাহ তায়ালার বাণী−

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا.

"তোমরা তার পরিবার থেকে একজন সালিস এবং তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও।"[২২৬]

সালিসগণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হলে শেষ ব্যবস্থা হলো তালাক। তালাকের মাধ্যমে দু'জনের বিষাক্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।[২২৭]

তালাক প্রদানে যিনি ক্ষমতাবান

তালাকদানের ক্ষমতাবান কে? তালাক কী স্বামী দেবেন, নাকি স্ত্রী, নাকি বিচারক? এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন− لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ.

"তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।"[২২৮]

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী− وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ.

"আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দেবে অতঃপর তারা ইদ্দতে পৌঁছবে।"[২২৯]

এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় খাযেন (র) বলেন, প্রথম আয়াত জনৈক আনসারীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি বনু হানাফিয়ার এক নারীকে বিবাহ করেন, কিন্তু মোহর নির্ধারণ করেননি। তারপর সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেন। তারপর দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স) বললেন, তোমার টুপি দ্বারা হলেও তাকে ভরণপোষণ দাও।[২৩০]

এ ছাড়া আরো অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তালাকের অধিকার স্বামীর, স্ত্রীর নয়। হ্যাঁ, স্বামী যদি স্ত্রীকে ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে স্ত্রী তালাক দিতে পারেন।

---

২২৬. সূরা আন নিসা : ১৩০।

২২৭. শাইখ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, রাওয়ায়েউল বায়ন তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, (মিশর : আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

২২৮. সূরা আল বাকারা : ২৩৬।

২২৯. সূরা আল বাকারা : ২৩১।

২৩০. তাফসীরুল খাযেন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনিব আমাকে তার দাসী বিবাহ করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি আমাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। রাসূল (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানুষেরা! তোমাদের কারো এমন অবস্থা, সে তার দাসকে বিবাহ প্রদানের পর বিচ্ছিন্ন করতে চায়? তালাক দেয়ার মালিক সে, যে মোহর প্রদান করে।[২৩১]

যেখানে রাসূল (স) মনিবকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেননি, সেখানে বিচারককে এ ক্ষমতা কি করে দেওয়া যেতে পারে? তা ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কাযী বা বিচারকের কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদে তার কোনো দায়দায়িত্ব না থাকাই যৌক্তিক।

যেহেতু কাযীর দরবারে তালাক প্রদানের রীতি চালু হলে, কেন তালাক দেয়া হচ্ছে তার কারণসমূহ প্রকাশ করা জরুরি হয়ে পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ এ সকল কারণ প্রকাশ করতে চায় না; বরং কিছু কিছু কারণ গোপন রাখাই ওয়াজিব। সেক্ষেত্রে কাযীর সামনে তালাকের মামলা উত্থাপিত হলে নারী পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয়াদি জানাজানি হয়ে যাবে, তাতে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তালাক শর্তযুক্ত বিষয়ও নয়। এর সাথে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কিত। যেমন–

অর্থনৈতিক বিষয়

স্ত্রীকে তালাকের পর তার ভরণপোষণ, সন্তান লালন পালনের খরচ ও বকেয়া মোহর স্বামীর দায়িত্বে রয়ে যায়।

মনস্তাত্ত্বিক তালাকের মাসনুন পদ্ধতি হলো, এক তালাকে রাজয়ী প্রদান করা, তা আবার এমন তুহরে দিতে হয়, যখন সহবাস না হয়ে থাকে। এরূপ তালাক হওয়ার পর স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ইদ্দতের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারে।

আলেমদের কারো কারো মতে, এ পদ্ধতিতে তালাক না দিলে তালাক হবে না। এমনকি এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক দিলেও এক তালাকই কার্যকর হবে। তাঁরা হযরত দুকানা (রা)-এর ঘটনাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত দুকানা তাঁর স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেন। তারপর মারাত্মক দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তাকে কীভাবে তালাক দিয়েছ? সে বলল, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, একই মজলিসে? দুকানা বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তা এক তালাক। কাজেই তুমি চাইলে তাকে ফিরিয়ে আনতে পার। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সে তাকে ফিরিয়ে আনল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে প্রত্যেক তুহরে তালাক দিতে হবে।[২৩২]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রোধের সময় তালাক দিলে সে তালাক পতিত হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক ও জোরপূর্বক তালাক আদায় করলে সে তালাক কার্যকর হয় না।

হযরত আলী (রা) বলেন, পাগলের তালাক ব্যতীত সকল তালাক কার্যকর।[২৩৩]

---

২৩১. নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

২৩২. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৩।

২৩৩. নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

ইবনে কাইয়েম বলেন, বাঁধা ব্যক্তি, পাগল, নেশা কিংবা ক্রোধের কারণে বিবেকশূন্য ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে না। ক্রোধ দু'প্রকার। যথা–

১. যাতে জ্ঞান থাকে না, কি বলেছে তা বলতে পারে না। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ ক্রোধান্বিত ব্যক্তির তালাক পড়বে না।
২. তালাক প্রদানের সময় তালাকদাতার বিবেক দূরীভূত হয়নি, কিন্তু তার নিয়তে তালাক ছিল না। ক্রোধ কমে যাওয়ার পর সে স্বীয় কর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ে। এরূপ ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে কিনা, এ বিষয়ে ফীকহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। তবে তালাক না পড়ার পক্ষ জোরদার বা শক্তিশালী।[২৩৪]

বিচারকের সামনে তালাক প্রদানের রীতি চাল হলে তুচ্ছ কারণে পরিবার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ছোটখাটো বিষয় পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আলোচনায় আসলে অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার পথ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আদালতে সে সুযোগ না থাকায় দ্রুত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

আদালতে তালাকের ফয়সালা হতে ছয় মাস সময়ের দরকার হবে। এ দীর্ঘ সময়ে সন্তানদের তত্ত্বাবধানে দারুণ বিঘ্ন ঘটবে। তাছাড়া পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের ঘৃণা জন্মানোর সম্ভাবনা তো রয়েই গেছে।

আদালতে নারীর তালাক

আদালতে তালাক দেওয়ার কোনো আদেশ শরিয়তে নেই; বরং শরিয়তে স্বামীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এখন এ নীতির বিরোধিতা করার অর্থ ইসলামী শরিয়ার বিরোধিতা করা।

আদালতের সামনে তালাক দেওয়ার শর্ত করা হলে বিবাহের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ বিবাহে প্রবেশে কোনো বাধা নেই, কিন্তু প্রয়োজনে তা থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা খোলা না থাকলে তরুণরা নিজেদের বিবাহ থেকে বিরত রাখবে। তখন সমাজে অশ্লীলতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়বে।

খ্রিস্টান সমাজে তালাক নিয়ন্ত্রণ

ইহুদিরা যেমন একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি তুলেছে, তেমনি তালাক নিয়ন্ত্রণ, তা বিচারকের সামনে প্রদানসহ নানারকম দাবি তুলেছে। খ্রিস্টানরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের ধর্মে একাধিক বিবাহ যেমন অবৈধ করেছে, তেমনি তালাককেও শর্তযুক্ত করেছে। খ্রিস্টধর্মে একমাত্র ব্যভিচারের কারণে তালাক দেওয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে তালাকের আইন শিথিল করে আরো কতকগুলো কারণে তালাক প্রদানের রীতি চালু করেছে।

প্রথম দিকে খ্রিস্টানরা তালাকের বিষয়ে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা–

১. আর সুজ্যাকসীদের মতে, দাম্পত্য জীবনে নৈতিক চারিত্রিক অসাধুতা পাওয়া গেলে স্বামী-স্ত্রী যে কেউ তালাক দিতে পারে।
২. ক্যাথলিকদের মতে, তালাক সম্পূর্ণ হারাম। কোনো অবস্থাতেই তালাক প্রদান করা যাবে না। এমনকি স্ত্রীর চারিত্রিক অসাধুতা পাওয়া গেলেও নয়।
৩. প্রোটেস্টান্টদের মতে, নির্দিষ্ট কতিপয় কারণে তালাক দেওয়া যাবে। যেমন দাম্পত্য বিষয়ে নৈতিক চারিত্রিক অসাধুতা। তবে তাদের মতে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই দ্বিতীয় বিবাহ হারাম। যেমন মাত্তীর ইঞ্জিলে এসেছে– যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ করলো সে তার সাথে যেনা করলো।[২৩৫]

---

২৩৪. যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯।

২৩৫. ইঞ্জীল মাত্তী, অধ্যায় পঞ্চম, পরিচ্ছেদ ৩২।

পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট সমাজে তালাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষতিকর দিকসমূহ

প্রাচীন খ্রিস্ট সমাজে তালাক সহজ ছিল না, কিন্তু আধুনিক আইনে তালাকের বিষয় সহজ করা হয়েছে। যেমন ফ্রান্সের পুরাতন আইনে তিনটি কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়–

১. স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন অপরজনের ওপর বাড়াবাড়ি করলে,

২. স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যেনা করলে,

৩. স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন আদালত কর্তৃক মানহানিকর শাস্তি ভোগ করে থাকলে।[২৩৬]

উল্লিখিত আইনগুলো খ্রিস্টসমাজের জন্য কোনোরূপ কল্যাণ বয়ে আনেনি; বরং সমাজে লাম্পট্য বেলেল্লাপনা বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশেষে ক্যাথলিকরা সামাজিক সমস্যার সামনে মাথা নত করে তালাক নীতি শিথিল করতে বাধ্য হয়। এ নীতি শিথিল করার পর এক মাসে তালাকের মামলা মিলিয়ন সংখ্যায় দাঁড়ায়। অবশেষে ফ্রান্স থেকে এ আইনের শিথিলতা ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল ইউরোপীয় দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এখন তালাকের কারণ এক দুটিতে সীমিত নয়; বরং অসংখ্য কারণে তালাক প্রদান করা যায়।

পশ্চিমা জগৎ ভ্রান্ত আদর্শ ও নীতির ওপর চলতে গিয়ে ঘাটে ঘাটে হোঁচট খেয়ে স্বভাব-প্রকৃতির দিকে ফিরে আসা শুরু করেছে। ১৯৭৮ সালের ১৯ মে ইকোনোমিস্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, ইংরেজ নারী পুরুষ সকলে তালাকের সহজ পদ্ধতি চালুর দাবি জানিয়েছে। তারা যেনা ব্যতীত অন্যান্য কারণে তালাকের বৈধতা, নিঃশর্ত তালাক নীতি এবং একাধিক বিবাহের অনুমতিদানের আহ্বান জানায়।[২৩৭]

ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই স্বভাবের অনুকূল আইন প্রণয়ন করে রেখেছে, যা সর্বকালে মানবকল্যাণে সমান ভূমিকা রাখছে। তারপরও কি মুসলিম সমাজে ঘাপটি মেরে থাকা দালালরা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের প্রেসক্রিপশন মেনে আমাদের একাধিক বিবাহ না করা, তালাক শর্তযুক্ত করাসহ নানা স্বভাববিরুদ্ধ আইন রচনার কথা বলবেন? নাকি তওবা করে সত্য দ্বীনের পথে ফিরে আসবেন? ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের তাদের দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে এ সকল পচাগন্ধ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

আবাসিরী বলেন, পাশ্চাত্য আইনে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পরিবারকে বিচারকের সামনে অপমানিত করার মাধ্যমে তালাক প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া তালাকের কারণে ব্যয়ভারের বিষয়টি এসে পড়াই স্বাভাবিক। যার কারণে তালাকের জটিলতার দরুন স্বামী-স্ত্রী যার যার খুশিমতো প্রেমিক প্রেমিকা নিয়ে রাত যাপন করে। এখন আর সঠিক বংশ পরিচয়ের বালাই নেই। দাম্পত্য সম্পর্ক সন্দেহ সংশয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছে। তারপরও মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা পশ্চাত্যদের পচনশীল সমাজরীতি মুসলমানদের মাঝে আমদানি করার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছে।

২৩৬. ড. আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফী, আল উসরাতু ওয়াল মুজতামাউ। (মিশর : দারু নাহদা অষ্টম প্রকাশ ১৯৮৩), পৃ. ১৪৭।

২৩৭. মাহমুদ মুহাম্মদ আল জাওহারী ও মুহাম্মদ আবদুল হাকীম, আল আখাওয়াতুল মুসলিমাতু ওয়াবিনাউল উসরাতিল কানূনিয্যাহ। (মিশর : দারুদ দাওয়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০), পৃ. ২১৯।

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর পর্দা, পোশাক, সাজগোজ ও বিনোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : পর্দার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

পর্দার পরিচয়

পর্দা ফার্সি শব্দ। পর্দাকে আরবি ভাষায় হিজাব বলা হয়। হিজাবের আভিধানিক অর্থ আড়াল, অন্তরাল, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি। হিজাব বলতে বুঝায় যা দিয়ে কিছু ঢেকে রাখা হয় কিংবা যার সাহায্যে কোনো কিছুকে দৃষ্টির আড়াল করা হয়।

মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে– وعورة المرأة التى يجب عليها حجبها عن الاجنبى هى فى الجملة جميع جسدها عدا الوجه والكفنين.

"মহিলাদের হিজাব হলো পরপুরুষ থেকে নিজের সারা অঙ্গ মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের তালু ব্যতীত ঢেকে রাখা।"[১]

ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের হিজাব হিসেবে অনেক কিছুই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঘরের দেয়াল, কাপড়ের পর্দা, আলমারি ইত্যাদি। অর্থাৎ মহিলাগণ যদি ঘরোয়া পরিবেশে কোনো ভিন পুরুষের সাথে কথা বলতে চায়, তবে সে ঘরের বা বাড়ির ভেতরে এমন বস্তুকে আড়াল গ্রহণ করতে পারে, যার দরুন তাদের সাক্ষাৎ না ঘটে। আর একান্ত প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যেতে হলে তাদের স্বাভাবিক পোশাকের ওপরে বড় লম্বা চাদর বা বোরকা পরে নেবে, যাতে পুরো শরীর ঢেকে যায়।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঘরের দেয়াল বা পর্দা অথবা বোরকাই কেবল হিজাব নয়, মূলত হিজাব হলো একটা শালীনতা, নর ও নারীর এতটুকু শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব বজায় রাখা, যে দূরত্ব বজায় রাখার কারণে একজনের প্রতি অন্যজনের আকর্ষণ সৃষ্টি না হতে পারে। একজন মেয়ে কলেজে যাওয়ার সময় ঠিকই বোরকা-নিকাব ইত্যাদি পরিধান করেছে; কিন্তু তাকে দেখা যায় এক সহপাঠী ছেলের হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা আড্ডা দিচ্ছে। ইসলাম একে হিজাব বলে না, এ বোরকা হিজাব হয়নি। একজন ছেলে একজন নারীর সাথে মোবাইলে কিংবা ইন্টারনেটে অথবা ঘরের প্রাচীরের ওপাশ থেকে রসালো আলাপ করছে। একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না, মাঝে দূরত্ব আছে, প্রাচীর আছে। তারা মনেও করছে, হিজাবের তো কোনো ব্যাঘাত হয়নি। কিন্তু ইসলামের বিধানমতে, দুজনই হিজাবের বিধান লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং, হিজাব হলো একটি মূল্যবোধের নাম; শুধু কোনো কাপড় বা দেয়ালের নাম নয়।

নারীর সতর ও বিভিন্ন পর্যায়

সতর বলতে শরীরের ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝানো হয়, যা (ক্ষেত্র বিশেষ) কারো সামনে প্রকাশ করা কিংবা অন্য কারো জন্য তা দেখা হারাম।[২]

---

১. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।
২. আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২৪ খণ্ড, পৃ. ১৭৪ ও ৩১ খণ্ড, পৃ. ৪৪।

মহান আল্লাহ বলেন–

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন (স্বভাবতই) যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন অলঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৩]

উপরের আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে নারীদের পোশাক ও পর্দার বিধান ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা প্রথমে স্বভাবতই যা প্রকাশিত বা সাধারণভাবে যা বেরিয়ে থাকে এমন সৌন্দর্য-অলঙ্কার ছাড়া সকল সৌন্দর্যকে আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর স্বামী, কয়েক প্রকারের আত্মীয়, নারী ও শিশুদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। এ নির্দেশনা এবং এ ছাড়াও কুরআন-হাদীসের অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে মুসলিম ইমাম ও ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, মহিলাদের 'আউরাত' বা 'সতর' চার পর্যায়ের।[৪]

প্রথম পর্যায় : স্বামীর সামনে স্ত্রীর সতর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ সতর নেই, পর্দা নেই, নেই কোনো পোশাকের বিধান। স্বামী স্ত্রীর পোশাক আর স্ত্রী স্বামীর পোশাক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[৫]

---

৩. সূরা আন-নূর : ৩০-৩১।

৪. আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৩০।

৫. সূরা আল বাকারা : ১৮৭।

দ্বিতীয় পর্যায় : অন্যান্য মহিলার সামনে সতর

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারীদেরকে আপন নারীগণের সামনে সৌন্দর্য বা অলঙ্কার প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। এ আয়াতের আলোকে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, নারীর সামনে নারীর সতর, পুরুষের সামনে পুরুষের সতরের মতোই। অন্য নারীদের দৃষ্টি থেকে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা মুসলিম নারীর জন্য ফরয। দেহের অবশিষ্ট অংশও আবৃত করা উচিত। তবে প্রয়োজনে একজন মহিলা অন্য মহিলার সামনে তা অনাবৃত করতে পারেন।

অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীগণ পুরুষের মতোই পর্দা করবেন। তাঁরা অমুসলিম নারীদের সামনে মাথার কাপড় সরাবেন না। এমনকি ফকীহগণ অমুসলিম নারীদেরকে মুসলিম মহিলাদের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করার ব্যাপারেও আপত্তি করেছেন।[৬]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন–

... فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.

"আল্লাহর উপরে এবং আখিরাতের উপরে ঈমান স্থাপন করেছে এমন কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার নিজের ধর্মের মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা তার আবৃতব্য অঙ্গ দর্শন করবে।"[৭]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন–

هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم

"মুসলিম নারীগণ গ্রীবা, বক্ষদেশ, কর্ণ বা কর্ণের অলঙ্কার, গলার হার ও দেহের যে সকল অঙ্গ নিকটাত্মীয় ছাড়া কারো সামনে অনাবৃত করা বৈধ নয় মুসলিম রমণী তাদের দেহের ঐ স্থানগুলো কোনো ইয়াহুদী-খ্রিস্টান নারীর সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।"[৮]

তৃতীয় পর্যায় : রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের সামনে সতর

নিকটতম আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ তাদের সামনে মুসলিম রমণী নিজের শরীর আবৃত করে থাকবেন। তবে মুখ, মাথা, গলা, ঘাড়, বুক, বাজু, পা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারেন। অবশ্য এদের সামনেও প্রয়োজন ছাড়া যতটুকু সম্ভব আবৃত থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সূরা নূরের ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها (তারা যেন যা প্রকাশিত, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা) বলেন–

.... الزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل عليها .... والزينة التى تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.

---

৬. আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, পৃ. ২৩৩; তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৭. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৮. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

"প্রকাশ্য সৌন্দর্য-অলঙ্কার মুখমণ্ডল, চোখের সুরমা, করতলের মেহেদি ও আংটি। মহিলারা এগুলো তাদের বাড়িতে আগমনকারী সকলের সামনে প্রকাশ করবে।' অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, (তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, ... বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে।) 'এ সকল মানুষের জন্য তারা যে অলঙ্কার বা অলঙ্কারের স্থান প্রকাশ করবে তা হলো, কানের দুলদ্বয়, গলার হার ও হাতের বালা। বাজুতে পরিহিতি অলঙ্কার, পায়ের মল, বক্ষ, চুল ইত্যাদি স্বামী ছাড়া কারো সামনে প্রকাশ করবে না।[৯]

চতুর্থ পর্যায় : অন্যান্য পুরুষের সামনে সতর

উল্লিখিত নিকটতম আত্মীয় ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুসলিম মহিলার পুরো দেহই 'আউরাত' বা আবৃতব্য অঙ্গ। কেবলমাত্র মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। বিবাহ বৈধ এরূপ সকল আত্মীয় ও সকল অনাত্মীয়ের সামনে মুসলিম নারীর উপর ফরয দায়িত্ব যে, তিনি নিজের পুরো দেহ আবৃত করে রাখবেন।

মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"[১০]

এ আয়াতও নির্দেশ করে যে, মুমিন রমণীর জন্য পুরো দেহ আবৃত করা ফরয। শুধু তাই নয়, দূরাত্মীয় বা অনাত্মীয় পুরুষের পুরুষের সামনে দেহের সাধারণ পোশাকের অতিরিক্ত চাদর বা বোরকাজাতীয় কোনো পোশাক পরিধান করে নিজেকে আবৃত করা মুমিন নারীর জন্য ফরয।

আর হিজাব বলতে নারীর পুরো শরীর আবৃতকারী লম্বা কাপড়কে বুঝানো হয়, যা সাধারণত বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় কিংবা ঘরের মধ্যে পরপুরুষের সাথে প্রয়োজনে আলাপ করাকালে পরিধান করা হয়।

হিজাবের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা মেয়েদের গোটা দেহকেই পরপুরুষদের আড়াল করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সমাজে যাতে কোনো ধরনের অশ্লীলতা ও অবৈধ কোনো কিছুর ছড়াছড়ি না হয়, তাই ইসলাম নারী জাতিকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় নিজেদের রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য আবৃত করে বের হবার নির্দেশ দিয়েছে। বাইরে যেতে হলে তারা স্বাভাবিক পোশাকের ওপরে বড় লম্বা চাদর ঝুলিয়ে দেবে অথবা এ ধরনের বোরকা পরবে, যাতে তাদের দৈহিক অবয়ব ও সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ না হয়। এতে আপত্তির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। নারীদেহের সৌন্দর্য সবাইকে প্রদর্শনের বস্তু নয়।

যারা হিজাব মানে মহিলাদের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখা বলে থাকেন। তাদের মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাইরে যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, যদি মেয়েরা বাইরে যায়, তবে তারা যেন অন্ধকার যুগের মেয়েদের মতো বের না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

৯. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।
১০. সূরা আল আহযাব : ৫৯।

"তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরেই ভালভাবে অবস্থান গ্রহণ কর এবং পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[১১] পর্দা নারীদেরকে ছোট করার জন্য নয়; বরং তাদের মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি এবং তাদেরকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রবর্তিত হয়েছে। আবরণ বা ঢাকনার সাহায্যে যেমন খাদ্যদ্রব্য ময়লা, মাছি ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকে, তেমনি হিজাবের সাহায্যে মহিলাদের মান-সম্ভ্রম অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি, কুৎসিত কামনা এবং অশ্লীলতার হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

যেমন ধরুন পাকা কলা একটি ফল, তা কিন্তু ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয় না। কারণ কলার উপরের আবরণটাই এমন যে, মশা-মাছি তাতে বসে না, বসেও কোনো লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাকা খেজুর ঢেকে রাখতে হয়। তা না হলে পিঁপড়া থেকে শুরু করে মশা-মাছি ইত্যাদি কীট-পতঙ্গ তাতে বসে। তদ্রূপ মহিলা যখন ঘরের বাইরে বের হয়, তখন যাতে গায়ে ময়লা না লাগে কিংবা মাছি না বসে, কিংবা কীট-পতঙ্গ যাতে তাকে উপদ্রব করতে না পারে অর্থাৎ, রিপুতাড়িত লোকজনের কুদৃষ্টি তাদের প্রতি না পড়ে সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ধরনের বাড়তি পোশাক পরে সাজগোছ না করে, অলঙ্কারের রিন ঝিন শব্দে পায়ে চলার পথ মুখরিত না করে, সুগন্ধি না লাগিয়ে বাইরে বের হতে বলেছেন। মহিলাদেরকে পূতঃপবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখাই হিজাবের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "মেয়েরা লুকানো বস্তু (অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পর্দা জরুরি) কেননা যখন তারা বাইরে যায়, তখন শয়তান তাদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।"[১২]

যেসব মহিলা বোরকা পরে মুখ, মাথা ও সমস্ত শরীর আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, দুষ্ট চরিত্রের বখাটে লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে, এরা পর্দানশীন ও চরিত্রবতী মহিলা এবং এদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না। ফলে তারা তাদের পিছু নেয় না এবং তাদের আকৃষ্ট করার জন্যে কিংবা নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে না। অপরদিকে যারা বোরকা ছাড়া বোধ হয় নিজেদের মাথা, গলা ও বাহুযুগল উন্মুক্ত রেখেই রাস্তা-ঘাটে, দোকানে-পার্কে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে এর বিপরীত ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নিজেদেরকেও তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চা করতে চেষ্টা করে তাদেরকে উত্যক্ত করে।

পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ভোগবাদী সমাজে মেয়েরা বেশি সম্মান বা মর্যাদা পায়নি। মেয়েদেরকে নারী স্বাধীনতার নামে অশালীন পোশাক পরিয়ে পুরুষরা তাদের হীন লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ নিচ্ছে।

মখমণ্ডল ঢেকে রাখার শরয়ী বিধান

মহিলাদের চেহারা কি সতরের অংশ এবং তাদের চেহারা ঢেকে রাখা কি জরুরি? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী আইনবিদগণের বিভিন্ন মত আছে।

---

১১. সূরা আহযাব : ৩৩। আয়াতে নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি। নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে।

১২. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

মালিকী ও হানাফী ইমামগণের অভিমত : তাঁদের মতে মহিলাদের চেহারা সতরের অংশ নয়। তাই পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা প্রকাশ করতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি কোনো ধরনের ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে এবং তাতে কোনো রূপ অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা না হয়। তাঁদের দলীল হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণী−

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"যা এমনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এমন সৌন্দর্য ব্যতীত তারা যেন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"[১৩]-এর মধ্যে إلا ما ظهر منها দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শরীরের যে অঙ্গগুলো প্রকাশ করার দরকার পড়ে সেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর তা দ্বারা চেহারা ও হাতের তালুদুটিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবন যুবায়ের, আতা ও দাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন, তা দ্বারা চেহারা ও হাতের তালু উদ্দেশ্য।[১৪] বিভিন্ন হাদীসেও কুরআনের এ আয়াতের অধীনে উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন− হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত আসমা বিনতে আবী বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে পাতলা কাপড় পরে প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন−

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.

"আসমা, নারী যখন বালেগা হয় তখন তার এই এই অঙ্গ ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়।"[১৫]
এই এই অঙ্গ বলে নবী (স) তাঁর চেহারা ও হাতের দু তালুর দিকে ইঙ্গিত করেন। এভাবে মেয়েরা নামায পড়ার সময় এবং ইহরাম অবস্থায়ও তাদের চেহারা খোলা রাখে। এভাবে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদানকারীর জন্যও ঐ চেহারা দেখার অনুমতি রয়েছে। পরোক্ষভাবে বেশ কয়েকটি হাদীসেও এ কথা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কিছুসংখ্যক মহিলা চেহারা খোলা রেখে মসজিদে যেতেন, প্রয়োজনে বাইরে চলাফেরা করতেন।[১৬] সুতরাং এ সব দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। নতুবা কোনো অবস্থায় তা খোলা জায়েয হতো না।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম আবু বাকর জাসসাস আহমদ ইবনু আলী (৩৭০হি) সূরা নূরের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "(তারা যেন সাধারণত বা স্বভাবতই যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে), স্বামী ও মাহরাম আত্মীয় বাদে অন্য পুরুষদের বিষয়ে একথা বলা হয়েছে। কারণ তাদের কথা পরে বলা হয়েছে। আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলিমগণ বলেছেন, এখানে মুখ ও হস্তদ্বয়কে বুঝানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় আউরাত বা আবৃতব্য অঙ্গ নয়।"[১৭]

---

১৩. সূরা আন-নূর : ৩১।
১৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।
১৫. সুনান আবু দাউদ, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং : ৩৫৮০
হযরত আসমা (রা) প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ নয়। এটি হাদীসে মুনকাতি। অথবা হাদীসের বক্তব্য বিমেষ কোনো ওযরের জন্যে যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানকারী, সাক্ষী কিংবা বিচারকের প্রয়োজনে চেহারা দেখার জন্যে প্রযোজ্য হবে।
১৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫; সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭।
১৭. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

চতুর্থ হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৪২৮হি) বলেন, "বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেখা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। যদি অবৈধ কামনা থেকে নিরাপত্তা না পায় তবে প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করবে না। একজন পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদে বাকি দেহের সকল স্থান দেখতে পারবে। একজন পুরুষ অন্য পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, নারীও পুরুষের দেহের সে অংশ দেখতে পারবে এবং পুরুষের দেহের যে অংশ দেখতে পারে, মহিলাও অন্য মহিলার দেহের সে অংশ দেখতে পারে। ... পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয়দের মুখ, মাথা, বুক, পদদ্বয়ের নলা ও বাজুদ্বয় দেখতে পারে ...।"[১৮]

শাফেয়ী ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত : তাঁদের মতে মহিলাদের চেহারাও সতরের অন্তর্ভুক্ত, সর্বাবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে।

তাঁদের দলীল : তাঁরা উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো অঙ্গ বা সাজ-সজ্জা প্রকাশ পেয়ে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই। হযরত ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, এর দ্বারা মূল বস্ত্রের উপরে পরিধেয় বস্ত্র যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনু সিরীন, শাবী ও হাসান বাসারী (র) থেকেও এ ধরনের মত পাওয়া যায়।[১৯] তাঁদের মতে ততটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে, যতটুকু গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন বোরকা পরে বের হলেও মহিলার শারীরিক কাঠামো তো লুকানো সম্ভব নয়। মহিলার বাইরে থেকে মোটামুটি তার শারীরিক কাঠামোগত সৌন্দর্য অনুভব করা যায়, এটা তার পক্ষে গোপন করা সম্ভব নয়। এটা যদি প্রকাশ হয়ে যায় তবে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যে তাকে শাস্তি দেবেন না। বর্ণিত রয়েছে, পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর এক বার উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা) বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হয়েছিলেন। উমর (রা) বলেন, হে সাওদা, আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। সাওদা (রা) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, "উমর (রা) এই কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা গোপন করা সম্ভব নয়।"[২০] আলোচ্য হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, إلا ما ظهر منها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মহিলাদের ঐ সব বাহ্যিক সৌন্দর্য, যেগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায় এবং যা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, এগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই।

তা ছাড়া বিভিন্ন আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পর-নারীদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেয়া জায়েয নেই। কাজেই যা দেখা বৈধ নয়, তা-ই সতর। যেমন– রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

يا على لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.

"হে আলী, প্রথম বার দৃষ্টি দেয়ার পর দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কারণ, প্রথম বার দৃষ্টিদান তোমার জন্য বিধেয় হলেও দ্বিতীয় বার দৃষ্টিদান বিধেয় নয়।"[২১]

---

১৮. জাফর ইবনে হামদান আবুল হোসাইন আল কুদূরী, মুখতাসারুল কুদূরী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭), পৃ. ২৪১।
১৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।
২০. মুসনাদ, হাদীস নং ২৫৭৯৯।
২১. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬; সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة فامرني ان اصرف بصري.

"হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকস্মিকভাবে কোনো মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।"[২২]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل رديف رسول الله ﷺ فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبى ﷺ يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে হযরত ফাদাল ইবনু আব্বাস (রা) সাওয়ারীতে আরোহন করেছিলেন। তিনি সুন্দর কেশবিশিষ্ট উজ্জ্বল গৌর বর্ণের লোক ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য) এলে ফাদাল ঐ মহিলার দিকে তাকিয়ে ছিল এবং মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ফাদালের চেহারাটি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।"[২৩]

সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, চেহারা প্রকাশ করার কারণে যদি কোনো ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তাতে কোনো রূপ সাজ-সজ্জা করা হয়ে থাকে, তবে নারীর জন্যে তা প্রকাশ করা জায়েয নেই। ড. যায়দান বলেন, "প্রয়োজনে মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার যে মতকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি, তা দুটি শর্তে শর্তযুক্ত। তা হলো– ১. চেহারায় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো ধরনের সাজগোছ থাকতে পারবে না। ২. চেহারা খোলা রেখে বাইরে বের হলে কোনো ধরনের ফিতনা কিংবা পুরুষদের কুদৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।"[২৪] এ কারণে হযরত ইবনু আব্বাস (রা) যখন দেখতে পান যে, চেহারা খোলা রাখায় সমাজে বিপদ বেড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি মুসলিম নারীদেরকে বাইরে যাওয়ার সময় শুধু একটি কিংবা দুটি চক্ষু ব্যতীত জিলবাব দ্বারা পুরো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ফিতনা ও বিপদের আশঙ্কাই হলো নারীদের প্রতি দৃষ্টিদান জায়েয না হবার মূল কারণ। আর আলেমদের সর্বসম্মত মতানুসারে মহিলাদের পা, পায়ের নলা ও চুল প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদান করা হারাম। তাই চেহারার প্রতি দৃষ্টিদান করা অতীব কঠোরভাবে না জায়েয হবার কথা। যেহেতু চেহারাই হলো সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র, ফিতনার উৎস ও বিপদের মূল। যদি কোনো বিয়ের প্রস্তাবকারীকে বলা হয় যে, তোমার প্রস্তাবিতা মেয়েটির চেহারা বিশ্রী; কিন্তু পাগুলো অত্যন্ত সুন্দর, তা হলে সে প্রস্তাব দিতে অগ্রসর হতে চাইবে না। অপর দিকে যদি বলা হয় যে, তোমার প্রস্তাবিতা মেয়েটির চেহারা সুন্দর। কিন্তু তার হস্তযুগলে কিংবা পদদ্বয়ে কিছুটা সৌন্দর্যহানি ঘটেছে; তথাপি সে প্রস্তাব দিতে অগ্রসর হবে।

---

২২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২; সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

২৩. সহীহ আল বুখারী : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১।

২৪. যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

সুতরাং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে চেহারার পর্দা করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। তদুপরি বর্তমান সময়টি অনর্থ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। অপরদিকে মেয়েরাও বর্তমানে বাইরে বের হবার সময় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে চেহারায় বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যের উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। তাই বিশেষ প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা ইত্যাদি ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ খোলা রাখা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না। সৌদি আরবের বিশিষ্ট মুফতী মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ উছায়মীন (র) বলেন–

إن تغطيه وجه المرأة فرض لا بد منه، وإنه يحرم عليها كشفه لغير المحارم.

"চেহারা ঢেকে রাখা অতি প্রয়োজনীয় ফরয। গায়রে মাহরামদের কাছে প্রকাশ করা হারাম।"[২৫]

তিনি আরো বলেন–

وأما من زعم أن الحجاب الشرعى هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها و كفيها فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال لأنه من المعلوم أن الرغبة و محل الفتنة هو الوجه، هذا لا يمكن أن يقال أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه.

"যারা মনে করেন, পর্দা হলো কেবল মাথা, ঘাড়, বুক, পা ও হাত ঢেকে রাখা। চেহারা ও দু হাত খোলা রাখা বৈধ। তাদের এ ধারণাটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কারণ এটা পরিষ্কার যে, চেহারাই হলো আকর্ষণ ও ফিতনার উৎস। কীভাবে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, শরীয়ত মেয়েদের পা খোলা রাখতে নিষেধ করবে আর চেহারা খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারে?"[২৬]

সৌদি আরবের অন্য একজন বিশিষ্ট মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান জিরীন (রা) বলেন–

لا تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب بل هو حرام ولا يتم التحجب إلا بستر الوجه.

"বেগানা পুরুষদের সামনে মহিলা চেহারা খুলবে না। এটা হারাম। চেহারা ঢেকে রাখা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ পর্দা রক্ষা হবে না।"[২৭]

যাদের মতে চেহারা খোলা রাখা জায়েয তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে এটা নয় যে, এটা খোলা রাখা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব। আর ঢেকে রাখা বিদয়াত। বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনের সময় এবং কোনো ধরনের বিপদের আশঙ্কা না থাকলে তা খোলা রাখার মধ্যে কোনো দোষ নেই। ইবনু আবিদীন (রা) বলেন, যুবতী মহিলাদেরকে পুরুষদের মাঝে চেহারা খোলা রাখতে নিষেধ করা হবে। এ বিধান চেহারা সতর হওয়ার কারণে নয়; বরং পুরুষরা তাদের চেহারা দেখে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কার কারণে। কেননা তাদের চেহারা খোলা রাখা হলে তাতে প্রায়শ পুরুষের কুদৃষ্টি পতিত হয়।[২৮] তবে বর্তমানে কামাধিক্য ও ফিতনার যুগে কোনো বিজ্ঞ আলেম তা জায়েয বলেননি।

২৫. মুহাম্মদ ইবনু রিয়াদ, আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, (বৈরূত : আলামুল কুতুব, ২০০৩), পৃ. ১৪।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
২৮. মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর আদ দিমাশ্কী, রাদ্দুল মুহতার, (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬।

কাযী বায়যাভী ও খাযিন (র) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনো কিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তা-ই বলে মনে হয়। অবশ্য চলাফেরা ও কাজকর্মের সময় স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত থেকে কোনোভাবে প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয। বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লেখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে।

কিছু কিছু লোক إلا ما ظهر منها (যে সৌন্দর্য বা বেশভূষা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাতে কোনো দোষ নেই) দ্বারা অজ্ঞতার দরুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আসলে এ শব্দগুলো থেকে বেশি সুবিধা লাভের কোনো অবকাশ নেই। আয়াতের সঠিক মর্ম হলো এই যে, স্বেচ্ছায় অপরের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করো না। কিন্তু যে বেশভূষা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা প্রকাশ হতে বাধ্য তার জন্যে কেউ দায়ী হবে না। এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। তোমার নিয়ত যেন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশের না হয়। তোমাকে তো আপন সৌন্দর্য গোপন করে রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এরপর যদি কোনো কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে, এর জন্যে আল্লাহ তোমাকে দায়ী করবেন না।[২৯] তুমি যে বস্ত্র দ্বারা তোমার সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে তা তো প্রকাশ পাবেই। তোমার দেহের গঠন ও উচ্চতা, শারীরিক আকার-আকৃতি ইত্যাদি অনুমান করা যাবে। কাজ-কর্মের সময় তোমার হাত ও মুখমণ্ডলের কিয়দংশ তো উন্মুক্ত করতেই হবে। এরূপ হলে কোনো দোষ নেই। তোমার ইচ্ছা তো প্রকাশ করা নয়, বাধ্য হয়ে তুমি তা করছ। এতে যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি আনন্দ-স্বাদ উপভোগ করে তা করুক। সে তার অসৎ অভিলাষের শাস্তি ভোগ করবে।

তা ছাড়া বিশেষভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.

“হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।”[৩০] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জিলবাব হলো ওড়নার চেয়ে প্রশস্ত একপ্রকার লম্বা চাদর, যা দিয়ে মহিলারা নিজেদের মাথা ও বক্ষ আবৃত করে রাখে। আর إدناء শব্দের অর্থ ঝুলিয়ে দেয়া। يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ -এর অর্থ নিজেদের উপরে চাদরের খানিক অংশ যেন ঝুলিয়ে দেয়। এর উদ্দেশ্য হলো মুখমণ্ডল আবৃতকরণ। তা ঘোমটা দ্বারা হোক, চাদর অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে হোক। আল-কুরআনের সকল মুফাসসির এ আয়াতের এমন অর্থই করেছেন।

---

২৯. সাইয়িদ আবুল আলা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৩০. সূরা আল-আহযাব : ৫৯।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সিরীন (রা) হযরত উবায়দাহ সালমানী (রা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, এ আয়াতের ওপর কীভাবে আমল করতে হবে? এর উত্তরে তিনি নিজেই ওপর দিক থেকে মুখমণ্ডলের ওপর একটি লম্বা চাদর ঝুলিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তিনি চাদর দিয়ে প্রথমে ভ্রু পর্যন্ত ঢাকলেন। অতঃপর চেহারা আবৃত করে ফেললেন এবং শুধু বাম চোখ খোলা রাখলেন।[৩১]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, মহিলারা জিলবাবকে প্রথমে কপালের ওপরে পেঁচিয়ে বাঁধবে, যাতে তা মাথা থেকে পড়ে না যায়। অতঃপর নাকের ওপর ঘুরিয়ে নেবে। যদিও এতে চোখদুটি দেখা যায়; কিন্তু বক্ষদেশ ও চেহারার অধিকাংশই ঢেকে থাকবে।[৩২]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনু জারীর তাবারী (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "হে নবী, আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুসলিম মহিলাগণকে বলে দিন, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে আপন ঘর থেকে বাইরে যায় তখন যেন ক্রীতদাসীদের পোশাক না পরে, যে পোশাকে মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে। বরং তারা যেন নিজেদের ওপরে চাদরের ঘোমটা টানিয়ে দেয়, যাতে ফাসেক লোকেরা তাদের শ্লীলতার অন্তরায় না হয় এবং জানতে পারে, এরা সম্ভ্রান্ত মহিলা।"[৩৩]

আবু বকর জাসসাস (রা) বলেন, "আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি জানা যায় যে, যুবতী নারীকে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন পরপুরুষের সামনে তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখে। ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় পর্দা পালন ও সম্ভ্রমশীলতা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে অসৎ অভিপ্রায় পোষণকারী কোনো লোক তার প্রতি প্রলুব্ধ না হয়।"[৩৪]

বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা কাযী বায়যাভী (রা) বলেন, "আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো এই যে, যখন তারা আপন প্রয়োজনে বাইরে যাবে, তখন চাদর দ্বারা শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে।"[৩৫]

তা ছাড়া হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে সাধারণভাবে মুসলিম নারীগণ মুখমণ্ডলের ওপর নিকাব বা ঘোমটা পরতেন এবং অনাবৃত মুখমণ্ডলে চলাফেরা করা বন্ধ হয়ে যায়।

ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে রাখা

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য মুখে নিকাব ও হাতে মোজা পরা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

"ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে মোজা পরিধান না করে।"[৩৬] এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হজ্জের সময় নারীর মুখমণ্ডল জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরীভূত করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, ইহরামের অবস্থায়

---

৩১. রাওয়াইয়ুল বয়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩।
৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১।
৩৩. জামিউল বায়ান, প্রাগুক্ত, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
৩৪. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।
৩৫. আনওয়ারুত তানযীল, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০।
৩৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

মুখের নিকাব যেন নারীদের পোশাকের কোনো অংশবিশেষ না হয়, যা অন্য সময়ে সাধারণভাবে হয়ে থাকে। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে চেহারাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জায়েয আছে; বরং কোনো ধরনের ফিতনার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকলে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হবে।[৩৭]

বিভিন্ন হাদীস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ ও অন্য মুসলিম মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় নিকাববিহীন আবস্থাতেও মুখমণ্ডল পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতেন।

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فاذا حاذوا بنا سدلت احدنا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا لكشفناه.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যানবাহন আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন লোকজন আমাদের সামনাসামনি আসত, তখন আমরা আমাদের চাদর মাথার ওপর থেকে মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে রাখতাম।"[৩৮]

عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابى بكر الصديق.

"ফাতেমা বিনত মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখতাম। এ সময় আমাদের সঙ্গে আসমা বিনত আবী বকর (রা)-ও ছিলেন।"[৩৯]

হযরত জাফর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) মহিলাদেরকে ইহরাম অবস্থায় নিকাব পরতে নিষেধ করতেন। অবশ্য এসময় মহিলারা মুখমণ্ডলের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে রাখতেন।[৪০]

নিকাব পরার বিধান

মেয়েরা চেহারা ঢেকে রাখার জন্যে নিকাব[৪১]ও পরতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ করে, সমাজে যখন মহিলাদের মাঝে নিকাব পরার রীতি প্রচলিত থাকে। নিকাবের সাহায্যে চেহারা এমনভাবে ঢেকে রাখবে, যাতে একটি কিংবা দুটি চোখ ব্যতীত চেহারার অন্য কিছু প্রকাশ না পায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুসলিম নারীদের মাঝে চেহারা ঢাকার জন্যে নিকাবের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفارين.

"ইহরামের অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা বা মোজা পরিধান না করে।"[৪২] এ হাদীস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলাদের মাঝে নিকাব পরার প্রচলন ছিল।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র যুগেও মুখমণ্ডল আবৃত করার জন্যে নিকাব এবং হাতদুটো ঢাকার জন্যে দস্তানা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। শুধু ইহরাম অবস্থায় তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

৩৭. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৭।

৩৮. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

৩৯. আল-মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৪০. মুহাম্মদ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, (রিয়াদ : মাকতাবাতু আর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), (বাব : আন-নিকাব লিল মাহরামাহ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

৪১. নিকাব হল, পুরো চেহারা ঢেকে রাখার কাপড় বিশেষ, যাতে দেখার জন্যে চোখ বরাবর সামনে খোলা থাকে।

৪২. সুনান আবু দাউদ, (কিতাবুল মানাসিক), হাদীস নং : ১৮২৬।

বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে চেহারা খোলা রাখার বিধান

বয়োবৃদ্ধা মহিলা যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, শারীরিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এজাতীয় মহিলাদের জন্যে পর্দার বিধানে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে চেহারা খোলা রেখে পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে চেহারা ঢেকে রেখে যাওয়াটা অধিকতর শ্রেয়। মহান আল্লাহ এব্যাপারে বলেন–

والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

“বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে নিজেদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”[৪৩] অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক কাঠামো ভেঙে যায় এজাতীয় মহিলাদের জন্যে পর্দার বিধান শিথিল হয়ে যায়।

চিকিৎসার উদ্দেশ্য মহিলাকে দেখা কিংবা স্পর্শ করা

মহিলাদের উচিত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে না গিয়ে মহিলা ডাক্তারের কাছেই যাওয়া। যদি মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যাওয়া সাপেক্ষে পুরুষ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তার সামনে চিকিৎসার প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের চেহারা এবং অন্যান্য দেহাঙ্গ, প্রকাশ করতে কোনো দোষ নেই। তদুপরি চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী মহিলাদের শরীরের যে কোনো অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয। তবে তিনি সাধ্যমতো নিজের দৃষ্টি ও আচরণকে সংযত রাখবেন।[৪৪] মহিলারা পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় স্বামী কিংবা কোনো মাহরাম পুরুষকেও সাথে নিয়ে যাবে[৪৫], যাতে ডাক্তারের সাথে তাদের একান্তে সাক্ষাৎ করতে না হয়। রাসূলূল্লাহ (স) বলেন, لا يخلون رجل بامرأة... - “কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান না করে।”[৪৬] ডাক্তারের সাথে একাকী অবস্থায় মহিলার সাক্ষাৎ করা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে পুরুষদের উচিত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তার পাওয়া গেলে মহিলা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পুরুষ ডাক্তারের নিকট যাওয়া। অন্যথায় মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই। আর মহিলা ডাক্তারদের জন্যও যদি পুরুষ ডাক্তার না থাকে বা পাওয়া না যায়, তা হলে পুরুষদের চিকিৎসা করাতে কোনো দোষ সমস্যা।[৪৭] তবে শর্ত হচ্ছে, পুরুষদের চিকিৎসা করার সময় মহিলা ডাক্তারের সাথে তার স্বামী কিংবা কোনো মাহরাম পুরুষ অথবা অন্তত পক্ষে কোনো বিশ্বস্ত মহিলা থাকতে হবে, যাতে কোনো অবস্থায় রোগীর সাথে তার একান্তে অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। এ ধরনের অবস্থায় চিকিৎসার প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তারের জন্য পুরুষের শরীরের যে কোনো অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয আছে।

---

৪৩. সূরা আন-নূর : ৬০।
৪৪. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সারাখসী, আল মাবসূত, (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৯৯৩), ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।
৪৫. কোনো কারণে তাদের পাওয়া না গেলে বা তাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে, একজন বিশ্বস্ত মহিলাকে সাথে নিয়ে যাবে।
৪৬. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল জিহাদ), হাদীস নং : ২৮৪৪; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হজ্জ), হাদীস নং: ৩২৫৯।
৪৭. আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

এভাবে হাসপাতালে পুরুষ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যদি পুরুষ সেবক পাওয়া না যায়, তা হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে মহিলা সেবিকার জন্যে পুরুষদের প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করতে দোষ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার সময় তার সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা কিংবা বিশ্বস্ত সেবিকা থাকতে হবে, যাতে কোনো অবস্থায় রোগীর সাথে তার একান্তে অবস্থানের মতো পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। এ ধরনের অবস্থায় চিকিৎসা ও সেবার প্রয়োজনে মহিলা সেবিকার জন্য পুরুষের শরীরের যে কোনো অঙ্গ দেখা জায়েয আছে।

عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنسقى القوم ونخدمهم ونرد الجرحى

"হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওবিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিভিন্ন অভিযানে গমন করতাম। সেখানে আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং শহীদদেরকে মদিনায় নিয়ে আসতাম।"[৪৮] ইবনু হাজার আল আসকালানী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনের সময় মহিলার জন্য বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করা জায়েয আছে।[৪৯]

عن انس قال ...... ولقد رايت عائشة بنت ابى بكر وام سليم وانهما المشمرتان ارى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه فى افواهم.

"হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন অভিযানে বের হতেন তখন তিনি হযরত উম্মু সুলাইম (রা) ও কিছু আনসারী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁরা পানি পরিবেশন করতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।"[৫০] ইমাম নববী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, মেয়েদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্যার্থে যাওয়া এবং পানি পরিবেশন ও চিকিৎসা প্রভৃতি কাজে তাদেরকে খাটানো জায়েয। তারা মাহরাম ও স্বামীদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করবে। অন্যদেরও সাধারণভাবে স্পর্শ করা ব্যতীত চিকিৎসা করতে পারবে; এ ছাড়া এখানে প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় স্থান স্পর্শ করতেও কোনো অসুবিধা নেই।[৫১]

হাতের তালু ঢেকে রাখা প্রসঙ্গ

পরপুরুষের সামনে চেহারার মতো মহিলাদের হাতের তালুদুটিকেও ঢেকে রাখতে হবে। এগুলো সাধারণত প্রকাশ করা জায়েয নয়।[৫২] তবে লেনদেন ও কাজকারবারের জন্য প্রয়োজনে এগুলো প্রকাশ করতে কোনো দোষ নেই, যদি এতে কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা না থাকে এবং তাতে কোনো ধরনের সাজসজ্জা না থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে নারীরা সাধারণত হাতের তালুদুটিকেও পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

---

৪৮. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল জিহাদ), ২৭৩৬, ২৭২৭, (কিতাবুত তিব), হাদীস নং : ৫৩৫৫।
৪৯. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮০।
৫০. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল জিহাদ), হাদীস নং : ৪৬৫৯।
৫১. নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, পৃ. ১৮৮।
৫২. হাম্বলীগণের মতে- হাত দুটিও মহিলাদের সাতরের অন্তর্ভুক্ত।

“ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে মোজা পরিধান না করে।”[৫৩] এ হাদীস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুসলিম রমণীগণের মাঝে মোজা দ্বারা হাতদুটি ঢেকে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কাজেই হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় তিনি তাদেরকে মোজা পরতে নিষেধ করেছিলেন। তদুপরি যেখানে পায়ে কাপড়ের ঝুল লম্বা করে দিয়ে গোড়ালিদ্বয়কে ঢেকে রাখার বিধান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাত-দুটিকে ঢেকে রাখার আবশ্যিকতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পায়ের গোড়ালির চেয়ে হাত-দুটি অধিকতরভাবে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে থাকে। অবশ্য হাতের তালু-দুটি যে কোনোভাবে ঢাকলেই চলবে। যে কোনো কাপড় বা কামীসের হাতা কিংবা বোরকার সাহায্যেও ঢেকে রাখা যেতে পারে অথবা হাতে দস্তানা, মোজা ইত্যাদি পরা যেতে পারে।

তবে অনেক ইসলামী আইনবিদ মনে করেন, হাতের তালু-দুটি খোলা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। কিন্তু প্রথম মতটি অধিকতর শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, হাতের তালুদুটি সতর নয় যে, যা সর্ব অবস্থাতেই ঢেকে রাখা প্রয়োজন। ইহরামের অবস্থায় তা খোলা রাখতে হবে। মাহরাম পুরুষদের সামনে, নামাযের সময় এবং যে কোনো প্রয়োজনে তা খোলা রাখা যাবে। তবে পর-পুরুষের সামনে যেতে হলে তা আবৃত করে নিতে হবে। এটা পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

যে সব মাহরামের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে”[৫৪]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সব পুরুষের কাছে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব তাদের থেকে স্বামী ছাড়া আরো কিছু লোককে (যারা সকলেই মাহরাম) বাদ দিয়েছেন, যাদের কাছে নারীদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ.

---

৫৩. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৪।
৫৪. প্রাগুক্ত।

"পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, বোনপো, মুসলিম মহিলা ও দাসদাসীদের দেখা দেয়ায় মাঝে কোনো দোষ নেই।"[৫৫] অর্থাৎ তাদের সামনে মুখাবরণ উন্মুক্ত করলে এবং সৌন্দর্যের অলঙ্কারাদি প্রকাশ করলে কোনো দোষ হবে না। উল্লেখ্য যে, স্বামী ছাড়া অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে এটা নিরেট পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম, গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যে জায়েয নয়। অর্থাৎ এসব পুরুষদের সাথে মেয়েরা অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে, এদের সামনে তারা সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করেও আসতে পারবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তদুপরি মেয়েদের যে সব দেহাঙ্গ খোলা থাকে যেমন– মুখমণ্ডল, পা ও হাত প্রভৃতি দেখায়ও তাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু এদের জন্যে বুক, পিঠ ও পেট এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গের কিছু অংশই দেখা আদৌ জায়েয নয়। কেননা এসব অঙ্গ সাধারণত অনাবৃত থাকে না, বস্ত্রাবৃত থাকাই স্বাভাবিক এবং এসব অঙ্গই প্রধানত যৌন আবেদনকারী। নিম্নে যে সব ব্যক্তির কাছে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব নয় তাদের বিবরণ পেশ করা হলো–

১. স্বামী

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। স্বামীর জন্য স্ত্রীর সারা শরীর দেখা এবং বিধিবদ্ধ সকল উপায়ে তাকে ভোগ করা বিধেয়। নারীর রূপ-সৌন্দর্যের একমাত্র উদ্দেশ্যও তা-ই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

ما رأى منى ولا رأيت منه.

"রাসূলুল্লাহ (স) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি।"[৫৬]

২. বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা ইত্যাদি

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে চাচা, ফুফা ও মামাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেমন দুগ্ধজাত মাহরামদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এদের বিধানও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত মাহরামদের মতোই।

৩. স্বামীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুর।

৪. পুত্র (নিজের গর্ভজাত কিংবা স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত), পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র প্রমুখ।

৫. ভাই, চাই তারা সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় কিংবা বৈপিত্রেয়। দুধভাইও এর মধ্যে শামিল।

তবে মামা, খালা ও ফুফার পুত্র যাদেরকে সাধারণত ভাই বলা হয়, তারা গায়রে মাহরাম। তাদের নিকট পর্দা করতে হবে।

---

৫৫. সূরা আল-আহযাব : ৫৫।

৫৬. হাক্কী, তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৯।

উল্লেখ যে, দুধ ভাই যদিও মাহরাম এবং স্বাভাবিকভাবে তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয়; তথাপি তার সাথে নিভৃতে অবস্থান করা ও একত্র হওয়া জায়েয নয়।[৫৭]

৬. ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনা প্রমুখ।

৭. মুসলিম স্ত্রী লোক।

আয়াতের মধ্যে نسائهن দ্বারা মুসলিম স্ত্রীলোককে বুঝানো হয়েছে। তাদের সামনে শরীরের এমন সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা রাখা যায়। আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাদের সামনে কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা কোনো মুসলিম নারীর জন্যে জায়েয নয়। তারা পরপুরুষের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[৫৮] অনেকের মতে, আয়াতে 'সাধারণ নারীগণ' শব্দের পরিবর্তে 'আপন নারীগণ' ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ অথবা আপন মহিলা আত্মীয়স্বজন অথবা আপন শ্রেণির মহিলাগণকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অসৎ, মূর্খ ও এমন নারী, যাদের চালচলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাদের চরিত্রে কলঙ্ক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে এ ধরনের নারীর কাছেও মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। কেননা এরাও অনাচার-অমঙ্গলের কারণ হতে পারে।[৫৯]

৮. নারীদের মালিকানাধীন দাস-দাসী

অনেক আলেমের মতে, ما ملكت أيمانهن-এর মধ্যে মালিকানাধীন দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা শাফেয়ীদের অভিমত।[৬০] ইবন হাজার (র) বলেন, মহিলা মালিকের প্রতি সৎ ও চরিত্রবান দাসের দৃষ্টি মাহরামের প্রতি দৃষ্টিদানের মতোই। কারণ তার জন্য মহিলা মালিকের নাভি ও হাঁটুর মধ্যকার গোপন অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দান করা জায়েয আছে। অধিকাংশ ফকীহের দৃষ্টিতে ما ملكت أيمانهن দ্বারা শুধু দাসীদের বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাসরা এ হুকুমের আওতায় পড়ে না। তাদের কাছেও সাধারণ মাহরামদের মতো নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব।[৬১] এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ীও এ ধরনের একটি মত পোষণ করেন। হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

لا يغرنكم أية النور، فإنها فى الإناث دون الذكور.

---

৫৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম, (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৯০।

৫৮. তবে বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের নিকট অনেক কাফের মহিলার যাতায়াতের কথা বর্ণিত রয়েছে। তাই এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে, কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। আবার কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। আবার অনেকের মতে, আয়াতের নির্দেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের।

৫৯. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত ৯ম খণ্ড, পৃ, ১৫০; ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩-৪৪।

৬০. শামসুদ্দীন আর রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৪), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আশ শারবীনী, মুগনিউল মুহতাজ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৬১. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

"তোমরা সূরা আন-নূরের আয়াত দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। এ আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাসরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৬২] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা), হাসান বসরী (র) ও ইবন সিরীন (র) প্রমুখ বলেন, "পুরুষ দাসের জন্য তার নারী প্রভুর কেশ দেখাও জায়েয নেই।"[৬৩]

৯. নারীর প্রয়োজনমুক্ত লোক

নারীর প্রয়োজনমুক্ত লোক বলতে সে সব নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল পুরুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মহিলাদের গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন নয়। তদুপরি মহিলাদের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য বা আগ্রহও নেই। দৈহিক অক্ষমতা, কিংবা জ্ঞানের দুর্বলতার দরুন তারা মেয়েদের দিকে অসৎ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় না অথবা তাদের অন্তরে নারীদের প্রতি কোনো অসৎ চিন্তা জাগ্রত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন– التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ "যৌন কামনামুক্ত পুরুষ।"[৬৪]

তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর খবর রাখে, তাদের নিকটও পর্দা করা ওয়াজিব।

عن عائشة قالت كان يدخل على ازواج النبى ﷺ مخنث فكانوا يعدونه من غير اولى الاربة قال فدخل النبى ﷺ يوما وهو عند بعض نسائه وهو نيعت امرأة ...... فقال النبى ﷺ الا ارى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكن قالت فهجبوه.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। তাঁরা তাকে আয়াতে বর্ণিত, غير أولى الإربة من الرجال-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আসতেন। একদিন সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক বিবির কাছে এসে জনৈকা মহিলার গুণের বর্ণনা করছিল, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এ অবস্থা দেখে বললেন, "এ যেন তোমাদের কাছে আর কখনো প্রবেশ না করে। এরপর থেকে তাঁরা তার কাছে পর্দা করতেন।"[৬৫]

১০. শিশু

আল্লাহ তায়ালা বলেন– أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"শিশু, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ...।[৬৬]"

এই আয়াতে এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে বুঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।[৬৭]

যে সব শিশু এ সব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, যে সাবালকত্বের নিকটবর্তী তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। পূর্ববর্তী অনেক বিজ্ঞ আলেম সুন্দর বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছেন

---

৬২. আল-কাশশাফ, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩২।
৬৩. রুহুল মায়ানী, প্রাগুক্ত ১৬ খণ্ড পৃ. ১৪৪।
৬৪. সূরা আন-নূর : ৩১।
৬৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ২১৮; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭।
৬৬. সূরা আন নূর : ৩১।
৬৭. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯; রহুল মায়ানী, প্রাগুক্ত, ১৮ খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

এবং অনেকের মতে এটা হারাম।[৬৮] ইমাম জাসসাস (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে طفل দ্বারা এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না।[৬৯]

মাহরাম মহিলাদের চুমো দেয়া

নিজের কন্যা ও মাকে স্নেহ ও আদর করে চেহারা, কপাল ও হাতে চুমো দেয়ার কোনো সমস্যা নেই। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "কথাবার্তায় হযরত ফাতেমা (রা)-এর চেয়ে অন্য কাউকে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। ফাতেমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাকে অভিনন্দন জানাতেন, দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে কাছে নিয়ে এসে চুমো খেতেন এবং তাঁর জায়গায় বসাতেন। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (স) যখন তার তার কাছে যেতেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা)-ও তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন, দাঁড়িয়ে হাত ধরে চুমো দিতেন।"[৭০] এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রা)-কে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় চুমো দিতেন। সাহাবা কেরামের মাঝেও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।[৭১] বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা)-কে দেখার জন্যে গিয়েছিলেন, তখন তিনি জরাক্রান্তা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আদুরী কন্যা, কেমন আছো? এ বলে তিনি তাঁর কপালে চুমো খেলেন।"[৭২] এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মাহরাম মহিলাদেরকে, বিশেষ করে মা, কন্যা ও বোনদেরকে চুমো খাওয়া জায়েয আছে, যদি এতে নিজের মধ্যে কিংবা তাঁর মধ্যে কোনো রূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কাম-লালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে।

যে সব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করা আবশ্যক

গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। গায়রে মাহরাম অর্থ যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম নয়। এদের সামনে কিছুতেই নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। পুরুষরাও গায়রে মাহরাম নারীদের নিকট প্রবেশ করবে না, তারা যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুগতিক পর্দা করে, তারাও অনেকেই নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। আর এ পুরুষদেরকে তাদের ভ্রাতৃবধু এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পরিপূর্ণভাবে পর্দা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, إياكم والدخول على النساء. "তোমরা অবশ্যই (মাহরাম নয় এমন) নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে।" এ কথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে

---

৬৮. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
৬৯. মায়ারিফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪১।
৭০. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০১।
৭১. আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
৭২. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

আল্লাহর রাসূল স্বামীর নিকটাত্মীয়দের (দেবর) সম্পর্কে আপনি কী বলেন, তিনি বললেন, الحمو الموت - "স্বামীর নিকটাত্মীয়রা তো মৃত্যু সমতুল্য।"[৭৩] এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচাতো মামাতো ও খালাতো ভাই ও ভগ্নিপতিদের বুঝানো হয়েছে। আর এরা স্ত্রীর দেবর বা ভাসুর হয়ে থাকে। হাদীসে এদেরকে মৃত্যুতুল্য বলা হয়েছে। এর কারণ হলো অন্য যে কারো চেয়ে তাদের দিক থেকে ফেতনা সৃষ্টির ও বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে বেশি। ঘরে যদি কড়াকড়িভাবে পর্দার ব্যবস্থা না থাকে, তবে ঘরের উন্মুক্ত পরেবেশে ভাবীদের কাছে পৌছতে তাদের কোনো বেগ পেতে হয় না। তারা সহজে একসাথে বসে নিভৃতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ ও গল্পগুজব করে থাকে। এতে অনেক সময় তারা একে অপরের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরিবারের দুর্ভোগ টেনে এনে থাকে।

উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু এমন মাহরামও রয়েছে, যাদের কাছে যদিও পর্দা করা ওয়াজিব নয়; তথাপি তাদের সাথে নিভৃতে খালি ঘরে অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়েয নয়। যেমন যুবক শ্বশুর, যুবতী শাশুড়ির জামাতা, স্বামীর অপর স্ত্রীর ছেলে এবং দুধ ভাই প্রভৃতি এ পর্যায়ের মাহরাম। এদেরকে অনেক ফকীহ্ গায়রে মাহরামের ন্যায় আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই এদের সাথে সফর করা বা নিভৃতে কোনো জায়গায় অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়েয নয়।[৭৪]

পালক ছেলে, ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-ভাইদের সাথে পর্দা

শরীয়তে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো কুটুম্বিতার গুরুত্ব নেই। কাজেই স্ত্রীলোকের জন্য নিজের পালক ছেলে বয়স্ক হলে তাকেও দেখা জায়েয নেই। ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-ভাইকেও দেখা দেয়া জায়েয নেই।

স্বামীর ভাগ্নের সাথে মামীর পর্দা

স্বামীর ভাগ্নে মামীর মাহরাম নয়। তাই মামীকে তার কাছ থেকে পর্দা করতে হবে। অনেকেই মনে করেন, যেহেতু কুরআনে মাহরামাদের মধ্যে মামীর আলোচনা করা হয়নি,[৭৫] তাই স্বামীর ভাগ্নে মামীর মাহরাম। এ কারণে তার সাথে মামীর পর্দা করা জরুরি নয়। এ ধরনের ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ, যেখানে মামার তালাক দেবার পর মামীকে স্বামীর ভাগ্নের বিয়ে করা জায়েয রয়েছে, সেখানে মামীর খোলা চেহারায় তার সামনে যাওয়া জায়েয নয়। অপর দিকে ভাগ্নের জন্য জায়েয হবে না মামীর চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং তার সাথে একান্তে সময় অতিবাহিত করা।

অমুসলিম মহিলাদের নিকট পর্দার বিধান

প্রত্যেক গায়রে মাহরাম পুরুষের ও প্রত্যেক গায়রে মাহরাম বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে পরিমাণ পর্দা করা ফরয, অমুসলিম মেয়েলোকদের থেকেও সে পরিমাণ পর্দা করা আবশ্যক। অর্থাৎ যেমন কোনো বৃদ্ধা মহিলার

---

৭৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৭; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৭৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

৭৫. সূরা আন নিসা : ২৩ ও সূরা আন-নূর : ৩১ দ্রষ্টব্য।

গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে আসতে হলে শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অবশিষ্ট সারা শরীর ঢেকে আসতে হবে, এভাবে কোনো অমুসলিম মেয়েলোকের সামনে আসতে হলেও শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখ ছাড়া অন্য সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। সাধারণত মেয়েলোকেরা মনে করে যে, মেয়েলোক থেকে আবার কীসের পর্দা? কিন্তু এ মাসয়ালা দ্বারা জানা গেল যে, হিন্দু বা খ্রিস্টান মেয়েলোক থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাদের সামনেও শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখ ব্যতীত শরীরের একটি অংশও খোলা জায়েয নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলিম মহিলাগণ অমুসলিম যিম্মী নারীদের সামনে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে।[৭৬]

হযরত উমর (রা)-ও অমুসলিম মহিলাদের মুসলিম মহিলাদের পর্দা করাকে আবশ্যক মনে করতেন। মুসলিমগণ সিরিয়ায় যাওয়ার পর মুসলিম মহিলাগণ ইয়াহুদী-খ্রিস্টান মহিলাদের সাথে মেলামেশা শুরু করলে হযরত উমর (রা) সিরিয়ার প্রশাসক আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে লিখে জানালেন, আমি শুনতে পেলাম মুসলিম মহিলারা আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে গোসলখানায় গিয়ে একত্রে গোসল করে। মুসলিম মহিলাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে বিরত রাখবে।[৭৭]

অবশ্য হযরত আবু বকর (রা) অমুসলিম মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলাদের দেখা-সাক্ষাৎকে দোষের মনে করতেন না। একবার তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সেখানে এক ইয়াহুদী মহিলা বসা ছিল, যাকে তিনি ঝাঁড় ফুঁক করছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে ঝাঁড় ফুঁক কর।[৭৮] এ ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ইয়াহুদী ও মুশরিক মহিলারা নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নবীপত্নী (রা) গণের নিকট আসতেন, অথচ এটা কোনো রেওয়ায়াতে বর্ণিত নেই যে, নবীপত্নীগণ (রা) তাদের থেকে পর্দা করেছেন।

মূলকথা হলো, অমুসলিম মহিলাদের কাছে পর্দা করার যে বিধান তার উদ্দেশ্য কোনো ধর্মীয় স্বতন্ত্র রাখা নয়; বরং যে সকল নারীর স্বভাব-চরিত্র ও তাহযীব-তমদ্দুন জানা ছিল না কিংবা তা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বলে জানা ছিল–এ ধরনের নারীর প্রভাব থেকে মুসলিম নারীদেরকে রক্ষা করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। আবার অমুসলিম নারীদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্তা ও লজ্জাশীলা তারা আল কুরআনে নির্দেশিত ‘আপন মহিলাগণের’ মধ্যেই শামিল হবে।[৭৯]

গৃহপরিচারিকার সাথে পর্দা

পরিবারের প্রয়োজনে যদিও গৃহপরিচারিকার দ্বারা ঘরের কাজ করাতে কোনো দোষ নেই, তথাপি শরীয়তের নির্দেশ হলো, ঘরে গৃহপরিচারিকার সাথে পূর্ণ পর্দা করার সুব্যবস্থা থাকা দরকার। ঘরে কোনোভাবেই এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারবে না, যাতে গৃহপরিচারিকার সাথে পরিবারের কোনো পুরুষ একান্তে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

---

৭৬. আত-তাফসীরুল কাবীর, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৭৭. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
৭৮. প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯।
৭৯. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫০।

গায়রে মাহরাম হিজড়া, অন্ধ লোকদের কাছ থেকেও স্ত্রীলোকদের পর্দা করতে হবে। তাদের সামনে খোলা চেহারায় আসা জায়েয নেই।

عن ام سلمة قالت كنت عند النبى ﷺ وعنده ميمونة فاقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبى ﷺ افعمياوان انتما الستما تبصرانه

"হযরত উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে হযরত মায়মুনা (রা)সহ বসা ছিলেন। ইত্যবসরে (অন্ধ সাহাবী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রা) এলেন। ঘটনাটি ছিল পর্দার বিধান নাযিল হবার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন, তোমরা তার কাছে পর্দা কর। তখন তিনি বললেন, সে তো অন্ধ, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না?"[৮০]

তবে অন্ধদের ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, তাদের থেকে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ তাদের সামনে চেহারা ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা তো কিছুই দেখতে পায় না, তবে এক্ষেত্রে মহিলাদেরকে তাদের কাছে দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দিকে তাকানো জায়েয নয়। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ফাতেমা বিনত কায়স (রা)-কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রা)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها.

"সে একজন অন্ধলোক। তার বাড়িতে তুমি তোমার (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখতে পার। সে তো তোমাকে দেখতে পাবে না।"[৮১]

হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, অন্ধ ব্যক্তির সামনে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। খোলা চেহারা নিয়ে তাদের কাছে আসা-যাওয়া করা যাবে।

প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রথমত যেহেতু সহীহ হাদীসের বিপরীত,[৮২] একারণে সহীহ হাদীসের বিপরীতে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত যদি হাদীসটি শুদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে এর প্রকৃত মর্ম হবে, দৃষ্টি সংযত রাখা ও তাদের দিকে না তাকানো। কোনো পুরুষের দিকে মহিলাদের তাকানো চাই সে দৃষ্টিবান হোক কিংবা অন্ধ জায়েয নেই, যদি তাতে কোনো প্রকারের খারাপ লালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রা) বলেন, অনেক আলেমের মতে পরপুরুষের দিকে মহিলাদের তাকানো কোনোভাবেই জায়েয নয়, কামভাবের ইচ্ছা সহকারেও নয়, ইচ্ছা ছাড়াও নয়।

---

৮০. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮; সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

৮১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

৮২. যদিও ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন; তথাপি অনেকেই একে দুর্বল হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তদুপরি কোনো বিশুদ্ধ হাদীসও যদি অন্য আরেকটি অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত হয়, তাকে দুর্বল ও বিরল (شاذ) হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়। হাদীস সহীহ হওয়ার একটি শর্তই হল হাদীস شاذ না হওয়া।

মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে দেখার বিধান

নারীর রূপ-সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করা পুরুষের জন্য যেমন নাজায়েয, তেমনি পুরুষের প্রতি তাকানো নারীর জন্যও নাজায়েয। অনাচার-বিপর্যয়ের সূচনা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে এখান থেকেই হয়ে থাকে। তাই পুরুষদের জন্যও পর-স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয নেই, তেমনি স্ত্রীলোকদের জন্যও পরপুরুষকে দেখা জায়েয নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে।"[৮৩]

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لعن الله الناظر والمنظور إليه.

"যে দেখবে এবং যে দেখা দেবে, উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"[৮৪]

মেয়েলোকেরা সাধারণত মনে করে যে, পর-পুরুষদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নেই; কিন্তু তাদের জন্যে পর-পুরুষদের দেখতে কোনো ক্ষতি নেই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই মেয়েলোকেরা উঁকি মেরে পুরুষদের দেখে, তা জায়েয নেই। তবে বিয়ের প্রস্তাবপ্রদানকারী ছেলেকে দেখার বিষয়টি আলাদা। বিয়ের পূর্বে মেয়েদের জন্য ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গীকে দেখার মধ্যে কোনো দোষ নেই; বরং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য তা প্রয়োজনও। অনেকের মতে বেগানা পুরুষদের দেখা নারীদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, কামভাব সহকারে অসৎ উদ্দেশ্যে দেখুক অথবা তা ছাড়াই দেখুক।[৮৫]

افعمياوان انتما الستما تبصرانه "রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।"[৮৬] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে কোনো ভাবেই পরপুরুষকে দেখা মেয়েদের জন্যে জায়েয নয়। অবশ্য কিছু ফকীহের মতে কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্যে দূষণীয় নয়।

عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله ﷺ يوما على باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ورسول الله ﷺ ليسترنى بردائه انظر الى لعبهم

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙিনায় কিছুসংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এ কুচকাওয়াজ দেখছিলেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা)-ও এ কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন।"[৮৭] এ থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের পক্ষে পুরুষকে দেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়। এছাড়াও অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-কে আদেশ করেছিলেন, সেই সাহাবীর গৃহেই আবার ফাতেমা বিনতে কায়স (রা)-কে ইদ্দত পালনের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন।[৮৮]

---

৮৩. সূরা আন-নূর : ৩১।
৮৪. আস-সুনানুল কুবরা, (কিতাবুন নিকাহ), হাদীস নং : ১৩৮৬২।
৮৫. এ মত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম নববী (র) অন্যতম। (নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭)
৮৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮; সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
৮৭. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২।
৮৮. তদুপরি উম্মু সালামাহ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি তুলনামুলকভাবে দুর্বলও। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া এ হাদীসের রাবী 'নাবহান' প্রসঙ্গে ইবনু আব্দুল বার বলেন, "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত নন।" অপর দিকে ফাতেমা বিনত কায়স (রা)-এর হাদীসটি বিশুদ্ধ। এ কারণে এ হাদীসটি উম্মু সালামাহ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের চেয়ে দলীল হিসেবে অধিকতর শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য। (যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১।)

اعتدى فى بيت ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী (র) বলেন, ফাতেমা বিনত কায়স (রা) উম্মে শরীকের ঘরে ইদ্দত পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, "এই বাড়িতে লোক যাতায়াত করে। বরং তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে থাক এবং সেখানে তুমি পর্দা না করেও থাকতে পারবে। কারণ সে অন্ধ।"[৮৯]

আসল কথা হলো, নারী-পুরুষ একজন আরেকজনকে দেখার মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের প্রকৃতিতে অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করার প্রবণতা আছে। কোনো কিছু পছন্দ হলে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করে না। কিন্তু নারী প্রকৃতিতে আছে বাধাপ্রদান প্রবণতা ও পলায়নপরায়নতা। যে পর্যন্ত তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন না আসে ঐ পর্যন্ত সে এত দুঃসাহসী হয় না যে, কেউ তার মনঃপুত হলে সে তার দিকে ধাবিত হয়। তাই শরীয়ত এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ রেখে নারীর জন্য পুরুষকে দেখার ব্যাপারে ততখানি কঠোরতা আরোপ করেনি, যতখানি কঠোরতা আরোপ করেছে পুরুষের পক্ষে নারীকে দেখার ব্যাপারে।

তবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, নারীদের জন্য পুরুষকে কামভাবে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। হানাফী ও অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীর মতে- যদি দৃষ্টিদানের ফলে মেয়েদের মনে কামভাব জাগ্রত হবার সামান্যটুকু আশঙ্কাও থাকে, তবেই তাদের জন্য পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত (শাফেয়ীগণের মতে হাঁটু পর্যন্ত) দেহাঙ্গ ছাড়া শরীরের বাকি অংশ প্রয়োজনে দেখতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি দৃষ্টিদানের ফলে কাম-লালসা জাগ্রত হবার সামান্যটুকু আশঙ্কাও থাকে, তা হলে দৃষ্টিতে সংযত রাখাই হচ্ছে বিধান। তবে বিশেষভাবে যুবতীদের জন্য সর্বাবস্থায় নিজের দৃষ্টিতে সংযত রাখাই হলো উত্তম। মালেকীগণের মতে- কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকলে মেয়েদের জন্য পুরুষদের কেবল চেহারা ও প্রান্তবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই (মাথা, হাত ও পা) দেখাই জায়েয। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন- পেট, পিঠ, বক্ষ, কটিদেশ ও পায়ের নলা প্রভৃতি) দেখা জায়েয নয়।[৯০] তা ছাড়া একই সমাবেশে নারী-পুরুষ একত্রে বসা এবং অপলক চোখে দেখাও জায়েয নেই।

পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম মেয়েকে দেখার বিধান

পুরুষদের জন্য গায়রে মাহরাম মহিলাকে দেখা জায়েয নেই। তবে বয়োবৃদ্ধা মহিলা- যাদের কামভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং শারীরিক কাঠামোও শুষ্ক হয়ে গেছে এ জাতীয় মহিলারা মাহরামাদের মতো। অর্থাৎ মাহরামা আত্মীয়া (যেমন- বোন ও ফুফী)-এর যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা তার জন্যে জায়েয। অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যারা এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং পুরুষদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের কোনো রূপ উপযোগীও হয়নি- এ জাতীয় মেয়েদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা দূষণীয় নয়। তাদেরকে কাছে টেনে আদর করতে ও চুমো দিতেও কোনো অসুবিধা নেই, যদি কামভাব না থাকে। যদি এরূপ করার কারণে কোনোরূপ যৌন-উত্তাপ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়, তা হলে এধরনের কিছু করা জায়েয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে- সাত বছরে পৌঁছা পর্যন্ত মেয়ে শিশুদেরকে দেখতে ও স্পর্শ করতে পরপুরুষদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, সাধারণত ঐ বয়সে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা থাকে না।[৯১] কোনো পুরুষের জন্য পর-স্ত্রী কিংবা গায়রে

---

৮৯. সুনান আবু দাউদ, পৃ. ৩১২।

৯০. রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ৬, পৃ. ৩৭১; আল্লামা শাইখ নিযাম, আল ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০১০), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৭।

৯১. রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

মাহরাম কোনো মহিলার দিকে অসৎ উদ্দেশ্যে তাকানো হারাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া দৃষ্টিপাত করাও মাকরূহ। বেগানা নারীকে দেখা যেমন জায়েয নেই, তেমনি তাদের ছবি দেখাও জায়েয নেই। উল্লেখ্য যে, ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী বেগানা মহিলাদের সতর যদি খোলা ও অনাবৃত হয়, তা হলে সে দিকে দৃষ্টি দান করা জায়েয নেই, যদিও এ দৃষ্টি দানের মধ্যে কাম-লালসা বা স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্য না থাকে। তবে সতর যদি মোটা কাপড় দ্বারা এভাবে আবৃত থাকে, যাতে সাতরের কাঠামো ও অবয়ব বাইরে ফুটে ওঠে না, তা হলে কামভাব বা স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্য না থাকলে দৃষ্টি পড়লে কোনো অসুবিধা নেই।

অবশ্য এ কথা খুবই সত্য যে, দুনিয়ায় বাস করতে হলে সব কিছুর ওপরেই দৃষ্টি পড়বে। এটা মোটেও সম্ভব নয় যে, কোনো পুরুষ কোনো নারীকে এবং কোনো নারী কোনো পুরুষকে কখনো দেখতে পারবে না। এজন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে হঠাৎ কারো ওপর দৃষ্টি পড়লে তাকে কোনো দোষারোপ করা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জায়েয নেই বলে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– يا على لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.

"হে আলী, প্রথম বার দৃষ্টি পরার পর দ্বিতীয় বার আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কারণ প্রথম বার দৃষ্টিদান তোমার জন্য বিধেয় হলেও দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দান করা তোমার জন্যে সংগত নয়।"[৯২] হযরত জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

عن جرير بن عبد الله قال سالت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة فامرنى ان اصرف لبصرى

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকস্মিকভাবে দৃষ্টিপাত হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আদেশ করেন।"[৯৩] উল্লেখ্য যে, আকস্মিক দৃষ্টি বলতে প্রথম বারের দৃষ্টিকে বুঝানো হবে। ফলে কোনো বেগানা মেয়ের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। কারণ দৃষ্টিপাতই ফেতনার প্রথম স্তর।

রাসূলুল্লাহ (স) দৃষ্টিপাতকে চোখের যিনা উল্লেখ করে বলেন–

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق وزناهما الأذنين الاستماع وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطا، والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.

"আদম-সন্তানরা যে পরিমাণে যিনার অংশে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তায়ালা তা লিখে রেখেছেন। তারা কোনো না কোনোভাবে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। চোখের যিনা হলো দৃষ্টিপাত করা, জিহ্বার যিনা হলো এ প্রসঙ্গে কথা বলা, কানের যিনা হলো এর আলোচনা শোনা, হাতের যিনা হলো স্পর্শ করা ও পায়ের যিনা হলো তার দিকে হেঁটে যাওয়া। আর অন্তর তো তার আশা ও কামনাই করে থাকে। লজ্জাস্থান কখনো একে সত্য প্রমাণিত করে আর কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[৯৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

---

৯২. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬; সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।
৯৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২; সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
৯৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২২-২৩; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب فى عينه الآنك يوم القيامة

"যে ব্যক্তি পরনারীর সৌন্দর্যের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে।"[৯৫]

পরনারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা যেমন জায়েয নেই, তেমনি তার ছবি দেখাও জায়েয নেই। বর্তমানে কোনো কোনো ছবি এমনই আকর্ষণীয় ও কামোদ্দীপক করে তোলা হয় যে, তা মূল ব্যক্তির চেয়েও অধিক ফেতনা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সব ছবি দেখা হারাম।

গৃহপরিচারিকা যদি বয়োজ্যেষ্ঠা কিংবা মধ্যবয়স্কা হয়, তা হলে প্রয়োজনের বিবেচনায় ঠেকাবশত তার চেহারা ও হাতের কব্জি-দুটি দেখতে অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো এতে কোনোরূপ খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকতে হবে। যদি সে যুবতী হয়, তবে বিপদের আশঙ্কার কারণে কোনোভাবেই তার দিকে তাকানো জায়েয নেই।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকলে সুশ্রী তরুণের প্রতিও ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানো জায়েয নেই। অবশ্য যদি এমন আশঙ্কা না থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই।[৯৭]

যে সকল অবস্থায় পুরুষদের জন্য নারীদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয

অনেক সময় পুরুষরা এমন অনেক অবস্থারও সম্মুখীন হয়ে থাকে, যখন পরনারীকে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন কোনো নারী অজ্ঞতাবশত কোনো পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকে। আর সে ক্ষেত্রে তার দেহের কোনো অঙ্গ স্পর্শ করা প্রয়োজন হয়। কিংবা কোনো নারী কোনো মকদ্দমায় বিচারকের সামনে সাক্ষী কিংবা বাদী-বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, কিংবা কোনো নারীর গায়ে আগুন লেগেছে কিংবা কোনো নারী পানিতে ডুবে যাচ্ছে অথবা কোনো নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম বিপন্ন হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় শুধু তার মুখমণ্ডল নয়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপারগতাবশত শরীরের অপর যে কোনো অংশের ওপরও নজর দেয়া যাবে, তার শরীরও স্পর্শ করা যাবে। উপরন্তু আগুনে পুড়ছে বা পানিতে ডুবে যাচ্ছে এমন নারীকে কোলে তুলে নিয়ে আসা কেবল জায়েযই নয়, বরং ফরয।

বিয়ের উদ্দেশ্য ছেলে কিংবা মেয়েকে দেখা

বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীকে দেখা জায়েয আছে। এমনকি হাদীসে এক্ষেত্রে দেখার নির্দেশও রয়েছে।[৯৮] অধিকাংশ ইমামের মতে এ নির্দেশ পালন করা মুস্তাহাব।[৯৯] হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক নারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন–

---

৯৫. ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ২২ খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

৯৬. তাহমায, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

৯৭. এটা হানাফীগণের অভিমত। (রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫)
শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী কামভাব ছাড়াও, এমনকি ফেতনার আশঙ্কা না থাকলেও তাদেরকে দেখা হারাম। কেননা তারাও মেয়েদের মতোই ফেতনার উপলক্ষ। (নিহায়াতুল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৯; মুগনিউল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১) ইবনু হাজার আসকালানী (রা)-এর মতে তাদের সাথে মুসাফাহা করাও জায়েয নয়। ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৯৮. তবে তার চেহারা, কব্জি বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করা জায়েয নয়, যদিও এতে কোনোরূপ কামভাব সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। কেননা দৃষ্টি দানের চাইতে শরীর স্পর্শ করার ব্যাপারটি জঘন্যতর। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো বেগানা মহিলার শরীর স্পর্শ করা জায়েয নেই।

৯৯. যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৬।

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

"তাকে দেখে নাও। কারণ, এটি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি রচনায় অধিকতর উপযোগী।"[১০০]

হযরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.

"তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে যেন তাকে যথাসম্ভব দেখে নেয় যে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে কি না, যা উক্ত পুরুষকে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।"[১০১]

হযরত আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আছে যে, একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, আমি একজন আনসারী নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে ব্যক্তি বলল, না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন–

فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا.

"যাও, তাকে দেখো। কারণ আনসারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় চোখে সমস্যা দেখা যায়।"[১০২]

আলোচ্য হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, বিয়ে করার উদ্দেশ্যে থাকলে বেগানা নারীকে দেখা জায়েয আছে। বরং তা উত্তম বটে। তবে এ দেখা জায়েয হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত আছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

১. প্রস্তাবদানকারীর অন্তরে এ মর্মে প্রবল ধারণা ও বিশ্বাস থাকবে যে, প্রস্তাবিতা নারী কিংবা তার অভিভাবকরা তার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাবে। তা হলেই বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা মেয়েকে দেখা জায়েয হবে। যদি পূর্ব থেকে অন্তরে এমন ধারণা প্রবল হয়ে থাকে যে, মেয়ে কিংবা তার অভিভাবকরা তার এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবে, তা হলে বিয়ের উদ্দেশ্য থাকলেও বেগানা মেয়েকে দেখা জায়েয নয়।[১০৩]

২. এ দৃষ্টির পেছনে পবিত্র উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং শরীয়তের নির্দেশ পালন উদ্দেশ্য হতে হবে। কামভাব নিয়ে তাকানো মোটেও জায়েয নয়। তবে দৃষ্টিদানের ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কামভাব চলে এলে তাকে রোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য। কামভাব বা স্বাদ উপভোগটা গৌণ বিষয়, ফলে তা ধর্তব্য নয়।[১০৪]

৩. অধিকাংশ হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকী ইমামের মতে বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর শুধু চেহারা ও হাতের তালু ও কব্জি দেখা জায়েয আছে। কারণ, এগুলোর সাহায্যে নারীর রূপ-লাবণ্য ও শারীরিক কাঠামোর ব্যাপারে মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। হাম্বলীগণের মতে মেয়েদের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত খোলা থাকে (যেমন- চেহারা, ঘাড়, হাত ও পা প্রভৃতি), সেগুলো দেখার অনুমতি আছে।[১০৫]

---

১০০. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

১০১. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

১০২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

১০৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮২।

১০৪. বাদাইউস সানাইউ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২২; মুগনিউল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

১০৫. আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

৪. কারো কারো মতে বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা মেয়েকে দেখা জায়েয হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো তাকে দেখার পূর্বে তার অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে দেখা মাকরূহ।[১০৬] কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মত হলো- মেয়ের কিংবা তার অভিভাবকের অনুমতি কিংবা সন্তুষ্টি ব্যতীত, এমনকি তাদের অগোচরে কিংবা অজ্ঞাতসারেও দেখা জায়েয আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) কনে কিংবা অভিভাবকের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের শর্ত আরোপ করা ব্যতীতই তাকে দেখায় সাধারণ অনুমতি দান করেছেন। অধিকন্তু, এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, وإن كانت لا تعلم - "যদিও সে (অর্থাৎ মেয়ে) জানতে না পারে।"[১০৭] ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসেও এসেছে যে, তিনি বলেন, "তাই আমি সংগোপনে তার সৌন্দর্যাবলি দেখার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করলাম। অবশেষে আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখলাম, যার দরুন আমি তাকে বিয়ে করতে অনুপ্রাণিত হই এবং তাকে বিয়ে করি।" উক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখার জন্য পূর্বে অনুমতি নেয়ার দারকার নেই। আবার কতেক আলেম একেবারে না জানিয়ে গোপনে মেয়েকে দেখে নেয়াকে উত্তম বলে মন্তব্য করেন। কারণ, মেয়ে জানতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে সে এ ধরনের কৃত্রিম সাজসজ্জাও করতে পারে, যা দেখে পুরুষের প্রতারিত হবার আশঙ্কা রয়েছে।[১০৮] এছাড়া আবার অনেকেই এভাবে অনুমতি গ্রহণ করাতে সংকোচবোধও করতে পারে। আবার জানাজানি করে দেখাদেখির পর বিয়ে না হলে অনেকেই মনে কষ্ট পেয়ে থাকে অনেক সময় সামাজিকভাবেও অপমান বোধ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিয়ের নিয়ত করার পরে এবং প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে মেয়ে দেখা মুস্তাহাব। কারণ, বিয়ের নিয়ত করার আগে তো মেয়ে দেখারও দরকার নেই। আর বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পরেই যদি মেয়ে দেখা হয়, তা হলে হতে পারে, তার সে প্রস্তাব মেয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে অথবা দেখার পরে ছেলে নিজেও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এক্ষেত্রে দেখাদেখি হয়ে গেলে তা উভয় পক্ষের জন্য অসম্মানজনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত হাদীসগুলোতে 'যখন প্রস্তাব দেবে' কথাটির মর্ম হলো 'যখন প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে'। অন্য একটি হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

إذا ألقى الله قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.

"আল্লাহ তায়ালা যখন কারো অন্তরে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা জাগ্রত করে দেন, তখন তার পক্ষে তাকে দেখে নেয়া দোষের বিষয় নয়।"[১০৯]

বিয়ের উদ্দেশ্যে কোনো মেয়েকে প্রয়োজন হলে একাধিকবার দেখা যাবে। তার কোনো সমস্যা নেই। কারণ, প্রথম বার দেখে নারীর সৌন্দর্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে তার সৌন্দর্য ও গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার প্রয়োজন হলে একাধিকবার দেখা যেতে পারে। তবে তিন বারের বেশি দেখা উচিত নয়।[১১০] বিয়ের উদ্দেশ্যে যেমন ছেলের জন্য অপরিচিত মেয়েকে দেখা জায়েয, তেমনি মেয়েও

---

১০৬. এটা অধিকাংশ মালিকী ইমামের অভিমত। (হত্তাব, মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৪০৫)

১০৭. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২৩০৯১।

১০৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৩; মুওয়াফফেকুদ্দীন ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, (মিশর : মাকতাবাতুল কাহিরা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।

১০৯. সুনান ইবনু মাজাহ, (কিতাবুন নিকাহ), হাদীস নং; ১৮৬৪।

১১০. যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩।

ছেলেকে দেখতে পারে। কারণ, ছেলের যেমন পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে, তেমনি মেয়েরও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। হযরত উমর (রা) বলেন–

ولا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم؛ فإنهن يعجبهن منكم ما يعجبكم منهن.

"তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কুৎসিত লোকের সাথে বিয়ে দিয়ো না। কারণ, তাদের যে সকল বিষয় তোমাদেরকে মুগ্ধ করে থাকে, তোমাদের ঐসব বিষয়ও তাদেরকে মুগ্ধ করে।"[১১১] সুতরাং ছেলের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ব্যতীত শরীরের অন্য অংশ দেখতে মেয়ের জন্য কোনো বাধা নেই।

স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে একত্রে উপবেশন

পরিপূর্ণভাবে পর্দা বজায় রেখে অর্থাৎ চেহারা, চুল ও পুরো শরীর ঢেকে প্রয়োজনে স্বামীর নিকটাত্মীয় (যেমন স্বামীর বড় ও ছোট সহোদর কিংবা চাচাতো, খালাতো বা মামাতো ভাইদের সাথে বসা মহিলাগণের জন্য জায়েয আছে, যদি বসার মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি বা অনাকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা জাগ্রত হবার সামান্য অবকাশও থাকবে, তবে তাদের সাথে একত্রে বসা জায়েয নয়। এ করণেই একসাথে বসে রসালাপ করা ও গান ইত্যাদি শুনা জায়েয নয়। এভাবে তাদের কারো সঙ্গে একান্তে বসে সময় কাটানোও জায়েয নয়। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে স্বামী কিংবা অন্য কোনো পুরুষ মাহরামকে সাথে নিয়ে বসতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

"কোনো পুরুষ যেন অন্য মহিলার সঙ্গে একান্তে সময় না কাটায় তবে মাহরামের সঙ্গে থাকা অবস্থাটি ব্যতিক্রম।"[১১২]

নির্জনে নরনারীর সাক্ষাৎ

স্বামী ব্যতীত বা স্ত্রী ব্যতীত নির্জনে একজন নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ করা জায়েয নেই। কেননা এমতাবস্থায় যে কোনো সময় বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) কোনো পরপুরুষের সাথে কোনো মহিলার একান্তে অবস্থান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ... لا يخلون رجل بامرأة "কোনো পুরুষ যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো মহিলার সঙ্গে একান্তে সময় না কাটায়। ...."[১১৩] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.

"সাবধান! কোনো পুরুষ লোক যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো মহিলার সঙ্গে নিভৃতে নির্জনে না বসে। কারণ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রিত হলে সেখানে তৃতীয় জন হিসেবে শয়তান থাকে।"[১১৪]

উল্লেখ্য যে, নারী-পুরুষের মাঝখানে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এক সাথে অবস্থান করাকে নির্জনে একত্রিত হওয়া বলা যাবে না। যেমন একই বাড়ির এক রুমে যদি কোনো পুরুষ এবং অন্য রুমে কোনো মহিলা অবস্থান করে এবং প্রত্যেক রুম বন্ধ করার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা যদি থাকে তবে বাড়ির বাইরের দরজা একটি হলেও নারী-পুরুষের একই বাড়িতে অবস্থানকে নিভৃতে মিলন হিসেবে গণ্য করা হবে না।[১১৫]

---

১১১. প্রগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

১১২. সহীহ আল-বুখারী, (কিতাবুল জিহাদ), হাদীস নং : ২৮৪৪; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হজ্জ), হাদীস নং : ৩২৫৯।

১১৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১।

১১৪. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১।

১১৫. তবে কারো কারো মতে- এটাও নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য হবে।

মনে রাখতে হবে যে, নারী-পুরুষের একান্ত সাক্ষাৎ বলতে কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে কোনো নির্জন কক্ষে, স্থাপনায় বা কোনো স্থানে নারী-পুরুষের নিভৃতে সাক্ষাৎই উদ্দেশ্য নয়। বরং যে কোনো স্থানে নারী-পুরুষ মিলে গোপনে পরস্পর আলাপ করলে, তাকেই একান্ত সাক্ষাৎ হিসেবে গণ্য করা হবে। যদিও তা জনসমক্ষে হোক কিংবা খোলা আকাশের নিচে হোক বা গাড়িতে হোক কিংবা ঘরের ছাদের ওপরে হোক।[১১৬] অধিকন্তু, নিভৃতে মিলনেচ্ছু নারী-পুরুষের সাথে যদি অন্য কোনো পরপুরুষও থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও তা নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ এখানে মূল উদ্দেশ্যই মুখ্যরূপে বিচেচ্য হবে। আর যদি তাদের সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ কিংবা কোনো বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা থাকে, তবে তাদের সাক্ষাৎকে নির্জনে সাক্ষাৎ হিসেবে গণ্য করা হবে না।[১১৭]

মহিলাদের পারস্পরিক সালাম-মুসাফাহা

মহিলাদের পরপরেও সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা সুন্নাত।[১১৮] মহিলাদের মধ্যে এ সুন্নাতের প্রসার ঘটানো উচিত। উল্লেখ্য যে, সালামের পরিবর্তে 'আদাব' বলা কিংবা মুসাফাহার পরিবর্তে কদমবুছি করা জায়েয নেই। এমনটি না করে সালাম করা ও হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করা উচিত।[১১৯]

মাহরামদের মাঝে সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা

মাহরাম পুরুষ যেমন বাপ, চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনা প্রমুখের সামনে চেহারা খোলা রেখে সালাম বিনিময় করা ও পরস্পর মুসাফাহা করা জায়েয আছে।[১২০]

জামাতাকে সালাম দেয়া ও মুসাফাহা করা

জামাতা মাহরাম, জামাতার জন্য শাশুড়ি নিজের মায়ের মতোই। ছেলের জন্যে তার মায়ের যে সব অঙ্গ দেখা জায়েয। জামাতার জন্যও শাশুড়ির ঐ সকল অঙ্গ দেখা জায়েয আছে।

সাক্ষাতের সময় শ্বাশুড়ি জামাতাকে সালাম দিতে পারবে। এমনকি তার সাথে মুসাফাহা করাতে কোনো দোষ নেই।

পরপুরুষের সাথে আলাপ করা সালামের জবাব দেয়া

ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণের মতে অপরিচিত মহিলার কণ্ঠস্বরও সতরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একান্ত প্রয়োজন না থাকলে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা মোটেও জায়েয নেই। অবশ্য প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে কথা বলার অনুমতি আছে।[১২১] রাসূলুল্লাহ (স) নারীদেরকে তাদের স্বামীদের অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে নিষেধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাক্যালাপের সময় নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার না হয়।

---

১১৬. ফাতওয়া, (রিয়াদ : আল-লাজনাতুত দাইমা লিল বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪২২ হি.), ১৭ খণ্ড, পৃ. ৫৭।

১১৭. তাহমায, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

১১৮. মুগনিউল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১১৯. আশরাফ আলী থানবী, বেহেশতী জেওর, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৫), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০।

১২০. ইমাম আহমাদ (রা)-এর মতে- মাহরাম পুরুষদের সাথে মহিলাদের মুসাফাহা করা মাকরূহ। তবে বাপের সাথে মুসাফাহা করতে কোনো দোষ নেই।

১২১. যেমন অনেক মহিলা সাহাবীকে দেখা যায়, তাঁরা নিজেরা হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁদের থেকে অনেক পুরুষ হাদীস শুনেছেন। তা ছাড়া অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছেন।

পরপুরুষকে সালাম দেয়া ও মুসাফাহা করা

পরপুরুষকে সালাম করা জায়েয নেই। চাই সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়, পর্দার অন্তরাল থেকে হোক কিংবা পর্দার ভেতর থেকে। এটাই হানাফীগণের অভিমত। তবে ইবনু হাজার 'আসকালানী ও আরো কতিপয় আলেমের মতে- যদি ফেতনার কোনোরূপ আশঙ্কা না থাকে, তাহলে নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরকে সালাম করতে কোনো দোষ নেই।[১২২] অবশ্য পরপুরুষ যদি বয়োবৃদ্ধ হয়, তবে সালাম করা যাবে।

কোনো পরপুরুষের সাথে কোনো নারীর মুসাফাহা করা কোনোভাবেই জায়েয নেই। যদিও এতে মনে কোনোরূপ খারাপ বাসনা বা কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে। তবে বয়োবৃদ্ধা মহিলার সাথে মুসাফাহা করার ব্যাপারে কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম সারাখসী, কাসানী ও মারগীনানী প্রমুখের মতে- এ ধরনের মহিলাদের পক্ষ থেকে যেহেতু কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা নেই, তাই তাদের হাত স্পর্শ করতে এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করতে কোনো দোষ নেই। চাই মুসাফাহাকারী দু জনেই বয়োবৃদ্ধ হোক কিংবা একজন বয়োবৃদ্ধ, অপরজন কম বয়সী। হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কেও বর্ণিত রয়েছে, তিনি তাঁর খিলাফতকালে কখনো কখনো তাঁর দুগ্ধদানের সম্পর্কিত বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। তদুপরি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়ের (রা) যখন মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। সে তাঁর পদযুগল দাবিয়ে দিত এবং মাথার উঁকুন দেখত। এ সব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধা মহিলাদেরকে স্পর্শ করা ও তাদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েয।[১২৩] বেগানা নারী-পুরুষের জন্যে একে অপরের দেহ স্পর্শ করা জায়েয নয়। সুতরাং বেগানা নারী-পুরুষদের পরস্পরে মুসাফাহা করাও জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কোনো স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা করেননি। হযরত উমাইমা বিনতে রুকায়কা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– إنى لا أصافح النساء. "আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।"[১২৪]

হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

من مس كف امرأة ليس بسبيل وضع فى كفه جمرة يوم القيامة حتى يفصل بين الخلائق.

"যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করবে, কিয়ামতের দিন তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা তার হাতে থাকবে।"[১২৫]

পুরুষদের জন্য বেগানা মহিলাকে সালাম করার বিধান

বেগানা মহিলাকে মুখে সালাম করতে কোনো দোষ নেই, যদি একান্ত একাকীত্বে না হয় এবং কোনো ধরনের বিপদের আশঙ্কা না থাকে।[১২৬]

اخبرته اسماء بنت يزيد مر علينا النبى ﷺ فى نسوة فسلم علينا.

"হযরত আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে তিনি আমাদেরকে সালাম করেছিলেন।"[১২৭] হযরত উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

---

১২২. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ১১ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪।
১২৩. আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; বাদাইউস সানাইউ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।
১২৪. সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; সুনান ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।
১২৫. আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।
১২৬. এটি অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে- যুবতীদেরকে সালাম করা জায়েয নয়; বয়োবৃদ্ধাদেরকে সালাম করতে কোনো দোষ নেই।
১২৭. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭; ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় হিজরত করে আসার পর একদিন আনসারী মহিলাদেরকে একটি ঘরে সমবেত করেছিলেন। এরপর তিনি হযরত উমর (রা)-কে আমাদের কাছে পাঠালেন। তিনি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। মহিলারাও তাঁর সালামের জবাব দিল।[১২৮] এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নিভৃতে না হলে বেগানা মহিলাদেরকে সালাম করা দূষণীয় নয়। উল্লেখ্য দেবর, ভাসুর, চাচাশ্বশুর, দেবর বা ভাসুরের ছেলে- এজাতীয় আত্মীয়দের জন্য মহিলাকে সালাম দেয়ার মধ্যে যেমন কোনো অসুবিধা নেই, তেমনি মহিলার জন্যে পর্দাবৃত অবস্থায় তাদের সালামের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই মুসাফাহা করা যাবে না। মাহরাম নয় এমন কোনো পুরুষের সাথে মহিলার মুসাফাহা করা কবীরা গুনাহ। এতে যে কোনো মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বলা

পরপুরুষের সাথে কোমল ও মিষ্টিকণ্ঠে কথা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে তার অনুমতি আছে। তবে এক্ষেত্রে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা পরিহার করতে হবে, যাতে শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

“তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। নতুবা ঐ ব্যক্তি কুবাসনা করে বসবে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে।”[১২৯] অর্থাৎ, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির মনে কুলালসা ও আকর্ষণের ভাব উদ্রেক হয়। কেননা এ ধরনের কথা শুনলে লালসাকাতর ব্যক্তি খুবই আশাবাদী হয়ে পড়ে। মনে মনে তারা ভাবে, এ মহিলার সঙ্গে এর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকটি যদি স্পষ্ট ভাষায় সোজাসাপ্টাভাবে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেয় তবে এ মানসিক রোগাক্রান্ত লোকেরা লোভাতুর হওয়ার সাহস রাখবে না।

আয়াতের উক্ত নির্দেশ আসার পর উম্মুহাতুল মুমিনীনের অনেকেই কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন হলে মুখে হাত রেখে কথা বলতেন, যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে শ্রুত হয়।[১৩০]

হাঁটাচলার সময়ে পদক্ষেপের অবস্থা

বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যেতে হলে হাঁটার সময় পদযুগলকে খুব জোরে মাটির উপর ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তার আওয়াজ পরপুরুষ শুনতে না পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ.

“তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জোরে পদক্ষেপ না করে।”[১৩১] জাহেলী যুগে মেয়েরা পায়ে পাথরকুচির নূপুর পরত এবং হাঁটার সময় জোরে জোরে পদক্ষেপ করত। এতে রিনিঝিনি শব্দের ঝঙ্কার শ্রুতিগোচর হতো।

---

১২৮. আল জামেউ লিআহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১৮ খণ্ড পৃ. ৭১।
১২৯. সূরা আল-আহযাব : ৩২।
১৩০. রুহুল মায়ানী, প্রাগুক্ত, ২২ খণ্ড, পৃ. ৫।
১৩১. সূরা আন-নূর : ৩১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ

মহিলাদের পোশাকের স্বরূপ

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব-সভ্যতার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান ধাপ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা, সুসম্পর্ক ও সন্তানদের জন্য পরিপূর্ণ পিতৃ ও মাতৃস্নেহ নিশ্চিত করা। এজন্য নারী ও পুরুষের পবিত্রতা রক্ষা, বিবাহের সম্পর্ক রোধ ও নারীদের উপর দৈহিক অত্যাচার রোধ অতীব প্রয়োজনীয়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নারী-পুরুষ সকলেরই শালীন পোশাকে দেহ আবৃত করে চলা একান্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারে সম্প্রীতি, দাম্পত্য সুসম্পর্ক ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষারও অন্যতম মাধ্যম শালীন পোশাকে চলাফেরা করা।

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোশাক পরতে নির্দেশ দেয়। আমরা জানি যে, প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। অপর দিকে আগ্রাসী মনোভাব পুরুষের মধ্যে বেশি। এজন্য নারী ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইসলামে নারীর পোশাকের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় যে, তারা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখবেন, বাকি অংশ ঢেকে রাখা সামাজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরয নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা পুরো শরীর আবৃত করাকে ফরয করেছেন।

প্রকৃতিগতভাবেই নারী ও পুরুষের দেহের গঠনগত তারতাম্য থাকায় ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্যে যে-সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক। নারীর জন্যেও ঐসকল অঙ্গ আবৃত রাখার পাশাপাশি বেশকিছু বাড়তি বস্ত্রকেও আবশ্যক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (স)-এর পুণ্যময়ী স্ত্রী ও তাঁদের কন্যাগণ (রা) সাধারণত সেলোয়ার, কামিস ও ওড়না পরতেন। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে উত্তমরূপে সতর আবৃত করার উদ্দেশ্যে জিলবাব (বড় চাদর) গায়ে জড়িয়ে নিতেন। স্বভাবতই মুসলিম মহিলারাও তাদের অনুসরণ করেন। এ কারণে মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সর্বত্র নারীদের পোশাকে একটি সামঞ্জস্যভাব চোখে পড়ে।[১৩২]

বাংলাদেশে নারীদের প্রধান পোশাক হলো শাড়ি, ব্লাউজ ও সায়া।[১৩৩] এখানে শাড়ির প্রচলন আবহমানকাল থেকে চলে এসেছে। উঠতি বয়সের তরুণী ও শিক্ষার্থী মেয়েরা সাধারণত সেলোয়ার, কামিস ও ওড়না পরিধান করলেও পরিণত বয়সে তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকই গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা শাড়ি, ব্লাউজ ও সায়া পরে থাকে। ধর্মপরায়ণা মহিলারা বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মূল পোশাকের ওপর বোরকা অথবা প্রশস্ত ওড়না পরিধান করে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে শাড়ি ও (কনুইয়ের ওপরে হাতা-কাটা) ব্লাউজ পরে চলাফেরা করে তাতে আবশ্যিকভাবে আবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ কিছু অংশ যেমন– কাঁধ, পেটের নিচের অংশ, পিঠের নিচের অংশ, বুকের ওপরের অংশ ও পুরো হাত (বাহুর কিছু উপরের অংশ ব্যতীত) প্রভৃতি অঙ্গ অনাবৃত থেকে যায়। তদুপরি গাড়িতে উঠতে অথবা উপরে কোনো স্থাপনায় উঠার সময় দেহের নিচের অংশ থেকে কাপড় উঠে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এসব কারণে শাড়ি ও ব্লাউজ সতর রক্ষার জন্যে বেশি উপযোগী নয়। এ কারণে শাড়ি ও ব্লাউজের ব্যবহার পরিহার করাই শ্রেয়। অবশ্য সেগুলো চাদর কিংবা বোরকা দিয়ে ঢাকা থাকলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

---

১৩২. বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এর ব্যতিক্রম।
১৩৩. নারীদের কোমর থেকে নিয়ে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত শাড়ির নিচে পরিধেয় লম্বা কাপড়।

কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে মুসলিম মহিলাদের আদর্শ পোশাক হলো নিম্ন শরীরের জন্যে পায়ের পাতা অবধি ঢেকে থাকে এমন পায়জামা পরা এবং উর্ধ্ব শরীরের জন্য লম্বা আস্তিনের লম্বা ঝুলের ঢিলেঢালা জামা বা কোর্তা এবং যাতে বুক উঁচু দেখা না যায় সে জন্যে বক্ষ-বন্ধনী, আর মাথার জন্যে মুখঢাকা নিকাবসহ চাদর পরা। বাইরে যাওয়ার কালে কিংবা পরপুরুষের সাথে প্রয়োজনীয় সাক্ষাতের সময় তাদের অন্যান্য কাপড়ের ওপর প্রশস্ত বোরকা কিংবা লম্বা ঢিলে-ঢালা চাদর পরা উচিত।

মুসলিম মহিলার পোশাকের বৈশিষ্ট্য

কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মুসলিম মহিলার পোশাকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকা আবশ্যক–

১. সতর আবৃত করা।
২. ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়
৩. অমুসলিম ও পাপীদের অনুকরণ বর্জন
৪. নারী-পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য

পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক নিষিদ্ধ

ইসলামী পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক হওয়া। আঁটসাঁট ও পাতলা কাপড়ের পোশাক ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পোশাক পরিধানের পরেও চামড়ার রং বা দেহের মূল আকৃতি প্রকাশিত হলে তাকে পোশাক বলা যায় না, বরং তা নগ্নতা বলেই গণ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة.

"দুনিয়ার অনেক সুবসনা নারী আখেরাতে বসনহীনা (বলে বিবেচিত) হবে।"[১৩৪]

তিনি আরো বলেছেন–

سيكون فى آخر أمتى نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات

"আমার উম্মাতের শেষে এমন নারীগণ বিদ্যমান থাকবে যারা সুবসনা অনাবৃতা, তাদের মাথার উপরে উটের কুঁজ বা চুটির মতো থাকবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দেবে; কারণ তারা অভিশপ্ত।"[১৩৫]

তিনি আরো বলেছেন–

صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

---

১৩৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।
১৩৫. আবুল হাসান আলী আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, (মিশর : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৯৯৪), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

"দু শ্রেণির জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে এদের দেখা যাবে।) এক শ্রেণি ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মতো হাতিয়ার থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধর করবে বা কষ্ট দেবে। দ্বিতীয় শ্রেণির দোজখবাসী ঐ সকল নারী, যারা পোশাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মতো বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে।[১৩৬]

উপরের হাদীস-দুটি থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের জন্য চুলের খোপা মাথার উপরে বেঁধে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। চুলের খোপা মাথার পিছনে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে, যেন তা অতিরিক্ত আকর্ষণীয়তা বা প্রদর্শনীয়তা সৃষ্টি না করে।

উপরের হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, এমন পোশাক দ্বারা সতর আবৃত করলেও তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে, যা দেহ আবৃত করার মূল উদ্দেশ্য পূরণ করে না। দুটি কারণে তা হতে পারে– (১) তা এমন পাতলা হবে যে, চামড়ার রং কাপড়ের বাইরে থেকে বুঝা যাবে অথবা (২) তা অতি মোলায়েম বা আঁটসাঁট হওয়ার কারণে দেহের সাথে এমনভাবে লেগে থাকবে যে, আবৃত অঙ্গের মূল আকৃতি বাইরে থেকে ফুটে উঠবে। উভয় প্রকারের পোশাকই ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আলকামা (র)-এর আম্মা বলেন–

دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق (يشيف عن جيبها) فشقته عائشة عليها وكستها خمارا كثيفا.

"(আয়েশা রা.-এর ভাতিজী) হাফসা বিনত আব্দুর রাহমান আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে। হাফসার মাথায় একটি পাতলা ওড়না ছিল, যার নিচে থেকে তার গ্রীবাদেশ দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিধান করতে দেন।"[১৩৭]

তাবিয়ী হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন, তাঁর চাচা মুনযির ইবনু যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইরাক থেকে ফিরে এসে তাঁর আম্মা আসমা বিনত আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-কে পারস্যের মারভ ও কোহেস্তান অঞ্চলের মূল্যবান কাপড় হাদিয়া প্রদান করেন। তখন আসমার (রা) চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাত দিয়ে কাপড়গুলো স্পর্শ করে বলেন, উফ! তার কাপড়গুলো তাকে ফিরিয়ে দাও। এতে মুনযির খুব কষ্ট পান। তিনি বলেন, আম্মাজন, এ কাপড়গুলো সচ্ছ বা পাতলা নয় যে, নিচের চামড়ার রং প্রকাশ করবে। তিনি বলেন–

إنها إن لم تشف فإنها تصف.

"কাপড়গুলো (দেহের রং) প্রকাশ না করলেও তা (অতি মোলায়েম হওয়ার কারণে দেহের আকৃতি) বর্ণনা করে।"[১৩৮]

---

১৩৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮০।
১৩৭. আল-মুআত্তা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২।
১৩৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫২।

তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু সালামা বলেন, উমর (রা) মানুষদের মধ্যে মিসরীয় মূল্যবান 'কাবাতি' কাপড় বিতরণ করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মাহিলাগণ যেন এ কাপড়ের কামিস বা ম্যাক্সি না বানায়। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন আমি আমার স্ত্রীকে এ কাপড় পরিয়েছে। সে বাড়ির মধ্যে চলাচল করেছে। আমি তো দেখলাম না যে, তার কাপড় স্বচ্ছ বা দেহের রং প্রকাশ করছে। তখন উমর (রা) বলেন–

ان لم يكن يشف فإنه يصف.

"তা (রং) প্রকাশ না করলেও, (দেহের আকৃতি) বর্ণনা করে (ফুটিয়ে তোলে)।"[১৩৯]

উসামা ইবনু যায়েদ (রা) বলেন–

كسانى رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبى فكسوتها امرأتى فقال لى رسول الله ﷺ ما لك لم تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسوتها امرأتى فقال لى رسول الله ﷺ مرها فلتجعل تحتها غلالة إنى أخاف أن تصف حجم عظامها.

"দেহইয়া কালবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে সকল কাপড় হাদিয়া দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি মোটা (পুরু) মিসরীয় 'কাবাতি' কাপড়ও ছিল। তিনি আমাকে হাদিয়া দেন পরিধান করার জন্য। আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে প্রদান করি। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন, কী ব্যাপার? তুমি কাবাতি কাপড়টি পরিধান করনি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে প্রদান করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে নির্দেশ দেবে, সে যেন কাপড়টির নিচে একটি (সেমিজ-জাতীয়) পৃথক কাপড় পরিধান করে; কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, এ কাপড়টি তার হাড়ের আকৃতি বর্ণনা করবে (অর্থাৎ দেহের আকৃতি ফুটিয়ে তুলতে পারে।)"[১৪০]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কাপড় মোটা বা পুরু হলেও যদি অতি মোলায়েম বা নরম হওয়ার কারণে তা দেহের সাথে লেপটে থেকে মূল আকৃতি প্রকাশ করে তবে তা পরিধান করলে সতর আবৃত করার ফরয আদায় হবে না। এজন্য এরূপ কাপড়ের নিচে পৃথক কাপড় পরিধান করতে হয়।

নারী পুরুষ একে অপরের পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ

পোশাক যেমন দেহ আবৃত করে রাখে, তেমনি তা দেহ ও মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি যে, সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ একই; সামান্য কিছু মনো-দৈহিক পার্থক্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করে মানব সমাজ টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

বস্তুত পোশাকে, পেশায়, চালচলনে বা কর্মে পুরুষের অনুকরণ করতে করতে নারীর মধ্যে পুরুষালি প্রকৃতি জন্ম নেয় এবং সে নারীত্বকে 'অপমানজনক' বলে ভাবতে থাকে। 'নারী প্রকৃতির' সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম, দায়িত্ব, পেশা বা পোশাক তার কাছে খারাপ মনে হয় এবং পুরুষালি পোশাক, পেশা বা কর্মই তার কাছে ভালো লাগে। পুরুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। এরূপ প্রবণতা বিশ্বে মানব-জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

---

১৩৯. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, (মিশর : দারুস সালাম তৃতীয় প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১২৭-১২৮।

১৪০. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; মাজমাউয যাওয়াইদ ৫ম, প্রাগুক্ত, খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের মধ্যকার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখা ইসলামের অন্যতম প্রেরণা। এজন্য হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারীর জন্য পুরুষালি পোশাক ও পুরুষের জন্য মেয়েলি পোশাক ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ অনুকরণকারীরা তাঁর উম্মাত নয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন, ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال "যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে তারা আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়।"[১৪১]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث.

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (১) পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) পুরুষের অনুকরণকারী পুরুষালি মহিলা এবং (৩) দাইউস (যে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা মেনে নেয়)।[১৪২]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মহিলারা কি সেন্ডেল জাতীয় (পুরুষালী) পাদুকা পরিধান করতে পারবে? তিনি বলেন, তিনি উত্তরে বলেন,

لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء.

"রাসূলুল্লাহ পুরুষালি চলনের নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।" হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[১৪৩]

নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। প্রথমত, ইসলামের নির্দেশনা, দ্বিতীয়ত, নারী ও পুরুষের প্রকৃতি এবং তৃতীয়ত, দেশীয় প্রচলন ও রীতি। এগুলির ভিত্তিতে মুসলিম মহিলার পোশাক অবশ্যই পুরুষের পোশাক থেকে স্বতন্ত্র হবে।

মহিলাদের সুন্নতী পোশাক

আমাদের দেশে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ পুরুষদের 'সুন্নাতী' পোশাক নিয়ে অনেক কথা বললেও মেয়েদের 'সুন্নাতী' পোশাক নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। তার পরেও, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ও পরবর্তী যুগে মহিলা সাহাবীগণ বা তাবিয়ীগণ কী পোশাক পরিধান করতেন তা জানতে কারো মনে আগ্রহ থাকতে পারে। এজন্য এখানে সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করব।

মুসলিম মহিলার পোশাককে আমরা ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি। এ জাতীয় পোশাকগুলি মহিলা সাহাবীগণ পরিধান করতেন– (১) নিম্নাঙ্গের পোশাক : মহিলা সাহাবীগণ নিম্নাঙ্গের জন্য ইযার অথবা পাজামা পরিধান করতেন। (২) উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক : উর্ধ্বাঙ্গের জন্য তাদের মূল পোশাক ছিল 'দির'য়' বা জামা। পুরুষের

---

১৪১. মুসনাদ, হাদীস নং : ৬৫৮০।
১৪২. সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০; মাজমাউয যাওয়াইদ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।
১৪৩. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০।

'পিরহানের' ন্যায় গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা ও লম্বা হাতাওয়ালা কামীস বা ম্যাক্সিকে আরবীতে 'দির'য়' বলা হয়। এছাড়া তাঁরা 'রিদা' বা চাদরও ব্যবহার করতেন। (৩) মাথার পোশাক : মাথার জন্য তাঁরা খিমার বা বড় ওড়না ব্যবহার করতেন। (৪) মুখের পোশাক : মুখের জন্য তাঁরা নিকাব ব্যবহার করতেন। (৫) হাত-পায়ের মোজা (৬) জিলবাব বা বোরকা : বহির্গমনের জন্য জিলবাব ব্যবহার করতেন। বোরকার প্রচলনও তাঁদের মধ্যে ছিল।

মহিলাদের পায়জামা পরিধান করা

পায়জামা দ্বারা শরীরের নিম্নাংশ বেশ ভালোভাবে আবৃত করা যায়। তাই মহিলাদের জন্য পায়জামা পরা শুধু বৈধই নয়, বরং মুস্তাহাব।[১৪৪] হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

رحم الله المتسرولات من النساء.

"পায়জামা পরিধানকারী মহিলাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন!"[১৪৫] ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলারা লম্বা প্রান্তবিশিষ্ট কাপড় পরতেন।... তবে এটি যথাযথভাবে লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য বেশি উপযোগী ছিল না। যদি মহিলারা পায়জামা পরতেন তবে ভালো হতো। আর এটাই হলো তাদের জন্য যথার্থ পোশাক।"[১৪৬] হযরত আলী (রা) বলেন, আমি এক বর্ষণমুখর দিনে জান্নাতুল বাকীর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে বসা ছিলাম। ঐ সময় আমাদের পাশ দিয়ে এক মহিলা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাধার সামনের পাগুলো এক গর্তের আটকে গেলে মহিলাটি নিচে পড়ে গেল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স), ঐ মহিলাটি পায়জামা পরিধান করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন–

اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم و حضوا بها نساءكم إذا خرجن.

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের পায়জামা পরিধানকারী মহিলাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন! হে লোকসকল! তোমরা পায়জামা বানাও। কেননা এটা লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্যে খুবই উপযোগী পোশাক। তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকেও যখন তারা বাইরে যাবে পায়জামা পরার জন্য জোর তাগিদ করবে।"[১৪৭]

ইযার বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি

অগণিত হাদীসে উম্মুল মুমিনীন ও মহিলা সাহাবীগণের ইযার বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কামীস বা ম্যাক্সির নিচে নিম্নাঙ্গের পরিপূর্ণ সতর ও আবরণের জন্য তাঁরা 'ইযার' পরিধান

---

১৪৪. যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬।

১৪৫. আল-জামেউস সাগীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫।
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, পায়জামা পরিধান করা সুন্নাত মুয়াক্কাদা। কারণ, এটা মহিলাদের লজ্জাস্থানকে যথা সম্ভাব সর্বাধিক আবৃত করে রাখে। (মানাভী, ফায়জুল কাদীর শারহুল জামিইস সাগীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২।

১৪৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, ২২ খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

১৪৭. আবু বকর আহমদ আল বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, আল-আদাব, হাদীস নং : ৫১১; আবু জাফর মুহাম্মদ আল উকায়লী, আদ-দুয়াফাউল কাবীর, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪), হাদীস নং : ১০০।

করতেন। অনেক সময় ইযার গায়ে বা মাথায় জড়িয়ে তাঁরা অতিরিক্ত পর্দা বা আবরণের ব্যবস্থা করতেন। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন–

لما كانت الليلة التى كان النبى ﷺ فيها عندى انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعى فى رأسى واختمرت وتقنعت إزارى ثم انطلقت على إثره

"রাসূলুল্লাহ (স) যে রাত্রে আমার নিকট অবস্থান করলেন, সে রাত্রে তিনি তাঁর গায়ের চাদর খুলে রাখলেন, পাদুকাদ্বয় খুলে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন এবং তাঁর পরিধানের ইযারের প্রান্ত বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। যখনই তিনি ভাবলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখনই তিনি উঠে আস্তে আস্তে তাঁর চাদরটি নিলেন, আস্তে আস্তে পাদুকা পরিধান করলেন, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন এবং তারপর আস্তে করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। তখন আমি আমার জামা (কামীস বা ম্যাক্সি) মাথা দিয়ে পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম এবং আমার ইযার মাথায় দিয়ে দেহ-মুখ আবৃত করলাম, অতঃপর তাঁর পিছনে বেরিয়ে পড়লাম।"[১৪৮]

অন্য হাদীসে মহিলা তাবিয়ী উমরা বলেন– كانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.

"আয়েশা (রা) তাঁর ইযার খুলে তা সাধারণ পোশাকের উপরে 'জিলবাব' রূপে ব্যবহার করে সারা শরীর আবৃত করতেন।"[১৪৯]

দির'অ, কামীস ও রিদা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দেহ আবৃত করার জন্য মহিলাদের মূল পোশাক ছিল দির'অ (درع) বা 'কামীস'। বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষগণ যেরূপ লুঙ্গি বা ইযারের সাথে রিদা বা খোলা চাদর পরিধান করতেন মহিলারা সেরূপভাবে ইযারের সাথে চাদর পরিধান করতেন না। তাঁরা সাধারণত নিম্নাঙ্গের জন্য ইযার (লুঙ্গিজাতীয় পোশাক) পরিধান করতেন। আর লুঙ্গির সাথে কামীস বা ম্যাক্সি পরিধান করতেন। কামীস বা 'দির'আ'-র সাথে তারা রিদা বা চাদরও ব্যবহার করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়।

দেহের আকৃতিতে কেটে সেলাই করে বানানো সকল জামাকেই 'কামীস' বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুসলিম মহিলাদের 'দির'অ' বা কামীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এগুলো ছিল পুরুষদের পিরহানের মতো বা বর্তমান যুগের ম্যাক্সির মতো। এগুলোর ঝুল থাকত ভূলণ্ঠিত, যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত আবৃত হতো। এগুলোর হাতা থাকত হাতের আঙুল পর্যন্ত।[১৫০]

---

১৪৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭০।
১৪৯. আত-তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭১।
১৫০. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; শরফুল হক সিদ্দীকী আল আযীম আবাদী, আউনুল মাবুদ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন–

كانت المرأة تتخذ درعها أزرارا تجعله فى إصبعها تغطى به الخاتم.

"মহিলারা তাদের জামার হাতায় আঙুলের মধ্যে ব্যবহারের জন্য বোতাম লাগাতেন, যা দিয়ে তারা তাদের আংটি আবৃত করতেন।" [১৫১]

তাদের কামীস বা ম্যাক্সি এমনভাবে পায়ের পাতাসহ তাদের পূর্ণ শরীর আবৃত করত যে, এর সাথে পাজামা, ইযার বা অন্য কোনো পোশাক না পরে শুধু ওড়না ব্যবহার করেই সালাত আদায় সম্ভব ছিল।

খিমার বা ওড়না পরা

মুসলিম নারীর অন্যতম পোশাক খিমার অর্থাৎ মস্তকাবরণ বা ওড়না। কুরআন কারীমে মুমিন নারীদেরকে ওড়না পরিধান করতে এবং ওড়না দ্বারা ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ আবৃত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাইরে বের হওয়ার কালে বা পরপুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় মহিলাদের জন্যে মাথায় এমন ওড়না পরা ওয়াজিব, যা দিয়ে মাথা, গ্রীবা, কাঁধ ও বক্ষদেশ আবৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.

"তারা যেন তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশের ওপর রাখে।"[১৫২]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত خمر শব্দটি خمار-এর বহুবচন। এর অর্থ এমন কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দিয়ে মাথা, গ্রীবা, কাঁধ, কান ও বুক আবৃত থাকে। আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে মাথার ওড়না বক্ষদেশের ওপর রাখার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো জহেলী যুগে নারীরা ওড়না মাথার ওপর রেখে তার দু'প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গ্রীবা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। একারণে উক্ত আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত এমনভাবে পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, যাতে গ্রীবা, কাঁধ, কান ও বুক আবৃত থাকে।[১৫৩] এছাড়াও পুরুষেরা যে ভাবে মাথায় চাদর রেখে তার দু'পাশ মাথার দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখে, সেভাবে মহিলাদের ওড়না পরা উচিত নয়; বরং ওড়নাটি মাথায় এভাবে পেঁচিয়ে রাখবে, যাতে মাথার কোনো অংশই দেখা না যায়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলারা মোটা কাপড়ের বড় আকারের ওড়না ব্যবহার করতেন। এগুলোর আকার এত বড় ছিল যে, তা চাদর বা ইযার হিসেবে ব্যবহার করা যেত। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করেন।

وقد أزرتنى بنصف خمارها وردتنى بنصفه.

"তখন তিনি তার খিমার বা ওড়নাটির অর্ধেক আমাকে ইযার হিসেবে পরিধান করান এবং বাকি অর্ধেক চাদর হিসেবে আমার গায়ে জড়িয়ে দেন।[১৫৪]

---

১৫১. আবু ইয়ালা আহমদ আল মুসিলী, আল-মুসনাদ, (দামেস্ক : দারুল মামূন লিততুরাস, ১৯৮৪), ১২ খণ্ড, পৃ. ৪২৩-৪২৪; মাজমাউয যাওয়াইদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

১৫২. সূরা আন-নূর : ৩১

১৫৩. রূহুল মায়ানী, প্রাগুক্ত, ১৮ খণ্ড, পৃ. ১৪২; আল-কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০।

১৫৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২৯।

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) তাঁর আম্মা উম্মে সুলাইমের একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله ﷺ.

"তখন উম্মে সুলাইম দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। তিনি তার ওড়না মাটিতে ময়লার মধ্য দিয়ে টানতে টানতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত করেন।"[১৫৫]

এ হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁদের ওড়নাগুলো অনেক প্রশস্ত ছিল। মাথার উপর দিয়ে ওড়না জড়ানোর পরে সাবধান না হলে তার অন্য প্রান্ত মাটিতে গিয়ে পড়ত।

মহিলাদের জন্যে জিলবাব পরিধান করা

জিলবাব শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো, গাউন, শেমিজ, ব্লাউজ, বড় চাদর ইত্যাদি। পরিভাষায় জিলবাব হলো এমন একটি লম্বা চাদর, যা মহিলারা তাদের স্বাভাবিক পরিধেয় বস্ত্রের উপর পরে থাকে এবং যা দ্বারা তারা তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরকে আবৃত থাকে।[১৫৬] উক্ত অর্থে 'জিলবাব' আমাদের দেশে প্রচলিত 'বোরকা'র প্রায় কাছাকাছি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।"[১৫৭] আয়াতে উল্লেখিত চাদর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন– এ চাদর ওড়নার ওপর পরিধান করা হয়।[১৫৮] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সীরিন (রা) বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী (রা)-কে উক্ত আয়াতে বর্ণিত জিলবাব পরার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের একটি লম্বা চাদর নিয়ে প্রথমে ওপর দিক থেকে তা মুখমণ্ডলের ওপর এভাবে ঝুলিয়ে দিলেন, যার ফলে ভ্রু পর্যন্ত ঢেকে গেল। এরপর চেহারা এভাবে আবৃত করে ফেললেন, যার দরুন নাক ও ডান চক্ষুসহ সারা মুখমণ্ডল ঢেকে গেল, শুধু বাম চোখ খুলে রাখলেন।[১৫৯] হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মহিলারা জিলবাবকে প্রথমে কপালের ওপরে এভাবে পেঁচিয়ে বাঁধবে, যাতে মাথা থেকে তা খুলে না পড়ে। অতঃপর নাকের ওপর ঘুরিয়ে নেবে। যদিও এতে চোখ-দুটি দেখা যায়; কিন্তু বক্ষদেশ ও চেহারার বেশিরভাগ অংশ ঢেকে থাকবে।[১৬০] হযরত উমর (রা) বলেন, জিলবাব বা হিজাবের জন্য যে কাপড় বা চাদর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার মধ্যে নিম্নের শর্তগুলো বিদ্যমান থাকতে হবে। শর্তগুলো হলো–

---

১৫৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০০৯।

১৫৬. যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১-২২।

১৫৭. সূরা আল-আহযাব : ৫৯।
জلابيب শব্দটি جلباب শব্দের বহুবচন। এর অর্থ : كل ثوب يغطى جميع البدن. অর্থাৎ পুরো শরীর আবৃতকারী লম্বা চাদর। ইবনুল মঞ্জুরের মতে– الجلباب ثوب أوسع من الخمار تغطى به المرأة رأسها وصدرها - অর্থাৎ জিলবাব হল ওড়নার চাইতে প্রশস্ত এক প্রকার লম্বা চাদর, যা দিয়ে মহিলারা নিজেদের মাথা ও বক্ষ আবৃত করে রাখে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন– ওড়নার ওপরে যে চাদর পরা হয় তা-ই জিলবাব।

১৫৮. তাফসীরু কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

১৫৯. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮২, আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ আসীরুদ্দীন আল আন্দালূসী, তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪২০ হি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

১৬০. তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

ক. ঐ কাপড়টি এ পরিমাণে দীর্ঘ ও প্রশস্ত হতে হবে, যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে থাকে।

খ. ঐ কাপড় যেন এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয় যে, নিজের সৌন্দর্য ঢাকতে গিয়ে নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ধরা দেয়।

গ. ঐ কাপড় যেন মহিলাদের গোপন ও স্পর্শকাতর অঙ্গকে স্পষ্ট করে না তোলে।[১৬১] জিলবাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "কাপড়ের ওপর জিলবাব পরার উদ্দেশ্য মূলত দুটি। ১. পোশাকের সৌন্দর্যকে তা প্রকাশ হতে দেবে না, বরং ঢেকে রাখবে। ২. কাপড় পরার পর দেহের যে সব স্থান দৃষ্টিগোচর হয় তা আবৃত করে রাখবে।"[১৬২]

আলোচ্য আয়াতটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে স্পষ্টভাবে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। যদিও কেউ কেউ. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "তারা যেন যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"[১৬৩] আয়াতের আলোকে মুখমণ্ডল খোলা রাখাকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো– মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোনো প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে মহিলাদের এ জিলবাব পরতে হবে। কারণ বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ও পথে-ঘাটে ভালো-মন্দ বিভিন্ন প্রকার লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হতে পারে। তাই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্বীয় রূপ-লাবণ্যকে গোপন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জিলবাব পরেই বের হতে হবে। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (র) বলেন– "আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স)-কে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে চায় তবে তিনি যেন তাদেরকে জিলবাব পরতে বলেন।"[১৬৪] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "মহিলাদের বাইরে যেতে হলে তারা পোশাকের ওপর জিলবাব ঝুলিয়ে দেবে, যেন তাদের সারা শরীর আবৃত থাকে। জিলবাবটি অবশ্যই ওড়নার ওপর পড়তে হবে, যাতে মুখমণ্ডল আড়াল হয়ে থাকে।"[১৬৫]

কোনো শরয়ী প্রয়োজন দেখা দিলে যেমন ঈদের জামাতে হাজির হওয়ার জন্য কিংবা মহিলাদের বাইরে যেতে হলেও জিলবাব পরেই বের হওয়া উচিত। হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আমাদের সাবালিকা, ঋতুমতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে (নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে) বের করি। তবে ঋতুমতীরা নামায থেকে দূরে থাকবে; দোয়া ও কল্যাণে শরীক হবে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানতে চাইলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স), আমাদের কারো কারো তো জিলবাব নেই! তিনি বললেন– لتلبسها صاحبتها من جلبابها "এক বোন অন্য বোনকে তার জিলবাব পরিয়ে দেবে।"[১৬৬]

মহিলারা যে কোনো রঙের জিলবাব, বোরকা বা বহির্বাস পরিধান করতে পারেন। সমাজে অপ্রচলনের কারণে প্রসিদ্ধির ভয় না থাকলে রং ব্যবহার সৌন্দর্য প্রদর্শন বলে গণ্য নয়। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স)

---

১৬১. মুহাম্মদ রাওয়াস কালআ জী, ফিকহু উমার (রা) (মিশর : দারুন নাফায়েস, ১৯৮৯), (হিজাব শিরোনাম)

১৬২. প্রাগুক্ত।

১৬৩. সূরা আন-নূর : ৩১।

১৬৪. আল জামেউ লিআহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

১৬৫. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

১৬৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬, ৫১, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১, আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১, সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

পুরুষদেরকে টকটকে লাল বা অনুরূপ বেশি আকর্ষণীয় রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নারীদের জন্য অনুরূপ পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন,

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه.

"পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধ প্রকাশিত হয় এবং রং অপ্রকাশিত থাকে এবং মেয়েদের সুগন্ধি যার রং প্রকাশিত হয় এবং সুগন্ধ অপ্রকাশিত থাকে।[১৬৭]

এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাগণ যে কোনো রং দিয়ে নিজেদের পোশাক রঞ্জিত করতে পারবেন, যদি তার সুগন্ধ প্রসারিত না হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলাগণ এভাবে বিভিন্ন রঙের বহির্বাস পরিধান করতেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ী ইবরাহীম নাখায়ী (র) বলেন, তিনি তাবিয়ী আলকামা ও আসওয়াদের সাথে নবী-পত্নীগণের নিকট গমন করতেন– فيراهن فى اللحف الحمر.

"তিনি দেখতেন যে, তারা লাল চাদর পরিধান করে আছেন।"[১৬৮]

অন্য তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা বলেন– رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر

"আমি দেখলাম যে, নবী-পত্নী উম্মে সালামা একটি 'আফসার' রঞ্জিত লাল কামীস (ম্যাক্সি) ও অনুরূপ একটি আসফার রঞ্জিত লাল চাদর পরিধান করে রয়েছেন।"[১৬৯]

অনুরূপভাবে আয়েশা (রা), আসমা (রা) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী লাল, আফসার-রঞ্জিত বা অনুরূপ রঙের বহির্বাস বা পোশাক পরিধানরত অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন, অনুরূপ পোশাকে হজ্জের ইহরাম করে হজ্জে আগমন করেছেন এবং অন্যান্য সময়ে এরূপ পোশাক পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[১৭০]

উল্লেখ্য যে, জিলবাব পরার এ নির্দেশ বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে জরুরি নয়। তারা পরপুরুষের সামনে জিলবাব ছাড়া যেতে পারবে; তবে তারা ওড়না দিয়ে মাথা ভালোভাবে ঢেকে রাখবে, যেন চুল দেখা না যায়।[১৭১] অবশ্য যে সব বৃদ্ধার রূপ-সৌন্দর্য অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও যে বৃদ্ধা সৌন্দর্য প্রদর্শনের অভিলাষ রাখে, তার জন্য জিলবাব পরিহার করা জায়েয নয়।[১৭২] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ব্যতীত কেবল নিজেদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। অবশ্য এ থেকে বিরত থাকাই তাদের

---

১৬৭. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪; সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
১৬৮. আল-মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।
১৬৯. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।
১৭০. আল-মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬০।
১৭১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪।
১৭২. তাফসীরে মাযহারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।

জন্যে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[১৭৩] অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক কাঠামো ধীরে ধীরে ন্যূব্জ হয়ে পড়ে তখন এজাতীয় মহিলাদের জন্যে পর্দার বিধান শিথিল হয়ে যায়।

মহিলাদের বোরকা পরিধান

মাথা ও মুখ একত্রে আবৃত করার জন্য বোরকার প্রচলনও রাসূল (স)-এর যুগে ছিল। 'বুরকা' (برقع) অর্থ মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পোশাক। আমাদের দেশে সাধারণত দেহ ও মাথা আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুই বা তিন প্রস্ত কাপড়কে একত্রে বোরকা বলা হয়। সাধারণভাবে গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করার বড় 'গাউন' বা ম্যাক্সিকেই বোরকা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিকাব বা মুখাবরণসহ উপরের অংশকেই 'বুরকা' বলা হয়। নিচের অংশটি কামীস বা 'দিরঅ' বলে গণ্য।[১৭৪]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ও পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম মহিলারা মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য 'বুরকা' (برقع) পরিধান করতেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের মহিলাদের মধ্যে বোরকার প্রচলন ছিল। লক্ষণীয় যে, মারফূ হাদীস বা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর চেয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য ও বাণীতে আমরা বুরকা শব্দের উল্লেখ বেশি দেখতে পাই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবী তাবিয়ীদের যুগে বোরকা ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বাহ্যত এর কারণ, জিলবাবের চেয়ে বোরকার ব্যবহার ও বোরকা পরিহিত অবস্থায় কাজ কর্ম করা অধিকতর সহজ।[১৭৫]

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আরবের অবাধ নীতিতে চলতে অভ্যস্ত মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার কালে মাথার ওপর প্রশস্ত কালো চাদর (জিলবাব) জড়িয়ে তা দিয়ে সমস্ত মাথা, মুখমণ্ডল ও সারা শরীর ঢেকে রাখত। বলা যায়, এ চাদরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান যুগে এসে বোরকার রূপ ধারণ করেছে। অতএব বর্তমানে পর্দার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে মুসলিম মেয়েদের বোরকা পরেই ঘর থেকে বের হওয়া উচিত। বর্তমানে এটিই জিলবাবের অর্থে গৃহীত হবে।

উল্লেখ্য যে, বোরকা কালো রঙের হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, বোরকা যে রঙেরই হোক না কেন, এমনকি কালো বর্ণের হলেও যদি তা চাকচিক্যপূর্ণ ও শোভাবর্ধক না হয়। অবশ্য এ বিষয়টি সত্য অন্যান্য রঙের চেয়ে কালো রং নজর কম কাড়ে, কাজেই কালো রঙের বোরকা পরাই মেয়েদের জন্য বাঞ্ছনীয়। মহিলা সাহাবীগণ কালো রঙের জিলবাব পরতেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) পর্দানশীন আনসারী মহিলাদের প্রশংসায় মন্তব্য করেন–

خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية.

"মাথায় কাকসদৃশ চাদর পরে আনসারী মহিলাগণ বের হয়েছেন।"[১৭৬]

অর্থাৎ তাঁদের মাথার ওপর এমন চাদর শোভা পেত, যার রং দেখতে কাকের মতো কালো ছিল। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাদের জিলবাবের রং কালো ছিল।

---

১৭৩. সূরা আন-নূর : ৬০।

১৭৪. আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।

১৭৫. আল-মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩-২৮৪; কিতাবুল আসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬।

১৭৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭।

মুসলিম মহিলাদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে ইউরোপীয় কিংবা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ

পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলিম মহিলাদের জন্যে ধর্মীয় শালীনতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতি নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিজাতীয় মহিলাদের নির্বিচারে অনুকরণ চরম হীনমন্যতার ফল। তাই ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করে এমন যে কোনো পোশাক ইসলামের অনুমোদিত হতে পারে না। বর্তমান সমাজে কিছু মুসলিম মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায়, তারা পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুসরণে স্যুট-প্যান্ট, স্লিভলেস, টপলেস, লো স্কার্ট, মিনিস্কার্ট, জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি প্রভৃতি পরে। এ সব কাপড় পর্দার উপযোগী তো নয়ই; বরং এগুলো তাদের দেহকে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে প্রকাশ করে। সুতরাং এ সব কাপড় পরা জঘন্য গুনাহ। হযরত উমর (রা) পারস্যবাসী মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ জারি করে বলেন– وذروا التنعم وزي العجم "তোমরা অনারব মুশরিকদের সুখ-সম্ভোগ ও পোশাক-আশাক পরিহার করে চলবে।"[১৭৭]

মহিলাদের জন্যে শাড়ি পরা

শাড়ি যথাযথভাবে সতর ঢাকার জন্যে তেমন উপযোগী নয়। বর্তমানে বেশিরভাগ মহিলা যেভাবে শাড়ি পরে তাতে আবশ্যিকভাবে আবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ কিছু অংশ অনাবৃত থেকে যায়। এছাড়া চলার সময় এবং গাড়িতে কিংবা উপরে উঠার সময় প্রায়ই দেহের নিচের অংশ খুলে যায় এবং কাজকর্মের সময় মাথা, বাহু, বগলের নিচে এমনকি পিঠও খুলে যায়। সুতরাং এরূপ শাড়ি পরিধান করাতে শুধু ঘরের বাইরে পর-পুরুষের নিকটই নয়; বরং ঘরের ভেতরেও সারাক্ষণ পরার জন্য উপযোগী নয়। কারণ তাদের মতো তাদের মাহরাম পুরুষরাও গুনাহগার হচ্ছে। তাই গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে মেয়েদের প্রচলিত শাড়ির ব্যবহার পরিহার করে চলা উচিত।

ব্লাউজ পরিধান করা

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্লাউজ শারীর সাথে পরার সম্পূরক পোশাক। মুসলিম নারীকে বাড়িতে মাহরামদের মধ্যে শাড়ি পরতে হলে তার ব্লাউজ অবশ্যই ছোট গলা ও কোমর পর্যন্ত ঝুল বিশিষ্ট হতে হবে। হাতা অন্তত কনুই পর্যন্ত হতে হবে। তা না হলে মাহরামদের সামনেও সতর অনাবৃত হয়ে যাবে এবং ফরয পালিত হবে না।

পেটিকোট বা সায়া পরিধান করা

সায়া বা পেটিকোট মূলত পুরুষদের লুঙ্গির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলারাও ইযার বা সেলাই-বিহীন লুঙ্গি পরিধান করতেন। তার উপরে তারা কামীস ইত্যাদি পরিধান করতেন। ইযারেরই পরিবর্তিত রূপ লুঙ্গি। সায়াও প্রায় সেইরূপ।

আমাদের দেশীয় প্রচলনে সায়া শাড়ির সাথে ব্যবহৃত সম্পূরক পোশাক। আমরা আগেই বলেছি যে, শাড়ি পরে ফরয সতর আবৃত করা খুবই কষ্টকর। আর সায়া ছাড়া তা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য সায়ার আকৃতি ও পরিধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফরয সতর আবৃত করার বিষয়টি বিশেভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শাড়ি ছাড়াও ম্যাক্সি ইত্যাদির সাথে পেটিকোট পরা হয়। সেক্ষেত্রেও সতর আবৃত করা, পাতলা না হওয়া ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

---

১৭৭. মুসনাদ, হাদীস নং : ২৪৮; আল-মুছান্নাফ, হাদীস নং : ১৯৯৯৩।

ম্যাক্সি ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলারা যে কামীস পরিধান করতেন তা মূলত পুরুষদের পিরহান বা বর্তমানের প্রচলিত ম্যাক্সির ন্যায়। এজন্য ম্যাক্সি মুসলিম মহিলাদের জন্য সুন্নাতসম্মত পোশাক। ঘরে মাহরামদের মধ্যে বা গায়রে মাহরামদের মধ্যে অবস্থান ও কর্মরত অবস্থায় ফরয সতর আবৃত করার জন্যও তা বেশি উপযোগী। তবে তা অবশ্যই পাতলা বা আঁটসাঁটো হবে না। গলা, হাতা ও ঝুল যেন ফরয সতর আবৃত করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাক্সির সাথে পেটিকোট ও ওড়নার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সতর আবৃত করতে হবে।

মহিলা ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে। এজন্য মহিলাদের ম্যাক্সির রং, কাটিং, ডিজাইন ইত্যাদি পুরুষদের পিরহান বা 'কামীস' থেকে পৃথক হবে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত সমস্যা হয় না। কোনো ম্যাক্সি দেখে কেউ কখনো পুরুষের পিরহান বলে ভুল করবে না।

কামিজ (কামীস) পরিধান করা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলারা কামীস পরিধান করতেন। মেয়েদের কামীসকে অনেক সময় 'দিরঅ' বলা হতো। আকৃতির দিক থেকে আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে প্রচলিত 'কামিজ'-এর সাথে সে যুগের কামীসের মিল নেই। সে যুগের কামীস ছিল পা পর্যন্ত লম্বা। কামীসের উপরে বা নীচে ইযার বা পাজামা ছাড়াই সালাত আদায় করা যেত। কামীস পরে সাজদা করলে পায়ের কোনো অংশ অনাবৃত হতো না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলিম মহিলাদের কামীস ছিল গোল এবং পা পর্যন্ত লম্বা ম্যাক্সির মতো।[১৭৮]

আমাদের দেশের মহিলাদের কামিজ এককভাবে সতর আবৃত হয় না। তবে সাথে পাজামা পরলে সতর আবৃত করা সম্ভব। ব্যবহারের জন্য পাজামা বা সেলোয়ারের সাথে কামীস শাড়ির চেয়ে অনেক ভালো পোশাক। সতর আবৃত করা ও কর্মের জন্য মুসলিম মহিলাদের উপযোগী পোশাক পাজামার সাথে কামীস। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ি হিন্দুদের পোশাক ও সেলোয়ার-কামীস মুসলমানদের পোশাক বলে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, সেলোয়ার বা পাজামার সাথে কামীস মহিলাদের জন্য ইসলাম-সম্মত ও সুন্নাত-সম্মত ভালো পোশাক।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

প্রথমত, যে নামেই পরিধান করা হোক পোশাকের মূল উদ্দেশ্য সতর আবৃত করা। এজন্য মুসলিম মহিলার কামীস পাতলা বা আঁটসাঁটো হবে না। তা অবশ্যই ঢিলেঢালা হবে ও গলা, হাতা ইত্যাদিতে ফরয সতর আবৃত করবে।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো রং বা ডিজাইনের 'কামীস' পরা বৈধ। তবে পুরুষদের কামীসের ডিজাইন বা কোনো পাপী সম্প্রদায়ের জন্য সুপরিচিত ডিজাইনের কামীস পরিহার করতে হবে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে ডিজাইন বা কাটিং-এর কামীস ব্যবহার করা হয় তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এতে কোনো 'অনুকরণ' হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইযার, রিদা ইত্যাদি পরিধান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীদের ইযার বা রিদা পরিধান করাতেন। তবে পুরুষদের জন্য কোনো বিশেষ ডিজাইন বা কাটিং প্রসিদ্ধ হলে তা মহিলারা ব্যবহার করবেন না। অনুরূপভাবে সমাজের পরিচিত কোনো অমুসলিম বা পাপে লিপ্ত গোষ্ঠীর ব্যবহারের কারণে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কোনো ডিজাইন বা কাটিং মুসলিম মহিলা ব্যবহার করা কখনো উচিৎ হবেনা।

---

১৭৮. আউনুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২।

মহিলাদের জন্যে হাত-মোজা পরা

কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে পরপুরুষদের সামনে মহিলাদের জন্য হাত-মোজা পরা নিঃসন্দেহে খুবই ভালো কাজ। তারা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় মোজা দ্বারা হাত দুটি আবৃত করে নিতে পারে। এটা মহিলাদের জন্যে অধিকতর নিরাপদ এবং তাদের পর্দার জন্য অধিকতর উপযোগী। অবশ্য হাত-মোজা দুটি এমন চাকচিক্যপূর্ণ ও সুন্দর না হয়, যার সাথে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

"ইহরামের সময় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা না পরে।"[১৭৯]

আলোচ্য হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলাদের মাঝে হাত-মোজা পরার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ কারণে হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় তিনি তাদেরকে হাত-মোজা পরতে নিষেধ করেছিলেন।

তৎকালীন যুগে পায়ের মোজা ছিল দুই প্রকার– (১) আল-খুফফ (الخف) অর্থাৎ চামড়ার মোজা এবং (২) আল-জাওরাব (الجورب) অর্থাৎ কাপড়, উল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুতকৃত মোজা। মহিলাদের মধ্যে পায়ে 'খুফফ' বা চামড়ার মোজা পরিধানের বিষয়টি ব্যাপক ছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। সাহাবীগণ মহিলাদের বহির্গমনের জন্য মোজা পরিধান করতে উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়। একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন–

ما صلت امرأة في موضع خير لها من قعر بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي ﷺ إلا امرأة تخرج في منقليها يعني خفيها

"মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ছাড়া অন্যত্র সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলার জন্য নিজ গৃহের অভ্যন্তরের চেয়ে উত্তম কোনো স্থান আর নেই, তবে যদি কোনো মহিলা তার চামড়ার মোজাদ্বয় পরিধান করে বের হয় তবে তা ভিন্ন কথা।"[১৮০]

মহিলাদের পোশাক পরিধানে ধর্তব্য বিষয়সমূহ

বাংলাদেশে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আরো অনেক প্রকারের পোশাক প্রচলিত। যেমন ফ্রক, স্কার্ট, ডিভাইডার ইত্যাদি। এসকল পোশাকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নের মূলনীতিগুলির অনুসরণ করতে হবে।

ক. পোশাক অবশ্যই ফরয সতর আবৃতকারী হবে। গৃহে বা মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পরিধেয় পোশাক অন্তত বাজু, কাঁধ, গলা থেকে পা পর্যন্ত পুরো আবৃত করবে।

খ. পোশাক ঢিলেঢালা হবে এবং পাতলা কাপড়ের তৈরি হবে না।

গ. মহিলাদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের অনুরূপ হবে না। রং, ডিজাইন বা কাটিংএ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে।

ঘ. কোনো পোশাক বা পোশাকের বিশেষ কাটিং বা ডিজাইন যদি কোনো অমুসলিম সম্প্রদায় বা পাপে লিপ্ত নারীদের মধ্যে সুপরিচিত ও বিশেষ পরিচিত হয় তা হলে মুসলিম মহিলারা তা পরিহার করবেন। অভিনেত্রী, গায়িকা বা অন্য কোনো নিষিদ্ধ পেশায় কর্মরত মহিলাদের অনুকরণ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই কাম্য। এছাড়া স্মার্টনেসের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

এ সকল মূলনীতির আলোকে উপরের পোশাকগুলি বা অন্য কোনো 'মহিলা-পোশাক' মহিলারা ব্যবহার করতে পারেন।

---

১৭৯. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

১৮০. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর সাজসজ্জা ও বিনোদন

জন্মগতভাবেই মানুষ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট। এজন্য সৌন্দর্য চর্চায় তাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। স্বভাবগত দীন হিসেবে ইসলামে সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য সামগ্রীর ব্যবহার সাধারণত বৈধ ও কাম্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ.

"বলুন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তাকে কে হারাম করেছে?"[১৮১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

"তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে।"[১৮২]

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– إن الله جميل يحب الجمال.

"আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[১৮৩]

তদুপরি স্বামীদের জন্য নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা মুস্তাহাব ও অতিশয় পুণ্যের কাজ।[১৮৪] আবার কখনো তা ওয়াজিবে পরিণত হয়, যদি স্বামী কামনা করে। স্ত্রীর সাজসজ্জা স্বামীকে অতিশয় মুগ্ধ ও প্রীত করে থাকে এবং এতে স্ত্রীদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আকর্ষণ বেড়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর স্ত্রী মেহেদীর খিযাব লাগাতেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পরে তিনি এগুলো ছেড়ে দেন। এরপর একবার তিনি আমার কাছে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী কি বাড়িতে আছে, নাকি নেই? তিনি বললেন, সে বাড়িতে আছে; তবে দুনিয়ার প্রতি তার কোনো অনুরাগ নেই। মেয়েদের প্রতিও নেই তার কোনো আকর্ষণ। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে আসলে আমি তাঁকে এ ব্যাপারটি অবহিত করলাম। এরপর তিনি উসমানের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, উসমান, আমি যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি, সে সবের প্রতি কি তোমার ঈমান আছে? তিনি জবাব দিলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা হলে আমার মধ্যেই তো তোমার জন্য রয়েছে অনুকরণের উত্তম আদর্শ। এ হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রীর সাজসজ্জার পরিত্যাগের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। এ থেকে জানা যায় যে, স্বামীবিশিষ্টা মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা করা উত্তম ও পছন্দনীয়।

তবে এ সাজসজ্জা অবশ্যই শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে। কোনোভাবেই তা লঙ্ঘন করা চলবে না। ঘরোয়া আবহে এবং পারিবারিক পরিসরে সৌন্দর্য চর্চা সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মহিলাকে

---

১৮১. সূরা আল-আরাফ : ৩২।
১৮২. সূরা আল-আরাফ : ৩১।
১৮৩. মিশকাতুল মাসাবীহ, (বাবুল গাদাব ওয়াল কিবর), পৃ. ৪৩৩।
১৮৪. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, হা. নং : ২৪২৩২।

দেখা যায় যে, তারা ঘরের মধ্যে স্বামীর উদ্দেশ্যে তেমন একটা সাজগোজ করে না; সাজগোসের যতসব আয়োজন, তা সবই হয়ে থাকে ঘরের বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা বাইরে যাওয়ার সময় জাহেলী যুগের মহিলাদের মতো নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে প্রস্তুত করে থাকে। তাদের এ সকল অবস্থা দেখে মনে হয় যেন, তারা পরপুরুষদেরকে প্রদর্শনের জন্য এ সব করছে।

এছাড়াও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ রাখতে হবে যে, এ কাজে যেন কোনো ধরনের অপচয় করা না হয় এবং বিলাসিতা প্রকাশ না পায়। ফুদালাহ ইবনু উবাযেদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– إن رسول الله ﷺ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه "রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বিলাসী জীবন যাপন করা থেকে নিষেধ করেছেন।" [১৮৫]

শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে চেহারা ও মুখের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করা দূষণীয় নয়; বরং স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সেজেগুজে থাকা আবশ্যক। তাই যে সব সৌন্দর্য উপকরণ বা কর্মকাণ্ড চেহারার সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে, চেহারার কোনো রূপ ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপের বিকৃতি না ঘটে, তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

মহিলাদের জন্য চোখে সুরমা ব্যবহার

চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হওয়া, চোখের ছানি ও আবরণ দূর হওয়া এবং চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করার মাঝে নারী-পুরুষ কারো জন্য কোনো অসুবিধা নেই। সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেও মহিলাদের জন্য তা ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ, স্বামীদের মনসন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মহিলাদের রূপ ও সৌন্দর্য চর্চা করার প্রতি শরীয়তের তাগিদ রয়েছে। তবে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে ইদ্দত পালনের সময় তা ব্যবহার করা উচিত নয়। তালাকে রাজয়ীপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য সুরমা ব্যবহার করা মুবাহ।[১৮৬]

বর্তমানে, ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়াসহ প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মেয়েদের প্রিয় প্রসাধনী হলো সুরমা। আই লাইনার বা চোখের পাতা অঙ্গনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

কপালে টিপ পরা ও সিঁথিতে সিন্দুর পরা

এ দেশে আজকাল একটি কুপ্রথা চালু হয়েছে যে, হিন্দু মেয়েদের দেখাদেখি অনেক মুসলিম মেয়েও কপালে টিপ পরে ও সিঁথিতে সিন্দুর পরে। এটা খুবই জঘন্য কুপ্রথা, বিজাতীয় অনুকরণ। এ কুপ্রথা মুসলিমদের পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ বা সৌন্দয চর্চা এদুটোতে অনুপস্থিত।

ভ্রূ উপড়ানো

লোমনাশকের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে ভ্রূকে চিকন ও সরু বানানো হারাম, কবীরা গুনাহ। যে মহিলা ভ্রূ উৎপাটন করে এবং যে মহিলা অন্যকে ভ্রূ উৎপাটন করতে দেয় তাদের প্রতি নবী করীম

---

১৮৫. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩; সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

১৮৬. আহকামুল কুরআন; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১-২; ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২।

(স) লা'নত করেছেন।[১৮৭] কারণ, আল্লাহ তায়ালা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেটিই তার সৌন্দর্য। তাকে পরিবর্তন করা মূলত সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার নামান্তর। আর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। ভ্রূর কেশরাজিও আল্লাহ তায়ালা চেহারায় সৌন্দর্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি ভ্রূ মাথার উপর থেকে পতিত ধুলাবালি থেকে ও সূর্যের কিরণ থেকে চোখকে রক্ষা করে থাকে। তাই ভ্রূকে কোনোরূপ পরিবর্তন করা জায়েয নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

"যে সব মহিলা উল্কি আঁকে এবং অন্যকে উল্কি আঁকতে দেয়, ভ্রূ উৎপাটন করে এবং অন্যকে উৎপাটন করতে দেয়, সৌন্দর্যের জন্যে দাঁতগুলোকে সোজা ও পাতলা করে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মকে পরিবর্তন করে তিনি তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।"[১৮৮]

মহিলাদের চেহারায় গজিয়ে ওঠা অবস্থিত কেশ উৎপাটন

মহিলাদের চেহারা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে অবস্থিত কেশগুলো গজিয়ে ওঠে তা উৎপাটন বা অপসারণ করা জায়েয আছে।[১৮৯] যেমন কোনো মহিলার দাড়ি বা গোঁফ গজালে, বা গণ্ডদেশে কোনো কেশ জন্মালে কিংবা পায়ের নলায় কিংবা হাতে অথবা পেটে বা পিঠে কোনো চুল গজালে সেগুলো অপসারণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য চর্চা নয়। বরং বিশ্রীভাব দূর করা। বর্ণিত আছে– একবার জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমার চেহারায় তো অনেক কেশ রয়েছে। আমি কি এগুলো উপড়িয়ে ফেলতে পারি? এগুলো উৎপাটন করার মাধ্যমে আমি আমার স্বামীর কাছে সৌন্দর্য তুলে ধরতে চাই। হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, তুমি কষ্টদায়ক এ কেশগুলো সরিয়ে নাও এবং স্বামীর জন্যে নিজেকে তৈরি করে নাও, যেমন তুমি কারো সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরি করে থাক।"[১৯০]

দাঁতকে সুঁচালো ও পাতলা করা

মহিলাদের জন্য সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা জায়েয নেই। কারণ, এটা আল্লাহপ্রদত্ত আকৃতিতে এক প্রকারের পরিবর্তন সাধনের নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (স) যে মহিলা দাঁত সুঁচালো ও পাতলা করে এবং যে এ কাজে সহায়তা করে তাদের প্রতি তিনি লা'নত করেছেন। হাদীসে এসেছে–

لعن رسول الله ﷺ .... الواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

"যে মহিলা দাঁত সুঁচালো ও পাতলা করে, যে এ কাজে সাহায্য করে থাকে এবং যারা সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে দাঁতগুলোকে ফাঁক করে, এভাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[১৯১]

---

১৮৭. হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলাদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, তারাই সচরাচর সৌন্দর্যের জন্যে এরূপ করে থাকে। কোনো পুরুষও যদি ভ্রূ উৎপাটন করে, তার বেলায়ও হুকুমটি প্রযোজ্য হবে।

১৮৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৫, ৮৭৮; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; সুনান নাসায়ী : প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

১৮৯. হানাফীগণের মতে- এগুলো অপসারণের মাধ্যমে চেহারার মাধুর্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা মুস্তাহাব। মালেকীগণের দৃষ্টিতে- এগুলো অপসারণ করা ওয়াজিব। কারণ, এগুলো ছেড়ে রাখলে ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণের দৃষ্টিতে, যদি স্বামী নির্দেশ দেয়, তবেই এগুলো অপসারণ করা ওয়াজিব।

১৯০. আল-মুসান্নাফ, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং : ৫১০৪।

১৯১. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০৬-১০৭।

তবে দাঁতগুলোতে কোনো ধরনের বিশ্রীভাব থাকলে কিংবা ক্ষয়রোগের ফলে দাঁতে কোনো বিশ্রীতা দেখা দিলে তা দূর করার জন্য দাঁতগুলোর সোজা ও পাতলা করার একান্ত প্রয়োজন পড়লে, তবে কোনো দোষ নেই। কেননা এ সময় এ বিষয়টি চিকিৎসার পর্যায়ভুক্ত হবে এবং বিশ্রীতা দূরীকরণের আওতায় পড়বে।

দাঁত সোজা করা এবং সারিসারিভাবে সাজানো

প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁত সোজা করা এবং অত্যধিক ফাঁকা দাঁতকে কাছে নিয়ে আসা জায়েয। যেমন দাঁতে কোনোরূপ বিশ্রীতা থাকলে এবং তা দূর করার প্রয়োজন পড়লে, এমন করাতে কোনোরূপ অসুবিধা নেই। তদ্রূপ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অথবা দাঁতগুলো সোজা ও ঠিক করা ব্যতীত খাবার খেতে অসুবিধা হলে এরূপ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ (স) স্রেফ সৌন্দর্যের জন্যে ফাঁকা ফাঁকা দাঁতগুলোকে কাছে নিয়ে আসা থেকে নিষেধ করেছেন। এভাবে স্রেফ সৌন্দর্যের জন্য দাঁতগুলোকে ফাঁক করাও জায়েয নেই। কারণ, এগুলোও একপ্রকারের অনর্থক কাজ এবং আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন।

কৃত্রিম উপায়ে চেহারার রং পরিবর্তন করা

নারীদের জন্য সৌন্দর্য চর্চা করা কেবল বৈধই নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কাম্যও। তবে অবশ্যই তা শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে করতে হবে। বিশেষ করে স্বামীদের উদ্দেশ্যে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা অতিশয় পুণ্যের কাজ। এতে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের ভালোবাসা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তাই যে সব সৌন্দর্য-উপকরণ নারীদের চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তাদের চেহারার কোনো ক্ষতি সাধন করে না এবং এর ফলে চেহারার প্রকৃত রূপ চাপা পড়ে না, তা ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে যে সব সৌন্দর্য উপকরণ চেহারার ক্ষতি সাধন করে এবং যাতে চেহারার প্রকৃত রূপ চাপা পড়ে যায়, তা ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়।

এ কারণেই মেহেদি কিংবা ব্লাসিং পাউডার বা ক্রীম অথবা অন্য কোনো কসমেটিকসের সাহায্যে চেহারা, গাল ইত্যাদিকে কৃত্রিম উপায়ে এমনভাবে লাল, ফর্সা ও উজ্জ্বল করা জায়েয নয়, যাতে চেহারার আসল রূপই চাপা পড়ে যায়। এর ফলে অনেক সময় বিবাহের জন্য ইচ্ছুক ছেলে বা ছেলেপক্ষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তবে স্বামীদের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাদের অনুমতি বা ইচ্ছানুক্রমে স্ত্রীদের জন্য তা করতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম রাফিঈ (র) বলেন, "বিধবা মহিলাদের জন্য এরূপ করা হারাম। আর সধবা মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এরূপ করা হারাম।" যদি তার সম্মতি বা অনুমতিক্রমে এ রূপ করা হয়, তবে কারো কারো মতে জায়েয হলেও অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি না জায়েয। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة

"যে সব মহিলা কৃত্রিম উপায়ে চেহারা লাল করে কিংবা উজ্জ্বল করে এবং যারা এ কাজে সহায়তা করে, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।"[১৯২]

---

১৯২. মুসনাদ প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২৫৫৯৭।

মুখে ক্রীম ও পাউডার ব্যবহার

সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখে ক্রীম ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাতে মুখের কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকতে হবে। সাধারণত মুখমণ্ডলের ক্রীমে পারফিউম ছাড়াও কিছু জৈব রং যেমন এজোডাই, লেনোলিন এবং সংরক্ষক হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার করা হয়, এগুলো চেহারার জন্যে ক্ষতিকর। এ ধরনের ক্রীমের প্রতিক্রিয়ায় চামড়া জ্বালা করে ও এলার্জি হয়।[১৯৩] তাই মুখে ক্রীম ব্যবহার করার পূর্বে তার কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কি না- এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গে পাউডার ব্যবহার করার অনুমতি আছে। কোনো অসুবিধা নেই, যদি তাতে চেহারা বা শরীরের কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। কোনো পাউডারে কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা পরিহার করা উচিত। যতটুকু জানা যায়, পাউডারের মূল উপকরণ হচ্ছে ট্যালক। একজাতীয় সাদা ও নরম পাথরের নামই ট্যালক। এ কারণে এর নাম ট্যালকম পাউডার। অবশ্যই সাথে অন্যান্য উপাদানও মেশানো হয়।[১৯৪]

চোখে রঙিন লেন্স লাগানো

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকলে প্রয়োজনে চোখে লেন্স ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে, তা ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণ, তখন এটা অপচয় হিসেবে বিবেচ্য হবে। তদুপরি তা এক ধরনের প্রতারণামূলক আচরণ। এতে চোখের প্রকৃত আকৃতির পরিবর্তে কৃত্রিম আকৃতিই দৃশ্যমান হয়। ফলে অন্যকে এর দ্বারা প্রতারিত করা হয়ে থাকে।

অলংকার ব্যবহারে নাক ও কান ছিদ্র করা

অলঙ্কার পরার উদ্দেশ্যে মহিলাদের কান ছেদ করা জায়েয আছে।[১৯৫] বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলা সাহাবীগণ কানে বালা পরতেন। রাসূলুল্লাহ (স) এগুলো দেখে কোনো রূপ প্রতিবাদ করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহ (স) ঈদের দিন দু রাকাত নামায পড়লেন। এরপর হযরত বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মেয়েদের কাছে এসে তাদেরকে দান-খয়রাত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। এ সময় মহিলারা কানের বালাগুলো এক এক করে ফেলতে লাগল।"[১৯৬] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলা সাহাবীগণ কানে বালা পরতেন। যেহেতু ইসলাম তাদেরকে অলঙ্কার পরার অনুমতি দিয়েছে, তাই কানে অলঙ্কার পরার প্রয়োজনে যদি কান ছিদ্র করা হয়, তাও ইসলামে অনুমোদিত। এ কারণে একে শরীরের অঙ্গের বিকৃতি সাধন হিসেবেও গণ্য করা হয় না।

কানের মতো নাক ছিদ্র করা এবং তাতে দুল কিংবা নোলক পরাও জায়েয আছে। একে শরীরের অঙ্গের বিকৃতি সাধন হিসেবে গণ্য করা হবে না। শাফেয়ীগণ একে সুস্পষ্টভাবে জায়েয বলেছেন।[১৯৭]

---

১৯৩. ডা. নাজমুল আলম, প্রসাধনী, মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৬।

১৯৪. প্রাগুক্ত।

১৯৫. রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ২৭ খণ্ড, পৃ. ৮১; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

১৯৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

১৯৭. রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ২৭ খণ্ড, পৃ. ৮১।

চুল আঁচড়ানো ও বেনী করা

মেয়েদেরকে যেহেতু লম্বা চুল রাখতে হয়, তাই সেগুলো সর্বদা অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখা দরকার। এজন্য শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে যে তার সৌন্দর্য রক্ষা করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে তারা নিয়মিত চুল আঁচড়াবে এবং বেণী বাঁধবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মহিলাগণ চুল আঁচড়াতেন এবং আঁচড়ানো চুলগুলোকে নিয়ে সুন্দর করে তিনটি বেণী বাঁধতেন এবং বেণীগুলো মাথার পেছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও মেয়েদেরকে ঝুঁটি ও বেণী বাঁধার জন্য আদেশ করেছেন। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেয়ের চুলগুলোকে নিয়ে তিনটি বেণী বেঁধেছি।" ইবনু দাকীকিল ঈদ (র) বলেন, "মেয়েদের জন্যে চুল আঁচড়ানো ও বেণী বাঁধা মুস্তাহাব।" হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঋতুমতী অবস্থায় আমি মক্কা নগরীতে পৌঁছলাম। তাই আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিনি। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি আমাকে বললেন, انقضى رأسك وامتشطى - "মাথার এলোমেলো অবস্থাকে ভেঙ্গে আঁচড়িয়ে নাও।"[১৯৮] এ হাদীস থেকে জানা যায়, মেয়েদের জন্যে চুল আঁচড়ানো ও বেণী বাঁধা পছন্দনীয় কাজ।

সাধারণত এক দিন পর পর নিয়মিত চুল আঁচড়ানো মুস্তাহাব। কোনো প্রয়োজন ছাড়া প্রত্যহ এবং বারবার চুল আঁচড়ানো মাকরূহ। তাছাড়া মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানোও মুস্তাহাব।

বর্তমানে বিজাতীয় মহিলাদের দেখাদেখি অনেক মুসলিম মেয়েও মাথার চুলগুলো আঁচড়িয়ে মাথার উপর উঁচু করে বেঁধে রাখে কিংবা মাথার এক পার্শ্বে সিঁথি কেটে চুলগুলো নিয়ে পিঠের দিকে ছেড়ে দেয়। এ নিয়মগুলো যেহেতু বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে, কাজেই তাও ঘৃণ্য ও বর্জনীয়।

মেয়েদের জুলফি রাখা

মেয়েদের জন্যে জুলফি অর্থাৎ কানের পাশ থেকে গালের কিছুদূর পর্যন্ত চুল রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে তাদের চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

চুলে সিঁথি কাটা

মাথার চুলগুলোকে সামনে কিংবা পেছনে অথবা ডানে বা বামে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রকমের সিঁথি কাটা যায়। তবে সুন্নাত হলো মাথার সামনের দিকের ঠিক মাঝখান থেকে উপরের দিকে সিঁথি কাটা। এক পাশে সিঁথি কাটা ঠিক নয়। তদুপরি তা বিজাতীয় মহিলাদের অনুকরণ। কাজেই তা পরিহার করে চলা উচিত।[১৯৯]

মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন

ইসলামে সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জায় যেমন উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তেমনি এ বিষয়ে কৃত্রিমতা বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের চুল প্রতিপালন, চুলের যত্ন নেওয়া ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হাদীস নির্দেশিত ও সুন্নাতসম্মত নেক কর্ম। কিন্তু কৃত্রিম চুল সংযোজন করা নিষিদ্ধ।

---

১৯৮. সীহহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫, ২১১; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

১৯৯. ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত বিভিন্ন সহীহ সনদে আবূ হুরাইরা (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রা), আয়েশা (রা), আসমা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

"যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করে, যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করায়, যে মহিলা উল্কি আঁকে এবং যে মহিলা উল্কি কাঁটায় তাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।"[২০০]

মাথার চুল ছেঁটে ফেলা

মহিলাদের জন্যে মাথার চুল কাটা জায়েয নেই। কোনো নারী যদি তার মাথার চুল কাটে, তবে সে পাপী হবে এবং অভিশপ্ত হবে। তবে হজ্জের সময় ছোট করা ভিন্নকথা।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.

"মহিলাদের উপর মাথা মুণ্ডনের দায়িত্ব নেই; তাদের দায়িত্ব চুল ছোট করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২০১]

স্বামী অনুমতি দিলেও তা জায়েয হবে না।[২০২] হজ্জ ও উমরার সময় প্রত্যেক ঝুঁটি থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ চুল কেটে নেওয়া যবে। এজন্যে তারা আল্লাহর নিকট পুরস্কারও পাবে।

বর্তমান সমাজে অনেক মহিলা পুরুষদের মতো মাথার চারদিক থেকে এমনভাবে চুল ছেঁটে ফেলে, তাদের মাথা দেখলে মনে হবে যে, সেটা পুরুষেরই মাথা। এ ধরনের করা জঘন্য পাপ। তদুপরি চারদিক থেকে কিছু কিছু চুল ছেঁটে ফেলার পর মাথা যদিও মেয়েদের মাথার মতো দেখায়, তাও করা সমীচীন নয়।

নারীর মাথার চুল কাটার মধ্যে দুটি পাপ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে নারীর জন্যে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। পবিত্র হাদীসে এ সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্যে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় পাপ হচ্ছে বিজাতীয় মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা। নর-নারী নির্বিশেষে যে কোনো মুসলিমের পক্ষেই বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করা জায়েয নয়।

বিশেষ কোনো প্রয়োজনে যেমন মাথায় আঘাতের পর সেলাইয়ের জন্য অথবা অধিকহারে চুলপড়া বন্ধ করার জন্য (যদি চুল ছাঁটলে চুল পড়া বন্ধ হয়) বা অধিক চুলের কারণে কষ্ট পেলে প্রয়োজন অনুপাতে মাথার চুল ছেঁটে ফেলা জায়েয হবে। হযরত আবু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كان ازواج النبى ﷺ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة "রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ (রা) তাঁদের মাথার কিছু কিছু চুল তুলে নিতেন। ফলে তাঁ কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের মতো দেখাত।"[২০৩] কাযী ইয়ায (রা) বলেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর তাঁরা সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এবং চুল লম্বা করার প্রয়োজন না থাকা ও মাথার কষ্ট লাঘব করার জন্য এরূপ করেছিলেন। উক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, প্রয়োজনে মহিলাদের চুল হালকা করা জায়েয রয়েছে।

---

২০০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, ২২১৬।
২০১. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩।
২০২. রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, ২৭ খণ্ড, পৃ. ৩৩।
২০৩. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হায়য), হাদীস নং : ৪৮১।

মাথার চুল মুণ্ডন করা

মেয়েদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জায়েয নেই। عن علي ﷺ نهى رسول الله ﷺ ان تحلق المرأة رأسها "হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মেয়েদেরকে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন।"[২০৪]
পুরুষদের জন্যে যেমন দাড়ি আত্মপরিচয় ও সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি জুলফি ও লম্বা চুল হলো মেয়েদের জন্য আত্মপরিচয় ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে কোনো একান্ত প্রয়োজন পড়লে যেমন কারো মাথা যদি এভাবে আক্রান্ত হয় যে, তাকে সেলাই করার জন্য মুণ্ডিয়ে ফেলার দরকার হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।[২০৫]
ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হজ্জের মধ্যেও তাদের জন্যে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়েয নেই। যদি তাদের জন্য মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়েয হতো, তবে হজ্জের মধ্যে পুরুষদের মতো অবশ্যই তাদেরও মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্যে আদেশ করা হতো।

মাথার সাদা চুল উপড়ে ফেলা

বয়স কিংবা অন্য কোনো চুল সাদা হলে সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়েয নয়। এ বিধান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু এ বিষয়ে যে সব হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলোতে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তদুপরি এ হুকুমের ক্ষেত্রে নারীদের মুক্ত থাকার ব্যাপারেও কোনো দলিল পাওয়া যায় না, তাই পুরুষদের মতো নারীদের জন্যে সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়েয হবে না।

শুধু মধ্যভাগের চুলকে বেঁধে রাখা

অনেক মেয়েকে দেখা যায় যে, মাথার ওপর চুল বেঁধে ফুলিয়ে রাখে। যা দেখলে মনে হয় (পুরুষদের মতো) মাথায় যেন পাগড়ি বাঁধা হয়েছে। এটি জায়েয নয়। এ ধরনের চুল বাঁধাকে হাদীসে উটের পিঠের কুঁজোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

"আমার উম্মতের শেষের দিকে এমন সব নারী আসবে যারা বস্ত্রাবৃত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিবস্ত্র মনে হবে। আর তারা নিজেদের কু-কর্মকে অন্য লোকদের জানান দেবে, বুক টান করে পথে ঘাটে হেলে-দুলে চলবে এবং বুখত উটের কুঁজোর মতো সুউচ্চ হবে তাদের মাথা (অর্থাৎ চুলের খোপা)। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"[২০৬]
অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– العنوهن فإنهن ملعونات "তাদের অভিশাপ দাও। কেননা তারা অভিশপ্ত।"[২০৭]

চুলে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার

বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তাতে বাদামী, হলুদ ও লাল প্রভৃতি রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। এ হুকুম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য

---

২০৪. সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
২০৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
২০৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।
২০৭. মুসনাদ, হাদীস নং : ৬৭৮৬।

প্রযোজ্য। তবে কারো কারো মতে- স্বামীর অনুমতি বা ইচ্ছানুক্রমে হলে নারীদের জন্য সাজসজ্জা হিসেবে কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়েয। ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (র)-এর মতে, মেয়েদের জন্যে কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। এর মাধ্যমে তারা স্বামীদের উদ্দেশ্যে নিজেদের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারবে। ইমাম নববী (র) বলেন, স্বামীহীনা মহিলাদের জন্য কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করা হারাম। তবে স্বামীবিশিষ্টা মহিলারা যদি স্বামীর অনুমতিক্রমে কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করে, তবে তা জায়েয হবে।

চুলে মেহেদি ব্যবহার

সাদা চুলে মেহেদির খিযাব ব্যবহার করা পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও মুস্তাহাব।[২০৮]

সুগন্ধি ও সেন্ট ব্যবহার করা

যে সব জিনিস মানবমনে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছে। সুগন্ধিও যেহেতু এ ধরনের একটি জিনিস, তাই নারীরা কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ঘরোয়া পরিসরে যে কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করাতে তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তবে ঘরের বাইরে যেতে হলে তারা যে সুগন্ধি ব্যবহার করবে তা হবে এমন– যাতে রং আছে, কিন্তু গন্ধ নেই, যেমন যাফরান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لاريح له.

“সাবধান, পুরুষদের সুগন্ধ হচ্ছে এমন জিনিস যাতে গন্ধ আছে (রং নেই), আর মেয়েদের সুগন্ধি হচ্ছে যাতে রং আছে, গন্ধ নেই।”[২০৯]

বর্তমানে অনেক মহিলা চারদিক আলোড়িত করে তোলা সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাতায়াত করে, এটি জায়েয নয়। তা ছাড়া অন্য কোনো তীব্র সুগন্ধিযুক্ত জিনিস ব্যবহার করাও জায়েয নয়। ঝলসানো ও চাকচিক্যপূর্ণ পোশাকও এ পর্যায়ে পড়ে।

অবশ্য স্বামীর উদ্দেশ্যে কেবল চাকচিক্যপূর্ণ রং ব্যবহারই জায়েয নয়, তারও অধিক ঘরের মধ্যে থেকে তীব্র মনমাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয; বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ملعونة من عطلت نفسها على زوجها.

“যে মহিলা স্বামীর জন্য নিজেকে তৈরি করে না, সে অভিশপ্ত।”[২১০]

উল্লেখ্য যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আধুনিক পারফিউম শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটা এসেনশিয়াল ওয়েল ও সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগের মিশ্র। পারফিউম ফিক্সেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বালসাম, বেনজাইল বেনজয়েট, স্যালিসাইলেট ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহারের ফলে চামড়ায় একজিমা, ইরাইথোমা বা লাল-স্ফীতি, শোথ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হিসেবে চামড়ায় দেখা দেয় জটিল চর্মরোগ। পারফিউম ও ওডি কোলনের ৮ মেথোক্সিসোরালেন নামের রাসায়নিক উপাদানটি চামড়ার রং কালচে করে দেয়।[২১১]

---

২০৮. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১।

২০৯. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০; সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।

২১০. মাজমূউল ফাতওয়া, প্রাগুক্ত, ২৩ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

২১১. প্রসাধনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া

প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি (আতর, সেন্ট) ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য জায়েয নয়। অবশ্য কেবল মহিলাদের সমাবেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয, যদি পথিমধ্যে পুরুষদের আনাগোনা না থাকে অথবা পুরুষদের আনাগোনা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.

"যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগিয়ে বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করবে, সে ব্যভিচারিনী।"[২১২] দেবর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভাসুর-পুত, ফুফাত ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতিও গায়রে মাহরামও বেগানা। কাজেই তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে বা সুসজ্জিতা বেশে আসা-যাওয়া করা যাবে না।

ব্রেসিয়ার পরিধান করা

বক্ষ বন্ধী বা ব্রেসিয়ার পরিধান করা জায়েয। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে অনেক মহিলাকে দেখা যায় যে, তারা বুককে উঁচু করে রাখে। এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ, আবার অনেককে দেখা যায় যে, তারা নিজেদেরকে যুবতী কিংবা অবিবাহিতা হিসেবে প্রকাশ করার জন্য ফোম সংযোজিত ব্রেসিয়ার দ্বারা স্তনদুটিকে এমনভাবে বেঁধে রাখে, যাতে স্তনদুটি উঁচু ও সোজা দেখা যায়। এটাও অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। এমনটি করা হারাম।[২১৩] অবশ্য ঘরোয়া পরিসরে স্বামীর উদ্দেশ্যে এরূপ করাতে কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া কেউ যদি তা কোনো ব্যথা নিরাময়ের জন্য করে থাকে, তবে প্রয়োজন অনুপাতে তা জায়েয হবে।

হাতে-পায়ে মেহেদি ব্যবহার করা

মেয়েদের জন্য হাতে ও পায়ে মেহেদির ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। একদা জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-কে মেহেদির ব্যবহার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে আমি তা পছন্দ করি না। কারণ এর গন্ধ রাসূলুল্লাহ (স) অপছন্দ করতেন।[২১৪] বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের জন্য স্বামীদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার করা অতীব পছন্দনীয়। তাদের জন্য হাতে সর্বদা মেহেদী লাগিয়ে রাখা ভালো। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) কোনো মহিলাকে হাতে মেহেদি কিংবা খিযাবের চিহ্ন ছাড়া দেখতে পছন্দ করতেন না।"[২১৫] হাম্বলী ইমামগণের দৃষ্টিতে বিধবাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করাতেও কোনো দোষ নেই। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل.

"মহিলারা, তোমাদের (মেহেদীর) খিযাব ব্যবহার করা উচিত। কারণ, (মহিলাদের জন্যে পছন্দনীয় হলো) তারা তাদের স্বামীর মনস্তুষ্টি লাভের জন্য খিযাব ব্যবহার করবে। আর বিধবারাও খিযাব ব্যবহার করতে পারবে। এর

---

২১২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫; সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০, সুনান ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

২১৩. ফাতাওয়া রিয়াদ, প্রাগুক্ত, ১৪২২, পৃ. ১০৭।

২১৪. সুনান নাসায়ী, কিতাবুয যীনাত, হাদীস নং : ৫০০৩; সুনান আবু দাউদ, পৃ. ৫৭৪, তবে অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে, এমনকি ইহরাম অবস্থায়ও। (যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০)

২১৫. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।

সাহায্যে তারা বিয়ের জন্য নিজেদেরকে পেশ করবে।"[২১৬] অর্থাৎ, যেন লোকেরা তাদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসে। অবিবাহিত মহিলাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা অনুচিত। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে– তাদের জন্যে মেহেদী ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ, এটা এক প্রকারের সৌন্দর্য, যা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্যে করা হয়ে থাকে। কাজেই অবিবাহিতা মহিলাদের জন্যে এ সাজসজ্জার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও এতে তাদের জন্যে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। যদি তারা মেহেদী লাগায়, তবে তা পরপুরুষদের কাছে প্রকাশ করবে না; বরং ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মধ্যে সীমিত রাখবে। উল্লেখ্য যে, মহিলারা কোনো ডিজাইন ও নকশা অঙ্কন করা ছাড়াই হাতে মেহেদি ব্যবহার করবে। হযরত উমর (রা)-এর মতে মেহেদি দ্বারা হাতে নকশা আঁকা ও সাজসজ্জা করা জায়েয নয়। তবে ইমাম মালেক (র)-এর মতে এরূপ করাতে কোনো দোষ নেই। এছাড়া মেহেদীর খিযাব যাতে বাইরে প্রদর্শিত না হয়, তাই হাতে মণিবন্ধের ভেতরে বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ তালুদেশ পর্যন্ত এবং পায়ের পাতায় টাখনু পর্যন্ত মেহেদির ব্যবহার সীমিত রাখা উচিত। এর বাইরে ব্যবহার করা উচিত নয়।[২১৭]

বিবাহিতা মহিলাদের জন্য ঋতু ও পবিত্র তথা সর্বাবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করা জায়েয। মেহেদির মাধ্যমে ত্বকের ওপর কেবল রঙের প্রভাবটাই পড়ে। এতে ত্বকের ভেতরে পানি পৌঁছতে কোনো সমস্যা হয় না। পানি দিয়ে প্রথম বারেই ধৌত করার সময় তা চলে যায়। কেবল তার রঙের নিদর্শনগুলোই অবশিষ্ট থাকে।

মেয়েদের নখগুলোতে মেহেদির ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) উৎসাহিত করেছেন। একবার জনৈকা মেয়েলোক পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একখানা চিঠি পেশ করল। রাসূলুল্লাহ (স) ঐ চিঠিটি না ধরে বলে ওঠলেন, বুঝতে পারলাম না, একি কোনো পুরুষের হাত, না কোনো মেয়েলোকের হাত? মেয়েলোকটি পর্দার আড়ালে থেকে বললেন, মেয়েলোকের হাত। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন–

لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء.

"তুমি যদি মেয়েলোকই হতে, তবে তোমার হাতের নখগুলোতে অবশ্যই মেহেদির রং লাগাতে।"[২১৮]

পায়ে রং ব্যবহার করা

বিবাহিতা মহিলাদের জন্য স্বামীদের মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে পায়ে রং লাগানো ভালো কাজ। তবে অবিবাহিতা মহিলাদের জন্যে তা করা অনুচিত। কারণ, এটা এক প্রকারের সৌন্দর্য, যা স্বামীর মনতুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। তাই অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য এ সাজসজ্জার দরকার নেই। তদুপরি এতে তাদের জন্যে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। যদি তারা পায়ে রং লাগায়, তবে তা পরপুরুষদের কাছে প্রকাশ করবে না; বরং ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মধ্যে সীমিত রাখবে। টাখনুর ওপরে রং লাগানো থেকেও বিরত থাকা দরকার, যাতে বাইরে প্রদর্শিত না হয়।

নখপালিশ ব্যবহার

নখপালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া এর ব্যবহারে নখের ওপরে আবরণ বা আস্তরণ জমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় ফরয গোসল ও অযু জায়েয হবে না। আলেমগণের মতে, এগুলো লাগানো হলে অযু-গোসলের

---

২১৬. মুহাম্মদ ইবনু মুফলিহ, আল-ফুরূ, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩।

২১৭. আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন আন নববী, আল-মাজমু, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০১০), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২১; যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

২১৮. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪, সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

সময় যদি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং নখে সঠিকভাবে পানি পৌঁছায়, তা হলে গোসল ও অযুর ক্ষতির হওয়ার আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া মহিলাদের মাসিক ও নিফাসের সময় যখন তারা নামায পড়ে না, তখন তাদের জন্য তা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

তা ছাড়া নখপালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে নিকেল। ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।[২১৯] তাই নেইল পালিশ ব্যবহারের আগে ডাক্তারের কাছে জেনে নেয়া উচিত, তা ক্ষতিকর কি না। যদি ক্ষতিকর হয়, তবে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

পায়ে উঁচু হিল পরা

পায়ে উঁচু হিল পরে চলাফেরা করা উচিত নয়। কারণ, এতে যে কোনো সময় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।রাস্তা ঘাটে চলাফেরার সময় কোনো কোনো মেয়েকে এভাবে পড়ে যেতে দেখা যায়। শরীয়তে সাধারণভাবে যে কোনো আশঙ্কা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করো না।"[২২০]

তদুপরি তা শরীরের গঠন ও নিতম্বকে বড় করে প্রকাশ করে, যা এক ধরনের প্রতারণামূলক আচরণ। তা ছাড়া এতে কিছুটা সৌন্দর্যও প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা পর পুরুষদের দেখানো শরীয়তে জায়েয নেই।[২২১]

লম্বা নখ রাখা

নখ লম্বা রাখা ইসলাম বিরোধী, লম্বা নখ রাখাকে বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অপর দিকে এটা মারাত্মক নোংরামীও। তদুপরি লম্বা নখ জীবাণু বহন করে। নিয়মিত নখ কেটে পরিচ্ছন্ন রাখা সুরুচির পরিচয় বহন করে। গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তনের সময়সীমা ও দিন সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা হাদীসে পাওয়া যায়। এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন–

وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.

"গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও নাভির নিম্নের চুল মুণ্ডন করার বিষয়ে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, আমরা এগুলো ৪০ (চল্লিশ) দিনের বেশি পরিত্যাগ করব না।"[২২২]

এ হাদীসে সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বনিম্ন বা উত্তম কোনো সময় আছে কি? এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে সহীহ সনদে কিছু বর্ণিত হয়নি। বস্তুত ৪০ দিনের মধ্যে প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে এ বিষয়ক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করলেই মূল ইবাদত পালিত হবে। বিশেষ কোনো দিন বা সময়ের বিশেষ কোনো

২১৯. প্রসাধনী, পৃ. ৪৬।

২২০. সূরা আল-বাকারা : ১৯৫।

২২১. ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

২২২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

ফযীলত নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, তিনি শুক্রবারে গোঁফ কাটতেন ও আনুষঙ্গিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতেন। আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

إن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.

“রাসূলুল্লাহ (স) শুক্রবার সালাতুল জুমু'আর জন্য বের হওয়ার আগে নিজ নখ কাটতেন এবং নিজ গোঁফ ছাটতেন।”[২২৩]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী মুহাম্মদ আল-বাকির (১১৪ হি) বলেন,

كان رسول الله ﷺ يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة.

“রাসূলুল্লাহ (স) শুক্রবারে তাঁর তাঁর গোঁফ ছাটতে এবং নখ কাটতে পছন্দ করতেন।”[২২৪]

ভ্রূ ফ্লাক ও উল্কি আঁকা

উল্কি বলতে শরীরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূচবিদ্ধ করে রচিত চিত্রকে বুঝানো হয়েছে। শরীরের যে কোনো জায়গায় উল্কি আঁকা জায়েয নেই। ভ্রূ ফ্লাক কিংবা পাপড়ি তুলে ফেলাও জায়েয নেই। তদ্রূপ শরীরে কৃত্রিম তিল বসানোও জায়েয নেই।[২২৫] যারা শরীরে উল্কি আঁকে এবং আঁকতে দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) লা'নত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

لعن الله الواشمات والموتشمات ... والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

“যে মহিলা উল্কি আঁকে, আর যে এ কাজে সাহায্য করে...., আর এভাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।”[২২৬] এ হাদীস থেকে জানা যায়, শরীরে যে কোনো ধরনের উল্কি আঁকা হারাম। চাই পূর্ণাঙ্গ উল্কি হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ। যে কেউ উল্কি এঁকে থাকলে, তা দ্রূত অপসারণ করে আল্লাহর কাছে তার তাওবা করা উচিত। যদি অপসারণ করতে গেলে কোনো মারাত্মক ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তা হলে অতীত কর্মের জন্যে শুধু তাওবা করলেই চলবে। আর উল্কি অপসারণ করার পরও যদি কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

স্বর্ণ-রৌপ্যের কাপড় ব্যবহার

মহিলাদের জন্যে স্বর্ণের কিংবা রৌপ্যের কাপড় অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্য-খচিত যে কোনো পোশাক পরা জায়েয আছে। তা ছাড়া যে সব বস্ত্র বা বস্তু পোশাকের কাজ দেয় (যেমন বোতাম, বিছানার চাদর ও বালিশ ইত্যাদি) তা স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের হলেও ব্যবহার করা যাবে তবে উত্তম হলো, এগুলো পরিহার করে চলা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি বস্ত্র মহিলাদের পরার ব্যাপারে ইমামগণের দুটি মত বর্ণনা করেছেন। এক. স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদির মতো স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি কাপড় পরাও তাদের জন্য জায়েয। এটি অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত। দুই. পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাপড় পরা হারাম। কারণ এতে অর্থকড়ির অপচয় হয়। তা দ্বারা এতে অহংকার প্রকাশ পায়।[২২৭]

---

২২৩. আস-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪।

২২৪. প্রাগুক্ত।

২২৫. উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মতো কোনো পুরুষও যদি উল্কি আঁকে, তার বেলায়ও হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলাদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, তারাই সচরাচর সৌন্দর্যের জন্য এরূপ করে থাকে।

২২৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৫, ৮৭৮ ও সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।

২২৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ সেবায় মুসলিম নারীর বহুমুখী অবস্থান, দায়িত্ব-কর্তব্য ও অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্নরূপে নারী

সকল মানুষেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সুখ, শান্তি, নিশ্চিন্ততা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। নর এ সম্পদ লাভ করতে পারে একমাত্র নারীর নিকট হতে। আর নারী তা পেতে পারে কেবলমাত্র নরের কাছ থেকে। এ কারণেই নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি অতীব গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। কেননা প্রত্যেক নারীর মধ্যেই পুরুষের জন্যে অপরিসীম ভালোবাসা, আবেগ উদ্বেলিত প্রেম ও প্রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়ে আছে। তেমনি আছে প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে স্ত্রীর জন্য। এটি মহান আল্লাহর এমন এক মহামূল্যবান নিয়ামত যার তুলনা এ বিশ্ব প্রকৃতির বুকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় না।

মানুষের জন্য এ দুনিয়া এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসের জন্য কর্মোদ্যম, তৎপরতা এবং একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ করে, আবার কখনো দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ফলে তার প্রয়োজন হচ্ছে সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করার জন্যে একজন অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথির। সে যেন তার আনন্দে আনন্দ লাভ করে আর তার দুঃখ ও বিপদেও যেন হয় সমান অংশীদার। নর ও নারী উভয়েই এ দিক দিয়ে সমানভাবে ভুক্তভোগী। প্রত্যেকেরই সঙ্গী ও সাথির প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে নারীই হতে পারে পুরুষের সত্যিকার বন্ধু ও খাঁটি জীবন-সঙ্গিনী। আর পুরুষ হতে পারে নারীর প্রকৃত সহযাত্রী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও পরম সান্ত্বনা প্রদানকারী আশ্রয়স্থল। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে।

ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয় যে, জীবনের সব রকমের সংগ্রাম-সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে এবং উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। জীবনের দুর্বহ বোঝা উভয়েই একত্রে বহন করেছে। নর-নারী উভয়ের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই সমাজ, সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারে সর্বকালেই নারী ও পুরুষের যৌথ চেষ্টা ও তৎপরতার কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নারীকে বাদ দিয়ে কোনোদিনই কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোনো জাতি বা আন্দোলনই নারী পুরুষ কাউকেই উপেক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেন−

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক বন্ধু। তারা ভালো ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয়, মন্দ ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলে। আল্লাহ অবশ্যই এদেরকে রহমত দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞানী।"[১]

উল্লেখ্য যে, ন্যায়নীতি ও শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে নারী-পুরুষ যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে তদ্রূপ এর বিপরীত হওয়াটাও অসম্ভব নয়। আর সে জন্য তাদের ভ্রান্ত নীতি ও পুরুষরাই প্রধানত দায়ী বলে সাব্যস্ত হলেও সত্য-মিথ্যার তারতম্য করার জ্ঞান থাকার কারণে নারীকেও সমান অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অন্যের সহযোগী। তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজ করতে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণের কাজ থেকে তাদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই অবাধ্য।"[২]

সাধারণভাবে নর ও নারী তথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক শান্তি, প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়ার সম্পর্ক। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"তাঁর আরো একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পেতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (র) বলেন–

اى جعل بينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وترحما من غير ان يكون بينكم مسابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة او رحم-

"তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা তথা বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা ও দরদ-সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল কোনো পরিচয়। আর না ছিল কোনো আত্মীয়তা অথবা রক্তের সম্পর্ক।"[৪]

নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ সর্ম্পক থাকবে। যেমন শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

---

১. সূরা আত তওবা : ৭১।
২. সূরা আত তাওবা : ৬৭।
৩. সূরা আর রূম : ২১।
৪. রূহুল মায়ানী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১।

সমাজে বিভিন্নরূপে নারী

নর-নারী নিয়েই পৃথিবী সৃষ্টি। এ নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যথা– নারী কন্যা রূপে, বোন রূপে, মা রূপে, স্ত্রী রূপে জন্ম নেয়। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

কন্যারূপে নারীর মর্যাদা

জাহেলী যুগে আরব সমাজে বলতে গেলে কন্যাসন্তানের কোনো মূল্যই ছিল না। কন্যা সন্তানকে জঘন্যভাবে ঘৃণা করা হতো। তাকে জীবিত কবর দেওয়া হতো। স্বয়ং পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে চরম অপমানজনক মনে করত। কুরআন মাজীদে কন্যাসন্তানের প্রতি অন্যায় অবিচারের চিত্র এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে–

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"কাউকে যখন তার কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদ দেওয়া হতো, তখন অপমানে তার মুখ কালো হয়ে যেত। এ সুখবরের লজ্জায় সমাজের লোকদের থেকে সে মুখ লুকিয়ে রাখত। আর মনে মনে চিন্তা করত এ অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে, না তাকে মাটির নীতে পুঁতে ফেলবে। কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত!"[৫]

কন্যা-সন্তানকে হত্যার এ জঘন্য প্রথার প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

"তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের বিশেষত কন্যাসন্তানদের হত্যা করো না। তাদের এবং তোমাদের পানাহার আমিই দিয়ে থাকি। জেনে রাখ যে, সন্তানহত্যা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য অপরাধ।"[৬]

ইসলাম মানবতাবিরোধী এ কাজকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম কন্যাসন্তানকে পুত্র সন্তানের মতোই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কন্যাসন্তানকে জীবিত প্রোথিত করলে কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, তাও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে–

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

"জীবন্ত প্রোথিত কন্যাসন্তানকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[৭]

রাসূলে কারীম (স) বলেছেন–

ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنع وهات ووأد البنات.

"মায়ের অবাধ্যতা করা, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করাকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[৮]

---

৫. সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯।
৬. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১।
৭. সূরা আত তাকভীর : ৮-৯।
৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৪; Jamal A. Badwi, Woman in Islam, (London : Islamic Council of Europe, 1976), P. 131-145.

من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوثر ولده عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة-

"যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান হবে, সে যদি তাকে জীবিত প্রোথিত না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ না করে এবং নিজের পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৯]

من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة-

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করেছে, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়েছে, বিবাহ দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছে, তার জন্যে জান্নাত নিশ্চিত হয়ে গেছে।"[১০]

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وضم اصباعيه-

"যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যাকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আগমন করবে। এরপর তিনি তাঁর দুটি অঙ্গুলি একত্রিত করে দেখালেন।"[১১]

আরবের জাহেলি সমাজে কন্যাসন্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হতো। তাকে পিতার মীরাস লাভের অধিকার দেওয়া হতো না। মীরাস দেওয়া হতো পুত্র সন্তানকে যারা যুদ্ধ করতো।

কিন্তু ইসলাম এই অমানবিক রীতিকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদে কন্যাকেও পুত্রদের মতই মীরাসের অংশীদার করা হয়েছে। যদিও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দায়-দায়িত্ব কম বলে তাদের অংশ বাহ্যত অর্ধেক রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে অধিক। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষ দু'জন মেয়েলোকের সমান অংশ পাবে। কেবল মেয়ে সন্তান যদি দু'জন বা ততোধিক হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একজন কন্যাসন্তান হয়, তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।"[১২]

আলোচ্য আয়াতে মেয়েদেরকেও ছেলেদের সাথে সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাধারণ লোক এ আইনকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বলে দিল যে, মেয়েরা তো যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে না। তাদের উক্ত মনোভাবের প্রতিবাদ করে কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে কন্যা সন্তানকে বিয়ের পূর্বে এমন পরিমাণ মীরাস লাভের অধিকার দেয়া হয়েছে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে।

পিতা জীবিত থাকতে ছেলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন-পালন করা যেমন পিতার কর্তব্য। মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্যেও পিতার অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। এছাড়াও ছেলে বড় হলে পিতা তাকে কামাই-রোজগার করার জন্যে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা করতে পারে না।

---

৯. আল মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২১।
১০. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।
১১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০; Arthur Zefri, The Family in Islam, (New York : Harfar and Row, 1959), P. 201-238.
১২. সূরা আন নিসা : ১১।

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন–

من ابتلى من هذه البنات شيأ فاحسن اليهن كن له سترا من النار-

"আল্লাহ যদি কন্যাসন্তানদের মাধ্যমে কাউকে কোনো রকম পরীক্ষায় ফেলেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাহলে ঐসব কন্যাসন্তান তার জন্যে দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।"[১৩]

নবী করীম (স) বলেছেন–

الا ادلك على افضل الصدقة ابنتك مردودة اليك وليس لها كاسب غيرك -

"আমি কি তোমাকে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সদকার কথা বলব না? তা হলো তোমার ঐ কন্যা, যে বিধবা হওয়ার কারণে কিংবা তালাক দেয়ার কারণে তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার জন্যে উপার্জনকারী বা দায়িত্ব গ্রহণকারী আর কেউ নেই।"[১৪]

উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা। হযরত জাবের (রা)-এর পিতা তাকে বললেন, পুত্র! হয়তো এই যুদ্ধেই আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। জীবনের এই বিদায়কালে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি, তুমি তাদের প্রতি সদাচরণ করবে।

এরপর হযরত জাবের (রা) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও শুধু তাঁর বোনদের দেখাশোনার জন্যে একজন বয়স্কা বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেন। একবার নবী করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? জবাবে তিনি বললেন–

يا رسول الله ان ابى قتل يوم احد وترك تسع بنات كن لى تسع اخوات فكرهت ان اجمع اليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن- قال رسول ﷺ اصبت-

"হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তিনি নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাদের দেখাশোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি তাদের মতো একজন অনভিজ্ঞ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। তাই এমন একজন নারীকে পছন্দ করেছি, যে তাদের চুল চিরুনি করে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। নবী করীম (স) বললেন, তুমি যথার্থ কাজ করেছ।"[১৫]

আরো একটি ঘটনা। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাতের পর তিন ব্যক্তি তাঁর মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবিদার হলেন।

হযরত আলী (রা) দাবি করলেন যে, সে আমার চাচাতো বোন। সুতরাং তাকে প্রতিপালনের জন্যে আমি অগ্রগণ্য।

হযরত জাফর (রা) দাবি করলেন যে, আমি আলী (রা)-এর চেয়ে তাকে লালন-পালনের জন্যে অধিক হকদার। কেননা, সে আমার চাচাতো বোন এবং আমার স্ত্রী তার খালা। অতএব দুটি কারণে তার লালন-পালনের দায়িত্ব আমারই হওয়া উচিত।

---

১৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৭।
১৪. সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০৯-১০।
১৫. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০৩।

হযরত যায়েদ (রা) দাবি করে বসলেন যে, আমি একজন আনসার আর হযরত হামযা (রা) ছিলেন একজন মুহাজির। নবী করীম (স) আমাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। সুতরাং মুহাজির ভাইয়ের কন্যার প্রতিপালনের অধিকার আমার চেয়ে আর কার বেশি থাকতে পারে?[১৬]

দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম কন্যাসন্তানদের কত ভালোবাসতেন। ইসলাম পরবর্তী জীবনে তাদের মন মাসনিকতায় কতইনা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ হলো–

কারো তত্ত্বাবধানে যদি কোনো ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ে থাকে এবং সে যদি তাকে স্নেহ, মায়া-মমতা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ করবে। রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন–

من احسن الى يتيمة او يتيم عنده كنت انا وهو فى الجنة كهاتين وقرن بين اصبعيه -

"যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতীম মেয়ে অথবা ছেলেকে তার কাছে রেখে তার প্রতি সদয় ব্যবহার করে, আমি ও সেই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে এভাবে পাশাপাশি আবস্থান করব। এ কথা বলে নবী (স) তাঁর দুটি অঙ্গুলি মিলিত করে দেখালেন।"[১৭]

রাসূলে কারীম (স) আরো ইরশাদ করেছেন–

انا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة و اوماء يزيد بن زريد بن زريع الى الوسطى والسبابة امرأة امت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا او ماتوا -

"আমি ও বিবর্ণ চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামতের দিন এই দুটি অঙ্গুলির ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব, যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রূপবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে এবং সে স্বামীর ঔরসজাত ইয়াতীম সন্তানদের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। (এই হাদীস বর্ণনা করে ইয়াযীদ ইবনে যুরাই (রা) মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।)"[১৮]

স্ত্রী বা সহধর্মিনীরূপে নারী

মহান আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন–

ومن كل شيء خلقنا زوجين.

"সবকিছুই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[১৯] এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন–

---

১৬. নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭; আল মারআতু বায়নাল ফিকহ ওয়াল কানূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১৭. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩; মুহাম্মদ ইবন আলী আবু আব্দুল্লাহ আল হাকীম, নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল, (বৈরুত : দারুল মিল, ১৯৯২), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।

১৮. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; Muhammad Shabbir Khan, Status of Woman in Islam, New Delhi : A. P. H. Publishing Corporation. 1996, P.75.

১৯. সূরা আয যারিয়াত : ৪৯।

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ.

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া এবং চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য জোড়া নির্ধারণ করেছেন। এই পদ্ধতিতেই তিনি তোমাদের সৃষ্টি করে থাকেন।[২০]

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন

বিয়ে নামক নিয়মের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে একটি দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ বন্ধনের মাধ্যমে তারা পরস্পর জীবন অতিবাহিত করে থাকে। একের প্রতি অন্যের মায়া-মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মাহন আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরেকটি হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[২১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (র.) বলেন–

جعل بينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وتراحما من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم.

"তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ তায়ালা) শরীয়তের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা ও দরদ-সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল কোনো পরিচয় আর না ছিল কোনো আত্মীয়তা অথবা রক্তের সম্পর্ক।"[২২]

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাকস্বরূপ

মহান আল্লাহ বলেন– هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।"[২৩]

নারী-পুরুষের এ একত্ব ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেন–

هن لكم بمنزلة الثوب و يفضي كل واحد منكم إلى صاحبه ويستتر به ويسكن اليه.

অর্থাৎ, স্ত্রীরা পুরুষদের পোশাকস্বরূপ, তাদের প্রত্যেকেই তার সাথির সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ঢাকতে পারে এবং শান্তি লাভ করতে পারে।[২৪]

---

২০. সূরা আশ শূরা : ১১।
২১. সূরা আর রূম : ২১।
২২. রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
২৩. সূরা আল বাকারা : ১৮৭।
২৪. ইবনুল আরাবী, আহকাম আল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

ইবনুল আরাবী স্বামী-স্ত্রীর স্বীয় চারিত্রিক পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন–

أن كل واحد منكم متعفف بصاحبه مستتر به عما لا يحل له من التعرى مع غيره.

"স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই একে অপরের সাহায্যে স্বীয় চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে। স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সামনে বিবস্ত্র হওয়া বৈধ নয় বলে এ অসুবিধা থেকেও তার সাহায্যেই রেহাই পেতে পারে।"[২৫]

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (র) বলেন–

جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجته أن يظهر منهما سوء كما أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوأة.

"এখানে 'লেবাস' বলতে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে আর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে উদ্দেশ করা হয়েছে। কেননা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই একে অপরের জন্য পোশাকতুল্য। এরা কেউই কারো দোষ জাহির হতে দেয় না। যেমন, পোশাক লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয় না।"[২৬]

প্রকৃতপক্ষে নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। কেননা, এ জন্য প্রকৃতিনিহিত প্রবৃত্তি ও যৌনশক্তিকে দমন করতে হবে। এটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে লোক পাশবতার নিম্নতম স্তরে নেমে যাবে।

নর-নারী যেন একই বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দু'টি শাখা। এ মর্মে রাসূলে কারীম (স) বলেন– إنما النساء شقائق الرجال "নিশ্চয় নারীরা পুরুষদের অর্ধাংশ"।[২৭] ইসলামপূর্ব যুগে আরবসমাজে স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা, অপমান এবং অসম্মানের গ্লানি বহন করতে হতো। স্বামীদের নিকট তারা যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার পেত না। তাদের হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী হিসেবে জীবনযাপন করতে হতো। তাদের সঙ্গে দাসীর মতো ব্যবহার করা হতো।

ইসলাম নারীদের এ অপমান দূর করে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। মৌলিক অধিকারে তাদের পুরুষদের সমান অংশীদার করা হয়েছে।

অন্যকথায়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। মৌল-অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কম নয়, কেউ বেশিও নয়। তদানীন্তন আরবসমাজে স্ত্রীদের ওপর নানাভাবে অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন চালানো হতো। কোন কোন স্বামী স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিত। স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদাও দিত না, আবার তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগও দিত না। বরং এভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেয়া ধনসম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত এবং এজন্য তারা নানা কৌশল অবলম্বন করত। এ নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো–

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.

"তোমরা তাদের (মোহরানাস্বরূপ) যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের আটকে রেখো না।"[২৮]

---

২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, পৃ. ৫৩৪।
২৭. আলা উদ্দীন আলী আল মুত্তাকী আল হিন্দী, কানযুল উম্মাল, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৯৮১), ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪০৮।
২৮. সূরা আন নিসা : ১৯।

কোনো কোনো স্বামী বিনা কারণে স্ত্রীকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত। তাকে তালাক দিত, আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়ে আনত। পুনরায় তালাক দিত, আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে বারবার তালাক দিত এবং বারবার ফিরিয়ে আনত। এতে অসহায় স্ত্রী স্বামীর কাছে দাম্পত্যজীবনের সুখ লাভ করতে পারত না এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করারও সুযোগ পেত না। নারীদের এ দুর্বিষহ যাতনা দূর করার জন্য কুরআন মাজীদের নির্দেশ হলো–

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.

"তোমরা স্ত্রীদের কষ্ট দেয়ার জন্য আটকে রেখো না, তাতে তোমাদের সীমালংঘন করা হবে। যে তা করবে সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে। আল্লাহর বিধানসমূহের সঙ্গে পরিহাসমূলক আচরণ করো না।" [২৯]

সে যুগে স্ত্রীদের ঘরের অন্যান্য মাল-সামানের মতো অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরও অন্যান্য পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো। এ প্রথা প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। নারীত্বের এরূপ অবমাননার মূলোৎপাটন করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا.

"হে ঈমানদারগণ, জোর করে নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া (উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের পেতে চাওয়া) তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"[৩০]

সেকালে আরবসমাজে স্ত্রীরা বড়ই অসহায় ছিল। স্বামীর সম্পদে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও স্ত্রী কোনো অংশ থাকত না। বিধবাদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য পাক কুরআনে ঘোষণা করা হলো–

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.

"আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তোমাদের সন্তান থাকলে তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে।"[৩১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

والله انا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم.

"আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহেলি-যুগে আমরা মেয়েলোকদের কিছুই মনে করতাম না। পরে আল্লাহ যখন তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ওহী নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন আমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো।"[৩২]

---

২৯. সূরা আল বাকারা : ২৩১।
৩০. সূরা আন নিসা : ১৯।
৩১. সূরা আন নিসা : ১২।
৩২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

স্ত্রীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

"সমগ্র পৃথিবীই সম্পদস্বরূপ। তবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।"[৩৩]

স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য মহান আল্লাহ কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন– وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. "তাদের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে বসবাস করো।"[৩৪]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, আলোচিত ধর্মগুলোর কোনো একটিতেও নারী হিসেবে সহধর্মিণীর কোনো মর্যাদা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে নারী যে একটি প্রাণী, তার যে প্রাণ আছে এ কথাটিও স্বীকার করা হতো না। তাকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের ন্যায় নির্জীব পদার্থ বলে গণ্য করা হতো। নারীজাতির অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। শিক্ষাদীক্ষা এবং সর্বপ্রকার স্বাধিকার থেকে তারা চিরবঞ্চিত ছিল। একমাত্র ইসলামই নারী জাতিকে তাদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলামের পরিবার-ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীই প্রধান নিয়ামক। তাদের সম্মিলনে এ ব্যবস্থা বাস্তবে রূপ পেয়ে থাকে। এর অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কিছু কর্তব্য নির্দেশ করেছে। পাশাপাশি নির্ধারণ করে দিয়েছে তাদের পারস্পরিক অধিকার। এ কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন এবং অধিকারগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আদায় করার ওপর পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি, স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে।

ক. স্বামীর কর্তব্য বা সহধর্মিণীর অধিকার

মোহরানা আদায় করা : ইসলামী বিবাহরীতিতে মোহরানা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এটি স্ত্রীর ন্যায়সংগত ও আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার। সে-জন্য তার প্রতি স্বামীর প্রথম কর্তব্য হলো, মোহরানা আদায় করা। স্ত্রীর মর্যাদা ও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামী মোহরানা নির্ধারণ করবেন এবং স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আদায় করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"নারীদের সানন্দে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। তবে তারা যদি খুশিমনে তার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে (ভোগ করতে) পার।"[৩৫]

মহরের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন–

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

"(বিবাহের ক্ষেত্রে) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এই যে, তোমরা মহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা তাদের লজ্জাস্থানের বৈধতা লাভ করবে।"[৩৬]

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।
৩৪. সূরা আন নিসা : ১৯।
৩৫. সূরা আন নিসা : ৪।
৩৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

সাধ্যমতো ব্যয় নির্বাহ করা : বিয়ে করার পর স্ত্রীর সব খরচ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ সরবরাহ করা স্বামীর কর্তব্য। এক্ষেত্রে স্বামী নিজের সাধ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার সমন্বয় করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

"বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত (সংকুচিত) করা হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তা থেকে ব্যয় করবে।"[৩৭]

খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান করা : স্ত্রীর খাবারের যোগান দেয়া এবং তার মর্যাদা অনুযায়ী পোশাক সরবরাহ করার দায়িত্ব স্বামীর। এক্ষেত্রেও স্বামী নিজের সাধ্যাতীত কিছু করতে যাবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت.

"যখন তুমি খাবে, স্ত্রীকেও খাওয়াবে এবং যখন তুমি পোশাক পরবে, তখন তাকেও পরাবে।" [৩৮]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (স) ঘোষণা করেছিলেন–

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتمو هن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

"স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, কেননা আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ। আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য-অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের ওপর অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।" [৩৯]

বাসস্থানের ব্যবস্থা করা : স্বামী যেভাবে থাকেন স্ত্রীর জন্য সেরকম বসবাসের ব্যবস্থা করবেন। তারা আলাদা থাকবেন না। একত্রে বসবাস করবেন। বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর নিরাপত্তার দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ.

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে-রকম বাসস্থানে থাক, তাদের জন্যও তেমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে।"[৪০]

সদাচরণ করা : স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে। এজন্য স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর নৈতিক এবং মানবিক দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

"তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সংগত ও সুন্দর আচরণ করো। তাদের যদি তোমরা অপছন্দ কর, তাহলে তোমরা তো অপছন্দ করবে এমন কিছু যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন কল্যাণ রেখেছেন।"[৪১]

---

৩৭. সূরা আত তালাক : ৭।
৩৮. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
৩৯. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।
৪০. সূরা আত তালাক : ৬।
৪১. সূরা আন নিসা : ১৯।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসেমী (র) বলেন–

صاحبوهن بالإنصاف فى الفعل والاجمال فى القول حتى لاتكونوا سبب النشوز أو سوء الخلق. فلا يحل لكم حينئذ.

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে কাজকর্মে ন্যায়নীতি বজায় রাখো। আর সুন্দর সুন্দর কথা বলে একত্রে বসবাস কর। তোমরা তাদের কাছে অভদ্র আচরণ ও অবাধ্যতার কারণ হয়ো না। এমনটি বৈধ হবে না।"[৪২]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم.

"যাদের চরিত্র সবচেয়ে উত্তম তারাই হলো পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম মানুষ যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত।" [৪৩]

অধিকারের সমতা : পরিবারের সবার ওপর, সব কিছুর ওপর স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের অধিকার আল্লাহ তায়ালাকর্তৃক প্রদত্ত। স্বামী তার স্ত্রীর এ অধিকার কোনোভাবে খর্ব করবেন না। পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"নারীর ওপর যেমন (পুরুষের) অধিকার আছে তেমনি (পুরুষের ওপর) নারীদেরও ন্যায়সংগত অধিকার আছে।"[৪৪]

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করা : যুক্তিযুক্ত কারণে কারো যদি একাধিক বিয়ে করতে হয়, তাহলে সে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। এ জন্য শর্ত হলো, সব স্ত্রীর মধ্যে অবশ্যই অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

"নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে) সুবিচার করতে না পারার আশংকা কর, তাহলে মাত্র এক জনকে বিয়ে করবে।"[৪৫]

মালিকানার স্বাধীনতা দেয়া : স্বামী যেমন উত্তরাধিকার ও উপার্জনসূত্রে সম্পদের মালিক হতে পারেন, স্ত্রীরও তেমনি সম্পদের মালিক হওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর এ মালিকানার ক্ষেত্রে কোনো হস্ত ক্ষেপ না করা। আল্লাহ বলেন– لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

"পুরুষরা যা কামাই করে, সে তার অংশ (ফল) পাবে এবং নারী যা কামাই করে সে-ও তার অংশ পাবে।" [৪৬]

---

৪২. মাহাসিনুত তাবীল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫৮।
৪৩. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
৪৪. সূরা আল বাকারা : ২২৮।
৪৫. সূরা আন নিসা : ৩।
৪৬. সূরা আন নিসা : ৩২।

শাসন করা : স্ত্রী যদি ইসলামী অনুশাসন অনুসারে না চলে বা তার মধ্যে যদি আনুগত্যহীনতা কিংবা অন্যায় মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে শাসন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

"যে নারীদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, (প্রথমে) তাদের উপদেশ দাও, (তাতে কাজ না হলে) বিছানায় তাদেরকে বর্জন কর এবং (তাতেও কোনো ফল না হলে) তাদের (মৃদু) প্রহার কর। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ করো না।"[৪৭]

উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা : আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের সম্পদে উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। তোমাদের সন্তান থাকলে তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে।" [৪৮]

স্বামীর কর্তব্য হলো, জীবদ্দশাতেই স্ত্রীর এ উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

তালাকের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা : স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করেন, তাহলে স্ত্রীর অধিকার আছে, তিনি নিজ উদ্যোগে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর এ অধিকার ক্ষুণ্ন না করা। আল্লাহ বলেন–

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"তাই তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা দু'জন আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে (স্বামীকে) কিছু বিনিময় দিলে তাতে দু'জনের কারো পাপ হবে না।" [৪৯]

খ. স্ত্রীর কর্তব্য বা স্বামীর অধিকার

সম্মান প্রদর্শন : পরিবারে আল্লাহ তায়ালা স্বামীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। সেজন্য স্ত্রীর কর্তব্য হলো তার স্বামীকে সম্মান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "তবে নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা রয়েছে।"[৫০]

কর্তৃত্ব মেনে চলা : স্বামী বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানের পাত্র। স্ত্রী তার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। তার সংগত আদেশ নিষেধের আনুগত্য করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

---

৪৭. সূরা আন নিসা : ৩৪।
৪৮. সূরা আন নিসা : ১২।
৪৯. সূরা আল বাকারা : ২২৯।
৫০. সূরা আল বাকারা : ২২৮।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"[৫১]

অধিকার আদায় : আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর ওপর স্বামীর বেশ কিছু অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। স্ত্রীর কর্তব্য হলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আল্লাহর হক আদায়ের পরপরই স্বামীর হক আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها.

"যাঁর হাতে মুহাম্মদ (স) এর প্রাণ তাঁর শপথ, নারীরা তার স্বামীর হক আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর হক আদায় করতে পারে না।"[৫২]

সন্তুষ্ট রাখা : স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করবেন। কেননা, স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখলে জান্নাত লাভ সহজ হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.

"যে স্ত্রী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [৫৩]

অনুগত থাকা : স্বামীর অবাধ্য না হওয়া। স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের জন্য স্বামী ইনসাফের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, স্ত্রী তার বিরোধিতা করবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

لو كنت امر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد لزوجها.

"আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে আদেশ দিতাম।"[৫৪]

স্বামীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করা : স্ত্রী স্বামীর পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। পরিবারে স্বামীর সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা করার দায়িত্ব স্ত্রীর। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسؤلة عنهم.

"স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর সম্পদ, সন্তান ও সংসারের। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [৫৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন–

رعاية المرأة حسن التدبير فى بيت زوجها والنصح له والأ مانة فى ماله وفى نفسها.

"স্ত্রী দায়িত্বশীলা হওয়ার অর্থ হলো– স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেয়া এবং স্বামীর ধনসম্পদ ও নিজের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আমানতদার হওয়া ও বিশ্বাসপরায়ণতা বজায় রাখাই স্ত্রীর কর্তব্য।"[৫৬]

---

৫১. সূরা আন নিসা : ৩৪।
৫২. সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫।
৫৩. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
৫৪. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
৫৫. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৩।
৫৬. উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ১২৮।

নৈতিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখা : স্বামীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বিপরীতে স্ত্রীর কর্তব্য হলো চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখা। একজন প্রকৃত মানুষ ও যথার্থ মুসলিম হিসেবেও তার এ পবিত্রতা বজায় রাখা দরকার। আল্লাহ তায়ালা বলেন−

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"এজন্যই ন্যায়নিষ্ঠ নারীরা (স্বামীদের) অনুগত হয় এবং (তাদের) অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন তা (নিজেদের সতীত্ব, স্বামীদের সম্পত্তি ইত্যাদি) রক্ষা করে।"[৫৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে−

أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن.

"স্ত্রীদের কর্তব্য এই যে, তারা স্বামীদের অধিকার রক্ষা করবে এর বিনিময়ে যেভাবে, আল্লাহ নিজেই তাদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।"[৫৮] এজন্যই তিনি পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পুরুষদের সঠিকভাবে স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে আদেশ করেছেন এবং মহর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া : ভালবাসার দাবিতে, নিজের প্রয়োজনে স্বামী তার স্ত্রীর নৈকট্য কামনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য হলো তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে আহ্বানে সাড়া দেবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন−

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملئكة حتى تصبح.

"স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকেন আর স্ত্রী যদি তা অস্বীকার করে এবং এতে যদি স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রযাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"[৫৯]

শালীনতা বজায় রাখা : স্ত্রী পর্দার বিধান মেনে চলবে। উগ্র ও অশালীন পোশাক পরবে না। উত্তেজক সাজসজ্জা করবে না। এমনকি পরপুরুষের সঙ্গে কমনীয় কণ্ঠে কথা বলবে না। তবে তারা যে অভদ্রতা করবে, তাও নয়। প্রয়োজনে সংযত ও সংগত আচরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন−

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে এবং পূর্বের অজ্ঞতার যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।"[৬০]

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন−

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.

"হে নবী! আপনার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের গায়ে আবরণ টেনে দেয় (সারা শরীর আচ্ছাদিত রাখে)।"[৬১]

---

৫৭. সূরা আন নিসা : ৩৪।
৫৮. মাহাসিনুত তাবীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৯।
৫৯. সহীহ আল বুখারি, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৭।
৬০. সূরা আল আহযাব : ৩৩।
৬১. সূরা আল আহযাব : ৫৯।

তিনি আরো বলেন–

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

"অতএব তোমরা যদি মুত্তাকী হয়ে থাক তবে (অন্য লোকের সঙ্গে) নম্রভাবে কথা বলবে না। কেননা যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে-ই লোভ করতে পারে। কাজেই ভদ্র ও সুন্দর কথা বল।"[৬২]

অনুমতি ছাড়া অর্থ ব্যয় না করা : স্বামীর পূর্বানুমতি ছাড়া স্বামীর মালিকানাধীন সম্পদ স্ত্রী ব্যয় করবে না। তিনি বরং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সম্পদ সংরক্ষণ করবেন। বড় ধরনের কোনো ব্যয়ের সিদ্ধান্ত দেবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا باذن زوجها "স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর ঘরের কোনো কিছু খরচ করবে না।"[৬৩]

অনুমতি না নিয়ে কোনো কিছু ব্যয় করলে সে সম্পর্কে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

إذا أنفقت المراة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف أجره.

"স্ত্রী যখন তার স্বামীর অর্জিত অর্থ থেকে তার অনুমতি ছাড়াই কিছু দান করে তবে এ জন্য সেও অর্ধেক সওয়াবের অংশীদারিণী হবে।"[৬৪]

উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা : স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর উত্তরাধিকার রয়েছে। স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী যেন নির্বিঘ্নে এ উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেন, স্ত্রী তার ব্যবস্থা করে রাখবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের রেখে সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে।"[৬৫]

মৃত্যুর পরের দায়িত্ব : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে। তার ভালোবাসা ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চার মাস দশদিন পর্যন্ত অন্য কাউকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী–

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে।"[৬৬]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

---

৬২. সূরা আল আহযাব : ৩২।
৬৩. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৬৪. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৭।
৬৫. সূরা আন নিসা : ১২।
৬৬. সূরা আল বাকারা : ২৩৪।

"তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো মহিলার জন্য কারো মৃত্যুর পর তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তার জন্য চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করা জায়েয আছে।"[৬৭]

নারী যখন মা

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে যে সম্মান দান করেছে তা শুধু সকল ধর্মের চেয়ে সর্বাধিক তাৎপর্যই বহন করেনা; বরং এর চেয়ে দামি ও সম্মানের কোনো স্বীকৃতির অস্তিত্বই এ ধরাপৃষ্ঠে নেই। পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে মাতার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, প্রসব করা এবং স্তন্য দান করার কষ্ট এককভাবে গ্রহণ করে থাকেন। এ তিন পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনায় পিতার কোনো অংশ থাকে না।

তাই মায়ের মর্যাদা পরিমাপ করতে গিয়ে রাসূল (স) বলেন–

قال رجل يا رسول الله من احق بحسن صحابتى؟ قال امك ـ قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك ـ قال ثم من قال ابوك ـ

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের শ্রেষ্ঠ দাবিদার কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? হযরত বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার পিতা।"[৬৮]

আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে কাযী ইয়ায (র) বলেন–

ذهب الجمهور الى ان الام تفضل على الاب فى البر فاذا تعارض حق الاب وحق الام فحق الام مقدم ـ لانه دل على تقديم رضا الام على رضا الاب فمقتضاه ان يكون للام ثلاثة امثال ما للاب ـ

"সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, বাবার চেয়েও অধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী হলেন মা। সুতরাং মা ও বাবার হক যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হবে, তখন মায়ের হককেই প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা, এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পিতার সন্তুষ্টির ওপর মাতার সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজেই পিতার যা পাওনা, মাতার পাওনা হবে তার তিনগুণ।"[৬৯]

রাসূলে কারীম (স) আরো বলেছেন– الجنة تحت اقدام الامهات ـ "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"[৭০]

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স)-এর সময়ে আলকামা নামক এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার রোগ ধীর ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুশ্রূষাকারীরা তাকে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করার উপদেশ দিচ্ছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে কালেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। রাসূলে কারীম (স) এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? বলা হলো যে, তার পিতা মারা গেছে, মা জীবিত আছেন। তবে সে খুবই বয়োবৃদ্ধা। বৃদ্ধাকে রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত করা হলো। তার কাছে তার ছেলের বর্তমান অবস্থার কারণ জানতে চাওয়া হলো। সে বলল, আলকামা বড়

---

৬৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৬৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৩।

৬৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সানআনী কাহলানী, সুবুলুস সালাম, (মিশর : মাতবাআতু মুসতাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হি.) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

৭০. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫), ৬ খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।

নামাযী, বড় রোযাদার এবং বড়ই দানশীল। সে যে কত দান করে, তার পরিমাণ কারো জানা নেই। রাসূলে কারীম (স) বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ? বৃদ্ধা বলল, আমি ওর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। কারণ সে আমার চেয়ে তার স্ত্রীর মন যোগাত বেশি। আমার ওপর তাকেই অগ্রাধিকার দিত বেশি। আর তার কথামতোই কাজ করত। তখন রাসূলে কারীম (স) বললেন, ঠিক এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তার মুখে কালেমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছেন। অতঃপর নবী করীম (স) হযরত বেলাল (রা)-কে আগুনের একটা কুণ্ডলি জ্বালাতে বললেন এবং আলকামাকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। আলকামার মা এ কথা জানতে পেরে বলল, আমি মা হয়ে তা কেমন করে সহ্য করতে পারি? সে আমার সন্তান, আমার কলিজার টুকরা। তখন রাসূলে কারীম (স) বললেন, তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক তাহলে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। অন্যথায় আল্লাহর শপথ, আল্লাহর দরবারে তার নামায, রোযা ও দান খয়রাতের কোনো মূল্যই হবে না।

অতঃপর আলকামার মা বলল, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর খবর নিয়ে জানা গেল যে, আলকামা অনায়াসে কালেমা উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়েছে।[৭১]

অতএব, বোঝা গেল যে, মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে তার উপযুক্ত খেদমত করলে, ঠিকমতো তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে। অর্থাৎ, সন্তানের বেহেশত লাভ মায়ের খেদমতের ওপর নির্ভরশীল। মায়ের খেদমত না করলে কিংবা তার প্রতি কোনোরূপ অশোভন আচরণ করলে অথবা কোনো প্রকারে মাকে কষ্ট ও দুঃখ দিলে, সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর সৎ আমলই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশত লাভ করা সম্ভব নয়।

জাহিলী যুগে আরব-সমাজে মা হিসেবে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ ও অসহায়। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা মাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য করত। কখনো কখনো মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অন্যের নিকট বিয়ে দিত। অথবা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে অতিশয় দীনহীনভাবে তাকে ছেলেদের সাথে দিন কাটাতে হত। স্বামী বা ছেলেদের সম্পদে বলতে গেলে তার কোনো অধিকারই ছিল না। তাকে ছেলেদের করুণার পাত্রী হিসেবে থাকতে হতো। এই দুর্দশা থেকে বের করে ইসলাম মাকে বহু উচ্চে স্থান দিয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে যে, মায়ের সন্তুষ্টি সন্তানের জান্নাত আর তার অসন্তুষ্টি জাহান্নামের কারণ হবে। এমনকি মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদেও ইসলাম মায়ের জন্যে অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

"মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে মা ও বাপ উভয়েই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর সন্তান না থাকলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। মৃত ব্যক্তির ভাই জীবিত থাকলেও তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।"[৭২]

---

৭১. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।
৭২. সূরা নিসা : ১১।

অতএব একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, ইসলাম মা হিসেবে নারীকে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। সারা বিশ্বের সকল মানুষই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে। নারীর কোলেই তারা লালিত-পালিত হয়েছে। তাই গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সংগত কারণেই ইসলাম নারীকে উঁচু মর্যাদার আসনে স্থান দিয়েছে।

মাতাপিতা সন্তানের জন্য আল্লাহর নেয়ামততুল্য। এ নেয়ামতের শোকর আদায় করা তার মহান কর্তব্য। মাতাপিতার যথাযথ সেবাযত্নের মাধ্যমেই এ শোকর আদায় করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্যবার মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ সকল নির্দেশনা মোতাবেক মাতাপিতার হক আদায় করা সন্তানের ওপর অবশ্যকর্তব্য।

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য দুইভাবে হতে পারে– ক. জীবদ্দশায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। খ. মৃত্যু-পরবর্তীকালে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক. জীবদ্দশায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তানের নিকট মাতাপিতা যে সকল সেবা ও আচরণের কামনা করে এবং মাতাপিতার প্রতি সন্তানের যে সব সেবাযত্ন ও সদাচরণ প্রদর্শন করা কর্তব্য তার কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. বিনম্র আচরণ করা ও সদয় হওয়া

আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সদয় হওয়ার জন্য সন্তানদের আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

"তোমার প্রভু আদেশ করেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তা হলে তাদেরকে উফ্ শব্দও বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে।"[৭৩]

ইমাম কুরতুবী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার সেবায় ত্রুটি করবে তার দু'অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে। ক. আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন, অথবা খ. আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। সর্বাবস্থায় মাতাপিতার সেবা করা ফরয। তার পরও বিশেষভাবে বার্ধক্যের বিষয়কে যুক্ত করার কারণ হলো, এ বয়সে তারা সন্তানের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী হন। শিশুকালে সন্তান যেমন তাদের মুখাপেক্ষী ছিল তদ্রূপ আজ বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়ে তারাও সন্তানের সহানুভূতি পাওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন মাতাপিতার ব্যয়ভার বহনে বিরক্তিভাব দেখা দিতে পারে। তখন অধৈর্য হয়ে মাতাপিতার সাথে সন্তানের রূঢ় ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথাবার্তা বলার এবং ভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।[৭৪]

---

৭৩. সূরা আল ইসরা : ২৩।

৭৪. আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

২. কোমল সুরে কথা বলা

মাতাপিতার সাথে সর্বাবস্থায় বিনম্র আচরণ করা, কোমলভাবে কথাবার্তা বলা ও সম্মানপ্রদর্শন করা সন্তানের ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব। হযরত ইবনে ওমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন–

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ، عِنْدِيْ أُمِّيْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَ اللهِ لَوْ أَلَنْتَ لهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ.

"তোমার মাতাপিতা কি জীবিত? লোকটি বলল, আমার কাছে আমার মা রয়েছেন। ইবনে ওমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! যদি তুমি তার সাথে কোমল ব্যবহার কর, তাকে আহার করাও, তা হলে কবীরা গুনাহ থেকে তুমি দূরে থাকলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭৫]

মাতাপিতাকে সর্বদা হাসি-খুশি রাখা এবং তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট প্রদান না করার ব্যাপারে ইসলামে তাগিদ করা হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجَلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমার মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আমি হিজরত করার জন্য আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে এসেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফুটাও।"[৭৬]

৩. অবাধ্য না হওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক ও মাতাপিতার অবাধ্যতাকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অবাধ্য হওয়ার অর্থ তাদের আদেশ মান্য না করা, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা না করা এবং বিপদ-আপদে তাদের পাশে না দাঁড়ানো। সুতরাং যারা অবাধ্য হয়ে তাদের গায়ে হাত তোলে তাদের অপরাধ কতই-না জঘন্য! অথচ হাদীসে মাতাপিতার অবাধ্যতার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ.

"হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলব না? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া।"[৭৭]

---

৭৫. ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, (মিশর : দারুল হাদীস ২০০৪), পৃ. ৮।

৭৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

৭৭. সহীহ আল বুখারী প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

৪. গালমন্দ না করা

পৃথিবীতে এমন অনেক সন্তানের নজির আছে যে, তারা মাতাপিতাকে গালমন্দ করে। বর্তমান যুগে ব্যাপারটি শুধু সেই পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, কোথাও কোথাও সম্পদ ও স্বার্থের জন্য পিতাকে বা মাতাকে বা উভয়কে হত্যাও করা হচ্ছে। জাহেলী যুগের যেসব ঘটনা অলীক মনে হতো, তা আধুনিক যুগে অহরহ ঘটছে। মাতাপিতাকে গালি তো দেয়া যাবেই না, এমনকি তাদেরকে অন্যের দ্বারা গালি দেয়ার কারণ হওয়াও নিষেধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ، يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মাতাপিতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ কি তার মাতাপিতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একে অপরের পিতাকে গালি দেয়। ফলে অন্যজনও তার পিতাকে গালি দেয়। এভাবে একে অন্যের মাতাকে গালি দেয়। ফলে অন্যজনও তার মাতাকে গালি দেয়।"[৭৮]

অপর এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ.

"হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মাতাপিতার প্রতি অভিসম্পাত করে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।"[৭৯]

৫. মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাদের জন্য দোয়া করা

মাতাপিতার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করার শিক্ষা সাহাবীগণ নববী শিক্ষালয়ে পেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) তাঁর মায়ের জন্য দোয়া করেছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এটি চমৎকারভাবে স্থান পেয়েছে–

عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِلٰى أَرْضِهِ "الْعَقِيْقِ" فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ : عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أُمَّتَاهُ! تَقُوْلُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَقُوْلُ : رَحِمَكِ اللهُ كَمَا رَبَّيْتِنِيْ صَغِيْرًا، فَتَقُوْلُ يَا بُنَيَّ! وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا.

"উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররা (রা) বলেন যে, তিনি আবু হোরায়রা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর আকীক নামক এলাকায় যান। যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন, তখন আবু হোরায়রা উচ্চ আওয়াজে বললেন– عليك السلام ورحمة الله وبركاته অর্থাৎ, মা! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ হোক। তখন তাঁর মা বললেন, তোমার ওপরও আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল হোক।

---

৭৮. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯।
৭৯. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

আবু হোরায়রা (রা) বললেন, আপনি যেভাবে শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করেছেন, তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া করুন। তাঁর মা বললেন, হে আমার বৎস! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধবয়সে আমার সাথে সদ্ব্যবহার করেছ (এবং আমাকে সন্তুষ্ট করেছ), সেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"[৮০]

মাতাপিতা সন্তানকে পার্থিব কোনো বিষয়ে বঞ্চিত করলেও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। বরং তাঁদের আনুগত্য করা ফরয। হযরত আবু দারদা (রা)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

أَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ.

"তুমি তোমার মাতাপিতার আনুগত্য করো, যদিও তারা তোমাকে তোমার আবাসস্থল ত্যাগ করার জন্য আদেশ করে।"[৮১]

উল্লেখ্য যে, মাতাপিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই কোনোভাবেই মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। কথায়, কাজে, চালচলনে কোনোভাবেই যেন মাতাপিতা সামান্য পরিমাণেও অন্তরে আঘাত না পান; সেদিকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো, যার দ্বারা মাতাপিতা কষ্টবোধ করে থাকেন। এগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

১. মাতাপিতাকে কাঁদানো বা কষ্ট দেয়া।

২. মাতাপিতার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা।

৩. তাঁদের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা।

৪. তাঁদের প্রতি চোখ গরম করা কিংবা ভ্রূকুটি করা।

৫. মাতাপিতার কথাকে অগ্রাহ্য করা।

৬. মাতাপিতাকে কোনো কাজে বাধ্য করা।

৭. স্ত্রীকে মাতাপিতার ওপর প্রাধান্য দেয়া।

৮. মাতাপিতার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া বা সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৯. এমন কোনো কাজ করা, যার দ্বারা মাতাপিতার সম্মানহানি ঘটে।

১০. মাতাপিতার অর্থসম্পদের অপব্যবহার করা বা তাঁদের অর্থাদি চুরি করা।

১১. মাতাপিতার অমতে দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা।

১২. মাতাপিতাকে খোঁটা দেয়া।

১৩. কোনো কারণে তাঁদেরকে মারতে উদ্যত হওয়া।

১৪. তাঁদের কাছে আপত্তিকর মনে হয় এমন কোনো কাজ করা।

---

৮০. আল আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬. মাতাপিতার ব্যয়ভার বহন করা

মাতাপিতার অন্নবস্ত্রের সরবরাহ সন্তানকেই করতে হবে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যয়ভারও সন্তানকেই বহন করতে হবে। মাতাপিতা সন্তানের সম্পদকে নিজ সম্পদ মনে করে ভোগ করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশনা হলো−

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِيْ يَجْتَاحُ مَالِيْ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدَيْكَ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ ও সন্তানসন্ততি রয়েছে। অথচ আমার পিতা আমার সম্পদ নিয়ে খরচ করে ফেলছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার মাতাপিতার। কেননা তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উত্তম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে আহার করো।"[৮২]

মাতাপিতা কাফের (ভিন্ন ধর্মাবলম্বী) হলেও তাঁদের সাথে মোটেও সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তাঁদেরও ব্যয়ভার বহন করতে হবে। তবে তাঁরা যদি মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

"যদি তাঁরা (মাতাপিতা) এই চেষ্টা করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক কর, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাঁদের আনুগত্য করবে না। তবে পৃথিবীতে সৌহার্দ্যের সাথে তাঁদেরকে সঙ্গ দেবে।"[৮৩]

হাদীস শরীফে এসেছে−

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ قَالَتْ : أَتَتْنِيْ أُمِّيْ رَاغِبَةً فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ آصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهَا ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾. (الآية)

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা (অমুসলিম অবস্থায়) সদাচরণের প্রত্যাশা নিয়ে (কাফেরদের সঙ্গে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্ধির যুগে আমার নিকট এলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাঁর সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন− لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين (অর্থাৎ, যারা ধর্ম নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে না, তাদের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো− তাদের প্রতি সদাচরণ করতে হবে।) আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।"[৮৪]

৮২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।
৮৩. সূরা মুমতাহিনা : ৮
৮৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৪।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমাজে এমন সন্তানের সংখ্যাও কম নয়, যারা বৃদ্ধ মাতাপিতাকে তাদের সংসারের বোঝা মনে করে থাকে। এমনকি মাতাপিতাকে তারা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই এ পর্যায়ে বৃদ্ধাশ্রম প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা সংগত মনে করছি।

সামাজিক সংকটের করুণ চিত্র বৃদ্ধাশ্রম : প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

সন্তানের প্রতি মাতাপিতার ভালোবাসা হলো প্রকৃত ভালোবাসা। সন্তানের জন্য মাতাপিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাই তাদেরকে সম্মান করা, ভালোবাসা, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করা সন্তানের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, কালপরিক্রমায় অনেক সন্তান হয়ে ওঠে অতি নির্মম। তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় মাতাপিতার প্রতি চরম অবহেলা ও অবজ্ঞা। মাতাপিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান, তখন তারা সন্তানের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শুরু হয় তাদের অসহায়ত্বের জীবন। আর তখন থেকেই অনেক কুলাঙ্গার সন্তান তাদের প্রতি প্রদর্শন করে ঔদাসিন্য ও অবহেলা। তাদেরকে ভাবতে থাকে পরিবারের বোঝাস্বরূপ। এ ভোগবাদী মানসিকতা থেকেই সন্তানরা তাদেরকে জোর করে পাঠিয়ে দেয় বৃদ্ধাশ্রমে। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে গড়ে তোলে সুখের সংসার। আর বৃদ্ধ মাতাপিতার ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে। পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরম অসহায়ভাবে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন তারা। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, যে সন্তানকে মানুষ করার জন্য মাতাপিতা সারা জীবন কষ্ট করেছেন, যে সন্তানের সুখের দিকে তাকিয়ে মাতাপিতা নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই নরাধম সন্তানের দ্বারাই মাতাপিতা নিগৃহীত হচ্ছেন।

পশ্চিমা বিশ্বে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রম বা বাসস্থান ও সেবালয়ের প্রচলন অনেক পূর্ব থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও ব্যক্তি-উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমা জগতের সামাজিক অবস্থার প্রতি গবেষণা করে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাহীন কর্মব্যস্ততার কারণে মাতাপিতাকে সন্তানেরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন। সপ্তাহান্তে বা অবসর সময়ে সুযোগমতো মাতাপিতাকে দেখার জন্য তারা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেয়। তাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আসে। অবশ্য মাতাপিতার খাবারদাবার, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভার সন্তানেরাই বহন করে থাকে। মোটকথা বৃদ্ধাশ্রম সেখানে একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় রূপ নিয়েছে। তবে এমন পরিবারও সেখানে রয়েছে, যারা বৃদ্ধ মাতাপিতাকে বোঝা মনে করে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে থাকে। এটি খুবই দুঃখজনক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অসহায় মাতাপিতার জন্য এ সময় বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকে না। বৃদ্ধাশ্রমে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। নিঃসন্দেহে এটি মানবতার সেবায় মহান অবদান। খুবই প্রশংসনীয় কর্ম।

বাংলাদেশে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা কম হলেও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বৃদ্ধাশ্রমের প্রসঙ্গ সত্যিই আমাদের সামাজিক অবক্ষয় ও সংকটের চিত্রকেই তুলে ধরে। গণমাধ্যম ও সমাজের লোকজনের কাছ থেকে আমরা যতটুকু জানতে পারি তা এই যে, মাতাপিতা বার্ধক্যে পৌঁছলে হতভাগা সন্তান তাদেরকে নগণ্য বোঝা মনে করে থাকে। একারণে তাদেরকে নানা প্রকার মানসিক যাতনা দিয়ে থাকে। একপর্যায়ে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় বৃদ্ধাশ্রমে। অথচ এই মাতাপিতাই তাকে সর্বস্ব দিয়ে তিলে তিলে বড় করেছেন। কিন্তু স্ত্রীকে খুশি করার জন্যই হোক, বা অন্য কোনো কারণে হোক মাতাপিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে হতভাগাটি মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না।

বার্ধক্য হলো দ্বিতীয় শৈশব। তাই বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকার জন্য শিশুকালের মতো আদর-স্নেহ, মায়া-মমতার প্রয়োজন হয়। বার্ধক্যের কারণে মাতাপিতার মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হয়ে যেতে পারে, সামান্য বিষয় নিয়ে তারা তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে পারেন। তাই তাঁদের অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশকেও সামাজিক বন্ধনে সুদৃঢ় দেশ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বৃদ্ধাশ্রমগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, ক্রমেই আমাদের সমাজে অবক্ষয় ও সংকট বেড়ে চলছে। সমাজিক বন্ধন যেন মোটেও শিথিল হতে না পারে সে দিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় আমাদের সমাজ চরম অবক্ষয় ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য।

বৃদ্ধাশ্রম নিঃসন্দেহে মানবিক সংকটকে রক্ষা করছে সত্যি। কিন্তু সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে মাতাপিতার প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতে পারলে আমাদের দেশে মোটেই বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন পড়বে না। তাই অন্তত আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রমের উপস্থিতি সত্যিই বেদনায়ক।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে, কালের বিবর্তনে আমরাও এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হব। আমাদের সঙ্গে বৃদ্ধাবস্থায় তেমনই আরচণ করা হবে, যেমন আচরণ আমরা আমাদের বৃদ্ধ মাতাপিতার সঙ্গে করব। অন্তত এই দিকটি বিবেচনায় রেখে আমাদের উচিত, মাতাপিতার সঙ্গে সদাচরণ করা।

খ. মৃত্যু-পরবর্তীকালে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবী ছেড়ে সকল আদমসন্তান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি দিতে বাধ্য। মাতাপিতাও একদিন সন্তান-সংসারের মায়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি দিয়ে থাকেন। মানুষের দেহের মৃত্যু ঘটলেও তার আত্মা অমর। এ আত্মা পৃথিবীবাসীর কাছ থেকে তাদের উদ্দেশে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য মুখিয়ে থাকে। তাঁরা বিদায় নেয়ারকালে শুধু সন্তানকেই রেখে যায় না। বরং পৃথিবীতে বসবাসকালে অনেকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকে। অনেকের সাথে লেনদেন থাকে। অনেক সময় তাদের ঋণও থাকতে পারে। এ ছাড়াও তাদের আত্মীয়স্বজন তো থাকেই। তাই মাতাপিতার মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব একেবারে শেষ হয়ে যায় না। বরং মৃত্যুর পরও তাদের বেশ কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। এখানে এ ধরনেরই কয়েকটি দায়িত্বের আলোচনা তুলে ধরা হলো−

১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করা

সন্তানের উচিত তার মাতাপিতার জন্য দোয়া করা। নবী (আ)-গণও তাঁদের মাতাপিতার জন্য দোয়া করতেন। কুরআন মাজীদে কয়েকজন নবী (আ)-এর দোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন− হযরত ইবরাহীম (আ) মাতাপিতার জন্য এভাবে দোয়া করেছেন−

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

"হে আমাদের প্রভু! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করো।"[৮৫]

হযরত নূহ (আ)-এর দোয়ার ভাষ্য ছিল−

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوٰلِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ.

"হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আমার ঘরে ঈমানের সাথে যে প্রবেশ করে তাকে এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করো।"[৮৬]

---

৮৫. সূরা ইবরাহীম : ৪১।
৮৬. সূরা নূহ : ২৮।

মাতাপিতার জন্য সন্তানের দোয়া প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنّٰى لِيْ هٰذِهِ؟ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

"আল্লাহ তা'আলা সৎ বান্দাদের সম্মান জান্নাতে বৃদ্ধি করে দেবেন। তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলবে, এমনটা কীভাবে হলো! তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে।"[৮৭]

মাতাপিতার জন্য সন্তানের দোয়া মোটেও বিফলে যায় না। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল এমন রয়েছে, যা মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, ৩. সৎ সন্তান, যে তার পিতার জন্য দোয়া করে।"[৮৮]

২. ঋণ পরিশোধ করা

মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের কর্তব্য। ঋণ পরিশোধ না করলে মাতাপিতা গুনাহগার থেকে যাবেন। এমর্মে হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকে থাকবে (তার কোনো ফয়সালা হবে না)।"[৮৯]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৯০]

৩. মানত ও কাফফারা আদায় করা

মাতাপিতার যদি এমন কোনো মানত থাকে, যা সন্তানের পক্ষ থেকে পূর্ণ করা সম্ভব। তবে তা পূর্ণ করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে তাঁদের ওপর কোনো কাফফারা ওয়াজিব হয়ে থাকলে তাও আদায় করা সন্তানের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, মানত ও কাফফারা আল্লাহর ঋণ। এ ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–

---

৮৭. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।
৮৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১।
৮৯. সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ১০৭৮।
৯০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَلَمْ تَصُمْ حتّٰى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِمَّا أُخْتُهَا أَوِ ابْنَتُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ : أَرَأَيْتُكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِيْنَهٗ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضٰى.

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। জনৈক মহিলা এক মাস রোযা রাখার মানত করল, মানত পূরণ করার পূর্বেই মহিলাটি ইন্তেকাল করল। এমতাবস্থায় তার কোনো নিকটাত্মীয় হয়তো তার বোন অথবা তার মেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে এ বিষয়ে আলোচনা করল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তার ওপর কোনো লোকের ঋণ থাকত, তা হলে তুমি কি তাঁর পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিতে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারটি তার চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য।"[৯১]

৪. অসিয়ত পূরণ করা

মৃত্যুর পূর্বে মাতাপিতা কোনো অসিয়ত করে গেলে তা পূরণ করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। যদি সম্ভব হয় তবে দাফনের পূর্বে অসিয়ত পূরণ করবে। কারণ দাফনের পূর্বে অসিয়ত পূরণ করা অতিশয় সাওয়াবের কাজ।

৫. মাতাপিতার আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা

মাতাপিতার নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ﷺ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَانِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَتَدْرِيْ لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّصِلَ أَبَاهُ فِيْ قَبْرِهٖ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ اَبِيْهِ بَعْدَهٗ" وَاِنَّهٗ كَانَ بَيْنَ أَبِيْ عُمَرَ وَ بَيْنَ أَبِيْكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ.

"হযরত আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি মদিনায় আগমন করলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমার নিকট এসে বললেন, আমি আপনার নিকট কেন এসেছি, আপনি কি তা জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে চায়, সে যেন তার পিতার ভাইদের সাথে তার মৃত্যুর পরে সদ্ব্যবহার করে। সুতরাং আমার পিতা ওমর (রা) এবং আপনার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। অতএব আমি ঐ ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বহাল রাখতে পছন্দ করি।"[৯২]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ.

"পিতার বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার শামিল।"[৯৩]

খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে খুবই স্মরণ করতেন। এমনকি তিনি বকরি যবেহ করলে তার একটা অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। একবার হযরত আয়েশা

---

৯১. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।
৯২. মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিব্বান, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫।
৯৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৩১৪।

(রা) এজন্য রাগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন– قد رزقت حبها অর্থাৎ, "আমি তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি।"[৯৪]

এ কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেয়ে মাতাপিতার বন্ধুবান্ধবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আরো জরুরি।

সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অবদান

পৃথিবীতে সন্তান আগমনের মূল উৎস মাতাপিতা

প্রতিটি মানুষই মাতাপিতার মাধ্যমে দুনিয়াতে আগমন করে। মাতাপিতার দৈহিক মিলনের ফলে পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থিত শুক্রবিন্দু প্রথমে মায়ের ডিম্বানুতে আসে। অতঃপর সেখান থেকে মার্তৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। তারপর সেখানে দশ মাস দশ দিন অবস্থান করে। এ সময় তার মাঝে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধনের পর মানবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে তার আগমন ঘটে। মানবভ্রূণের সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ، قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত। বস্তুত তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (বীর্য আকারে) স্থির রাখা হয়। এরপর তা অনুরূপভাবে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর তা একইরূপে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অবশেষে আল্লাহ তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। অতঃপর তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। তার রিজিক, তার মৃত্যু, তার আমল, সে ভালো, না মন্দ তা লিখতে বলা হয়।"[৯৫]

মানবসন্তান সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরমাদ করেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

"আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে এক নিরাপদ আধারে (মাতৃগর্ভে) শুক্রবিন্দুরূপে রেখেছি। তারপর শুক্রবিন্দুকে জমাটবদ্ধ রক্তে এবং জমাটবদ্ধ রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর

৯৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
৯৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৩২।

মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করেছি এবং হাড়গুলোকে আবার মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করেছি। অবশেষে তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে তৈরি করেছি। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই-না মহান!"[৯৬]

সন্তান জন্মদানে মায়ের অবদান

পৃথিবীতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন মা। এজন্য ইসলামে মাকে সবিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এমন এক ঋণ, যা পরিশোধের ক্ষমতা কোনো সন্তানেরই নেই। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকে মা সন্তানকে প্রসব করেন। এসময় কোনো কোনো মা মৃত্যুবরণও করেন। গর্ভে সন্তান ধারণ ও প্রসবের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট করে প্রসব করেছেন।"[৯৭]

এ প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ.

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন। আর তার দুধপান ছাড়ানো হয় দু'বছরে। (তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে,) আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৯৮]

ইসলামে পিতামাতার সেবা করার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি স্বীয় হক আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মাতাপিতার প্রতি ইহসান তথা সদ্ব্যবহার করার কথাকেও যুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"[৯৯]

মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা জিহাদের চেয়েও উত্তম। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি চাইলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতাপিতা

---

৯৬. সূরা আল মু'মিনূন : ১২-১৪।

৯৭. সূরা আল আহ্ক্বাফ : ১৫।

৯৮. সূরা লুকমান :১৪।

৯৯. সূরা আন নিসা : ৩৬।

কি জীবিত আছেন? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের উভয়ের (সেবার) মধ্যে তোমার জিহাদ (সাওয়াব) নিহিত রয়েছে। কাজেই তুমি (তাদের সেবায়) সচেষ্ট থাক।"[১০০]

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, যদি তোমার মাতাপিতা জীবিত থাকেন, তা হলে তাঁদের সাথে অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তা জিহাদতুল্য।[১০১]

ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে পিতামাতা মুসলিম হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়া যাবে না। কারণ, তাদের দেখ-ভাল করা সন্তানের ওপর ফরযে আইন। আর জিহাদ হলো ফরযে কিফায়া। হ্যাঁ, মুসলিম দেশের গভীর সংকটকালে যদি জিহাদে যাওয়া ফরযে আইন হয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।[১০২]

নামাযের পর পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হিসেবে গণ্য। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, সময়মতো নামায আদায় করা। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[১০৩]

মাতাপিতার সেবা করার বিনিময়ে জান্নাতের লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَدرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক (অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক)। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতাপিতার কোনো একজনকে অথবা উভয়জনকে পেল, অথচ সে (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।"[১০৪]

তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণার মধ্যে মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান অন্যতম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ.

---

১০০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১।
১০১. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।
১০২. আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।
১০৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
১০৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

"আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের ওপর জান্নাত হারাম। ১. মদ্যপানকারী, ২. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, ৩. দাইয়ূস, যে তার পরিবার-পরিজনের মন্দ কর্মকে মেনে নেয়।"[১০৫]

মাতাপিতা সন্তানের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী, তারা সন্তানের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ১. পিতার দোয়া (সন্তানের জন্য), ২. মুসাফিরের দোয়া, ৩. অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া।"[১০৬]

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, সে অবশ্যই কোনো এক নারীর গর্ভজাত সন্তান। যিনি দশ মাস দশ দিন ধরে অতি কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে থেকে প্রসব করেছেন। প্রসবোত্তর জীবনে স্নেহ-মমতায় তিলে তিলে বড় করেছেন। এই নারীই হলেন মা। প্রত্যেক সন্তানই তার মায়ের কাছে চিরঋণী। মায়ের কাছ থেকেই সন্তান প্রথমে কথা বলতে শিখে। তাঁর কাছ থেকেই সন্তান আদব কায়দা, চাল-চলন ইত্যাদি শিখে থাকে। এককথায় বলতে গেলে, জীবন চলার প্রথম পাথেয়ই হলো মায়ের শিক্ষা। পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে সবিশেষ গুরুত্বসহকারে মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। পাশাপাশি বাবার প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মাতাপিতার অধিকারের বিষয়ে কুরআন-সুন্নায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক সন্তানকে মাতাপিতার অধিকারের প্রতি সচেতন হতে হবে। তাঁদের সেবাযত্নের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাঁরা যেন কোনো প্রকার কষ্ট না পান, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

১০৫. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৭২।
১০৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ অধ্যায়ে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। নর ও নারী উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নরের যেমন নারীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, ঠিক তেমনি নারীরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে নরের প্রতি। নারীর যা অধিকার নরের তা-ই দায়িত্ব আবার নরের যা অধিকার নারীর তা-ই দায়িত্ব। কাজেই দেখা যায়, প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

জীবনের সকল স্তরেই নরের প্রতি নারীর কর্তব্য আছে। তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মা-বাবার প্রতি, তারপর স্বামী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের প্রতি।

মা-বাবার প্রতি নারীর কর্তব্য

পৃথিবীতে পিতামাতার মত আত্মীয়, দরদী ও আপনজন দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁদের মাধ্যমেই সন্তান দুনিয়ার মুখ দেখতে পায়। প্রাণের দরদ এবং হৃদয়ের পরশ দিয়ে তারা সন্তানকে লালন-পালন করেন। সন্তানের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের জন্যে তাঁরা নিজেদের আরামকে হারাম করে থাকেন। তাই এহেন দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতার জন্যে সন্তানের জীবন উৎসর্গ করা উচিত। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের পরম পুণ্যের কাজ। এটা তার নাজাতের উসিলা এবং জান্নাতের কুঞ্জি। আর যে সন্তান পিতামাতার সাথে অন্যায় আচরণ করে, সে আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। ফলে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। কুরআন মাজীদে আল্লাহর ইবাদতের আদেশ দেয়ার পরই পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যের দরুন পিতামাতা যখন দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন অত্যন্ত যত্ন ও কোমলতার সাথে তাঁদের সেবা-যত্ন করার জন্যে তাকীদ দেয়া হয়েছে।[১০৭]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তোমার সামনে তাদের যে কোনো একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তুমি তাদের কাছে উহ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না, তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলবে না এবং তাদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও আদবসহ কথা বলবে। দয়া, মায়া ও কোমলতার সাথে তাদের জন্যে বিনয়ের বাহু অবনত কর এবং বল, হে প্রভু, শৈশবে পিতামাতা যেরূপ দয়াপরবশ হয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, আপনিও তাদের উপর সেরূপ দয়া প্রদর্শন করুন।"[১০৮]

উক্ত আয়াতে দেখা যায়, প্রথমত এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এর সাথে সাথে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে

---

১০৭. আখলাকে ইসলামী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১০৮. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪।

যে, পিতা- যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন সন্তান যেন তাদের দুর্বহ বোঝা মনে না করে এবং তাদের সাথে কথাবার্তা ও ব্যবহার যেন কোনো বে-আদবী প্রকাশ না পায়। তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে কখনো ধমকের সুরে কোনো কথা বলবে না।

এখানে কেবল নেতিবাচক কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং ইতিবাচক কতগুলো নির্দিষ্ট কাজের নির্দেশও দিয়েছে। সন্তানকে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সম্মানজনক কথা বল, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন কর এবং তাঁদের খিদমতের জন্যে কোমলতা ও নম্রতা মিশ্রিত দু'খানি হাত নিয়োজিত করে দাও।[১০৯]

আল্লাহর অধিকারের পরেই পিতামাতার অধিকার। কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদের পরে সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বারবার এসেছে।

পিতামাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব দেখা দেয়। বয়সের কারণে তাঁদের মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয় যা কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত নয়। তখন সন্তানদের উচিত এ সময়ে পিতামাতার মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা। তাঁদের প্রতিটি কথা খুশি মনে গ্রহণ করা। তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার উত্তর না দেয়া।

পিতামাতার সাথে আচার-আচরণে সবসময় বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করবে। তাদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে এবং তা পালনের চেষ্টা করবে। বৃদ্ধ পিতামাতা যখন অসহায় হয়ে পড়েন এবং অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন, সন্তান তখন অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত করবে। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা ও তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার ভাব প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করবে এবং তাদের খিদমত করার সুযোগ লাভের জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

যখন পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েন, সন্তান তখন তার শৈশবকালের দুর্বল ও অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করবে। পিতামাতা তখন তাকে কত আদর-স্নেহ এবং মায়া-মমতা দিয়ে, কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাকে লালন-পালন করেছিলেন। সন্তানের আনন্দে তাঁরা আনন্দিত হতেন, তার কষ্টে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়তেন– এসব কথা স্মরণ করে সন্তান জানপ্রাণ দিয়ে পিতামাতার সেবাযত্ন করবে। আর তাঁদের সুখ-শান্তির জন্যে দয়াময় আল্লাহর কাছে সবসময় প্রার্থনা করতে থাকবে।[১১০]

একই মর্মে এ কথাটি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

সূরা আল আনকাবূতে বলা হয়েছে– وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

"আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি।"[১১১]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না, আর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর।"[১১২]

সূরা বাকারার একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

---

১০৯. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২।
১১০. হুসনে মুআশারাত, অনুবাদ : আবদুল কাদির, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ২-৩।
১১১. সূরা আল আনকাবূত : ৮।
১১২. সূরা আন নিসা : ৩৮।

"তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করবে।"[১১৩]

উপর্যুক্ত আয়াতে প্রথমে আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং তারপরই পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ হলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। কাজেই বান্দার উপর সর্বপ্রথম হক আল্লাহর। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু এ কাজ সরাসরি নিজে করেন না, পিতামাতার মাধ্যমে তিনি তা করেন, তাই বান্দার উপর আল্লাহর অধিকারের পরেই পিতামাতার অধিকারের কথা নির্ধারিত হয়েছে।

রাসূল (স)-এর অসংখ্য হাদীসেও পিতামাতার সাথে সদাচরণের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু উমামা (রা) বলেন–

ان رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما - قال هما جنتك ونارك -

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? এর জবাবে রাসূল (স) বললেন, তারাই তোমার বেহেশত এবং তারাই তোমার দোযখ।"[১১৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন–

من اصبح مطيعا لله فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدا فواحدا ومن اصبح عاصيا لله فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحدا قال رجل وان ظلماء قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه -

"যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী অবস্থায় সকাল করল, সে যেন নিজের জন্যে জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা পেল। যদি পিতামাতার মধ্যে কোনো একজন হয়, তাহলে সে জান্নাতের একটি দরজা খোলা পেল। আর যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী অবস্থায় সকাল করল, সে যেন নিজের জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা পেল। যদি পিতামাতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে সে জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। তখন এক ব্যক্তি বলল, যদি তারা অত্যাচার করে। রাসূল (স) বলেন, যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে।"[১১৫]

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন–

كل الذنوب يغفر الله تعالى منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه فى الحيوة قبل الممات -

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল পাপই ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না। বরং পিতামাতার প্রতি অবাধ্য সন্তানকে তিনি মৃত্যুর পূর্বেও দুনিয়াতেই তার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে পারেন।"[১১৬]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন–

رغم انفه رغم انفه رغم انفه - قيل من يا رسول الله - قال ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة -

১১৩. সূরা আল বাকারা : ৮৩।
১১৪. সুনান ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্র. ১২০৮।
১১৫. ফায়যুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
১১৬. শুআবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

"তার নাক ধুলায় মণ্ডিত হোক, তার নাক ধুলায় মণ্ডিত হোক, তার নাক ধুলায় মণ্ডিত হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স) সে ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন– যে ব্যক্তি তার পিতামাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল কিন্তু তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।"[১১৭]

উপর্যুক্ত আলোচনায় পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সদ্ব্যবহার করার কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর কুরআন ও হাদীসে মায়ের প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর কারণ এই যে, মাতা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, অসাধারণ যাতনা সহ্য করে সন্তান প্রসব করেন এবং তাকে নিজের দেহ নিংড়ানো স্তন্যদান করে থাকেন। আর এই তিনটি কাজের ক্লেশ ও যাতনায় পিতার কোনো অংশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। সে যেন ভুলে না যায়, তার মা কত কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, আর কত কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছেন। গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান করতে তাঁর ত্রিশটি মাস লেগেছে।"[১১৮]

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন– وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্যে উপদেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্যদান করেছেন।"[১১৯]

রাসূল (স)-এর হাদীসেও মা সম্পর্কে এরূপ তাকীদ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন–

جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتى - قال امك قال ثم من - قال امك - قال ثم من - قال امك - قال ثم من - قال ابوك.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠ অধিকারী কে? রাসূল (স) বললেন– তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (স) এবারও বললেন, তোমার মা। এরপরও লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবারে রাসূল (স) বললেন, তোমার পিতা।"[১২০]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কাযী ইয়ায (র) লিখেছেন–

ذهب الجمهور الى ان الام تفضل على الاب فى البر - فاذ تعارض حق الاب وحق الام فحق الام مقدم -

"অধিকাংশ মনীষীর মতে সন্তানের কাছে মা, বাবার চেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। কাজেই মা ও বাবার যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে, তখন মা-এর হকই অগ্রগণ্য হবে।"[১২১]

হযরত মু'আবিয়া ইবনে জাহিমা (রা) বলেন–

ان جاهمة جاء الى النبى ﷺ فقال يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام - قال نعم - قال فالزمها فان الجنة عند رجلها -

---

১১৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪।
১১৮. সূরা আল আহকাফ : ১৫।
১১৯. সূরা লুকমান : ১৪।
১২০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।
১২১. সুবুলুস সালাম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।

"একবার জাহিমা রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাইতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার মা আছেন কি? জাহিমা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি মা-এর খিদমতেই লেগে থাক। কেননা, বেহেশত তারই পা-এর কাছে।"[১২২]

মা তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ, জন্মদান এবং স্তন্যদানের জন্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে সন্তানকে খোরাক, পোশাক, শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে-শাদী দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সিংহভাগ দায়িত্ব পিতার উপর অর্পিত। পিতা ঘাম পায়ে ফেলে আয়-রোজগার করেন আর মা ঘরে বসে সন্তানের লালন-পালনে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। ইসলাম পিতার এ অবদানকে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেছে। এ জন্যে পিতার বিশেষ মর্যাদার কথাও হাদীস শরীফে নানাভাবে এসেছে।

হযরত আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি–

الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فحافظ على الباب او ضيع -

"পিতা বেহেশতে প্রবেশের জন্যে সর্বোত্তম মাধ্যম ও দরজা। সুতরাং চাইলে বেহেশতের এ দরজাটিকে রক্ষা করতে পার, আর চাইলে একে নষ্টও করতে পার।"[১২৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

رضى الرب فى رضى الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد -

"আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত আছে।"[১২৪]

কাজেই, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা, তাঁদের সেবাযত্ন করা এবং তাঁদের মঙ্গল কামনা করা সন্তানের অপরিহার্য দায়িত্ব। পিতামাতার জীবদ্দশায় তাদের সুখ-শান্তির জন্যে এবং মৃত্যুর পরে তাদের নাজাতের জন্যে সন্তান সারাজীবন দুআ করতে থাকবে। পিতামাতার জন্যে কি দুআ করবে, আল্লাহ তাও সন্তানকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তুমি বল– رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"হে প্রভু! পিতামাতা শৈশবে যেরূপ মায়া-মমতা ও স্নেহ-দয়ার সাথে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, আপনিও তাদের উপর সেরূপ রহমত নাযিল করুন।"[১২৫]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন– رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

"প্রভু হে! আপনি হিসাব নিকাশের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং ঈমানদারগণকে ক্ষমা করে দিবেন।"[১২৬]

বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের সদাচার এমনি একটি দায়িত্ব যা পিতামাতার জীবদ্দশায়ই সীমিত নয়। বরং তাদের মৃত্যুর পরেও সন্তানের এ দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। তাঁদের মৃত্যুর পর সন্তান তাঁদের জন্যে দুআ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। তাকে এ দায়িত্ব আজীবন ভরেই পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে।

---

১২২. সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯।
১২৩. প্রাগুক্ত।
১২৪. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২।
১২৫. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪।
১২৬. সূরা ইবরাহীম : ৪১।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولى۔

"পিতার মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়জনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখাই তাঁর প্রতি ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"[১২৭]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় বনী সালমা গোত্রের একজন লোক এসে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন–

يا رسول الله هل بقى من بر ابوى شيئ ابرهما به بعد موتهما۔ قال نعم۔ الصلوة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل الابهما واكرام صديقهما۔

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পরেও কি তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্যে আমার কিছু করণীয় আছে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তাঁদের জন্যে দুআ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাঁদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করবে।"[১২৮]

আমরণ বাবা মায়ের আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে তাঁরা সন্তুষ্ট না হন, এ অসন্তুষ্ট অবস্থায়ই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যান, তবুও সন্তানের জন্যে রহমতের দরজা বন্ধ হয় না। সে যদি মৃত পিতামাতার জন্যে আজীবন দুআ করতে থাকে এবং মাগফিরাত কামনা চালু রাখে, তবে আল্লাহ তাকে পিতামাতার ভক্ত সন্তান হিসেবেই গণ্য করবেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

ان العبد ليموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعولهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا۔

"কোনো ব্যক্তি যদি তার বাবা মায়ের সাথে নাফরমানী করে এবং এ অবস্থায়ই যদি তাঁরা উভয়ে অথবা তাঁদের কোনো একজন মারা যান, তারপর সে যদি অব্যাহতভাবে মৃত বাবা মায়ের জন্যে দুআ ও মাগফিরাত কামনা করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে একজন নেককার বান্দা হিসেবে লিখে নিবেন।"[১২৯]

স্বামীর প্রতি কর্তব্য

সৃষ্টিরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করে থাকেন। এটা তাঁর সৃষ্টি কৌশলের একটা মৌলিক নীতি। এই নীতি মোতাবেক দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর উপরে স্বামীকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করেছেন। এর যৌক্তিক কারণও রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ স্ত্রীর তুলনায় স্বামীকে দৈহিক শক্তি, মানসিক বল, সাহসিকতা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা অধিক পরিমাণে দান করেছেন। এ কারণেই তিনি স্বামীকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দান করেছেন। তাই স্ত্রীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো স্বামীর আনুগত্য করা। [১৩০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

---

১২৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪।
১২৮. সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০৯।
১২৯. শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২।
১৩০. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

"পুরুষদেরকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে নারীদের উপর। এ কারণে যে, আল্লাহ একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আরো একটি কারণ এই যে, পুরুষেরা স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্যে নিজেদের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে।"[১৩১]

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, للرجال عليهن درجة 'নারীদের উপর পুরুষদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।'[১৩২]

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন–

لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها -

"আমি যদি কোনো মানুষকে অপর কোনো একজন মানুষকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকেই আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে।"[১৩৩]

তাই স্ত্রী সবসময় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এমনকি স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে কোনো ভাল কাজ করলেও তাতে কোনো লাভ হয় না। আল্লাহ তায়ালা সেই স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হন না। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন– ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة -

"যে স্ত্রী এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৩৪]

এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

والذى نفس محمد بيده لا تودى المرءة حق ربها حتى تودى حق زوجها -

"যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যে স্ত্রী স্বামীর হক আদায় করে না সে স্ত্রী আল্লাহর হকও আদায় করতে পারে না।"[১৩৫]

স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর আমানত। কাজেই সকল অবস্থায়ই সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলবে। বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সতীত্ব রক্ষার জন্যে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"নেককার স্ত্রীরা স্বামীদের অনুগত হয়ে থাকে। তারা স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন তা অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষা করে।"[১৩৬] এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে–

اى عليهن ان يحفظن حقوق الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على ازواجهن حيث امرهم بالعدل عليهن وامساكهن بالمعروف واعطاء من اجورهن -

"নারীদের কর্তব্য এই যে, তারা স্বামীদের অধিকার রক্ষা করবে এর বিনিময়ে যে, আল্লাহ নিজেই তাদের অধিকার তাদের স্বামীদের উপর সংস্থাপন ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্যেই তিনি পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পুরুষদেরকে তাদেরকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে আদেশ করেছেন এবং তাদের মহর আদায় করতে আদেশ করেছেন।"[১৩৭]

---

১৩১. সূরা আন নিসা : ৩৪।
১৩২. সূরা আল বাকারা : ২২৮।
১৩৩. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
১৩৪. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
১৩৫. সুনান ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।
১৩৬. সূরা আন নিসা : ৩৪।
১৩৭. মাহাসিনুত তাবীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৯।

বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন স্ত্রী লোক সবচেয়ে উত্তম?

قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها بما يكره۔

"উত্তরে তিনি বললেন, সেই স্ত্রীই উত্তম যাকে দেখলেই স্বামী সন্তুষ্ট হয়, যাকে স্বামী কোনো আদেশ দিলে সে তা প্রতিপালন করে, যে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে খেয়ানত করে না এবং স্বামী যা পছন্দ করে না এমন কোনো কাজ করে না।"[১৩৮]

বিনা প্রয়োজনে স্ত্রী কোনো ভিন্ন পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। বিশেষ কোনো জরুরী অবস্থা হলে যেমন স্বামীর অনুপস্থিতিতে কেহ বাড়িতে এসে যদি কোনো প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করে, তখন পর্দার আড়াল হতে অতি অল্প কথায় তার উত্তর দিবে। তবে এ অবস্থায় এমন মোলায়েম সুরে কথা বলবে না, যাতে আগত লোকটির মনে কোনো রকম দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

"তোমরা যদি ধর্মপরায়ণা নারী হয়ে থাক, তবে বেশি মোলায়েম সুরে কথা বলো না। কেননা, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে লোভ করতে পারে। কাজেই বিধিমতো কথা বল।"[১৩৯]

সাধারণত স্ত্রী স্বামীগৃহে অবস্থান করবে। কারণ ছাড়া বাইরে যাবে না। বিশেষ কোনো প্রয়োজন পড়লে স্বামীর অনুমতি নিয়ে অতি সাবধানে বাইরে বের হবে। নিজের রূপরাশি এবং অলংকারাদি যাতে অপরের দৃষ্টিগোচর না হয়, সেজন্যে ঢিলা কাপড়ে দেহ আবৃত করে বের হবে। কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার দরকার হলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"তোমরা নিজের ঘরে অবস্থান কর। জাহিলী যুগের নারীদের মতো বেশ বিন্যাস করে বাইরে বের হয়ো না।"[১৪০]
এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নী ও কন্যাদেরকে এবং ঈমানদার লোকদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন বাইরে অবস্থানকে অতিরিক্ত চাদর দিয়ে দেহকে ঢেকে রাখে।"[১৪১]

স্বামীর গৃহ পরিচালনায় স্ত্রীর দায়িত্ব

স্ত্রী স্বামীর ধন-সম্পদকে নিজের কাছে গচ্ছিত আমানত বলে মনে করবে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং কখনো অপচয় করবে না। সচরাচর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অর্থকড়ি খরচ করবে না। তবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজন হলে তার অনুমতি ছাড়াও খরচ করতে পারবে। এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

---

১৩৮. সুনান নাসায়ী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২; আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮২।
১৩৯. সূরা আল আহযাব : ৩২।
১৪০. সূরা আল আহযাব : ৩৩।
১৪১. সূরা আল আহযাব : ৫৯।

لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها -

"স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী স্বামী ঘরের কোনো কিছু খরচ করবে না।"[১৪২]

রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেছেন−

اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير اذنه فلها نصف اجره-

"স্ত্রী যখন তার স্বামীর অর্জিত অর্থ হতে তার অনুমতি ছাড়াই কিছু দান করে, এ জন্যে সে নিজেও অর্ধেক সওয়াবের ভাগী হবে।"[১৪৩]

ইমাম শাওকানী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, انه يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها بغير اذنه স্বামীর ঘর থেকে অনুমতি ব্যতিরেকেই অর্থসম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে−

ويمكن ان يقال ان النهى للكراهة فقط - وكراهة التنزيه لاتنا فى الجواز-

"আর যেসব হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সে নিষেধের মানে হারাম নয়, বরং বড়জোড় মাকরূহ। আর মাকরূহ তানযীহ জায়েয হওয়ার পরিপন্থী নয়।"[১৪৪]

স্ত্রী সাধারণত নিজ হাতে স্বামী গৃহের কাজকর্ম সম্পন্ন করবে, সন্তানদের যত্ন করবে এবং সকল বিষয়ে পরিবারের তত্ত্বাবধান করবে। হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে স্বামীর গৃহের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। রাসূল (স) বলেছেন−

المرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسؤلة عنهم-

"স্ত্রী স্বামীগৃহের পরিজনবর্গ এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১৪৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন−

رعاية المرأة حسن التدبير فى بيت زوجها والنصح له والامانة فى ماله وفى نفسها -

"স্ত্রী স্বামীগৃহে দায়িত্বশীলা হওয়ার অর্থ হচ্ছে স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর কল্যাণ কামনা করা ও তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেয়া এবং স্বামীর ধন-সম্পদ ও নিজের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।"[১৪৬]

রাসূল (স) আরো বলেছেন−

ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى على ابتنه فاطمة بخدمة البيت وعلى على ما كان خارجا من البيت من العمل-

"নবী (স) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর উপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর আলী (রা)-এর উপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব।"[১৪৭]

---

১৪২. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
১৪৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৭।
১৪৪. নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৯।
১৪৫. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৩।
১৪৬. মাহাসিনুত তাবীল, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৫।
১৪৭. মাহাসিনুত তাবীল, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৫।

স্ত্রী স্বামীর যে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে সদা তৎপর থাকবে। এমনকি স্বামী তার কোনো প্রয়োজনের জন্যে ডাকলে, স্ত্রী কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে। এ মর্মে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হযরত তালেক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন– اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور۔

"স্বামী যখন তার প্রয়োজনের জন্যে স্ত্রীকে ডাকবে, তখন সে চুলার কাছে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও তা রেখে দিয়েই স্বামীর নিকট চলে আসা উচিত।"[১৪৮]

স্বামীর ভালোবাসা, সদাচার, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদির জন্যে স্ত্রী সবসময় স্বামীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং এ সকল কাজের জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না, তার খারাপ পরিণতির কথা বর্ণনা করে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر زوجها۔

"আল্লাহ তায়ালা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, যে তার স্বামীর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না।"[১৪৯]

স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েই আল্লাহর ইবাদত আদায়ে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন–

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فان ابت نضح فى وجهها الماء ورحم الله امرأة من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت فى وجه الماء۔

"আল্লাহ সেই পুরুষকে রহমত করবেন, যে রাতে জেগে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আর আল্লাহ সেই স্ত্রীকে রহমত দান করবেন, যে রাতে জেগে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে তুলে। স্বামী যদি উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।"[১৫০]

স্বামীর আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলে স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় নির্ধারিত মহর কমিয়ে দিয়ে স্বামীর প্রতি ইহসান করবে। আর অভাবের কারণে স্বামী মহর পরিশোধ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হলে স্ত্রী তাকে ক্ষমা করে মহরের ঋণ হতে অব্যাহতি দিবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

"স্ত্রীরা যদি খুশী মনে মহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পার।"[১৫১]

স্বামী ইন্তেকাল করলে তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অন্তত চার মাস দশ দিন পর্যন্ত স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করবে না। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যায়, সেসব স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে বিবাহ ইত্যাদি হতে বিরত রাখবে।"[১৫২]

---

১৪৮. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
১৪৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৯।
১৫০. সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪।
১৫১. সূরা আন নিসা : ৪।
১৫২. সূরা আল বাকারা : ২৩৪।

কোনো আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক-দুঃখ করা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রসাধনী বর্জন করা জায়েয নেই। কিন্তু স্ত্রীদের জন্যে স্বামী সম্পর্কে এতই নাজুক যে, তা কেটে ওঠার জন্যে স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন–

لا يحف لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا -

"তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো স্ত্রীলোকের জন্যে কারো মৃত্যুর পর তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয নয়। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তার জন্যে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করা জায়েয আছে।"[১৫৩]

স্বামীর খেদমতে মহিলা সাহাবীদের দৃষ্টান্ত

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) রাসূলে করীম (স)-এর জিন্দেগীর মিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্যে তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর এজন্যে তিনি কোনোদিন এতটুকু আফসোসও করেননি। বরং নবী করীম (স) এ বিষয়ে কখনো কথা তুললে তিনি নিজেই তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন।

রাসূলে করীম (স)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) তাঁর স্বামীকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্যে নিজের গলার বহু মূল্যবান একটি হার বিনিময় মূল্য হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে রাসূল (স)-এর ভালোবাসা ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। একদিন হযরত আয়েশা (রা) রুপার তৈরী দস্তানা হাতে পরেছিলেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাতে কি পরেছ? তিনি বললেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্যে হাতে দস্তানা পরেছি। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় তিনি নিজ হাতে ধুয়ে দিতেন। তাঁর পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন। নিজ হাতে তিনি রাসূল (স)-এর চুল ও দাড়িতে চিরুণী করে দিতেন। তাঁর মিসওয়াক শুকনো থাকলে তিনি তা চিবিয়ে মুখের লালায় ভিজিয়ে মসৃণ করে দিতেন এবং সেটাকে তিনি নিজের সংরক্ষণে রাখতেন।

একদা হযরত খাওলা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি প্রত্যেক রাতে সুসাজে সজ্জিতা হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে স্বামীর জন্য দুলহান সেজে তার কাছে হাজির হই এবং তার পাশে গিয়ে শয়ন করি। কিন্তু তবুও আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না। সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছ থেকে এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তাকে বল, সে যেন তার স্বামীর আনুগত্য এবং মনস্তুষ্টি সাধনে সদা ব্যস্ত থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে প্রেম ও ভালোবাসার মাধুর্যপূর্ণ ভাবধারায় সঞ্জীবিত দেখতে চায়। কেননা প্রেম-ভালোবাসা, আদর-যত্ন এবং সোহাগ না থাকলে দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।[১৫৪]

সন্তান ধারণ ও লালন-পালনে মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব শিশুই তার মায়ের সন্তান। আল্লাহ তায়ালা মায়ের উপরই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, প্রসব করা এবং স্তন্য দান করার কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন। গর্ভধারণকালে দীর্ঘদিন যাবত মাকে কষ্টের পর কষ্ট বরদাশত করতে হয়। প্রসবকালে তাকে অশেষ ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করতে হয়। এজন্যে অনেক মাকে প্রাণও বিসর্জন দিতে হয়। তাছাড়া দুই বছর ধরে নিজের দেহ নিংড়ানো স্তন্য দিয়ে সন্তানকে দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এ কঠিন দায়িত্ব মাকে একাকী পালন করতে হয়। এতে পিতার কোনো অংশ নেই। এজন্যে ইসলাম মাকে অনন্য মর্যাদা দান করেছে। রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, সন্তানের জান্নাত হলো জননীর পায়ের নীচে।[১৫৫]

---

১৫৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

১৫৪. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-১৯।

১৫৫. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮; মাওলানা মুহাম্মদ তাহের, রমণীর মান, (ঢাকা : আল কাউছার প্রকাশনী, তা. বি.) পৃ. ৪৭।

সন্তানের প্রতি মা-এর প্রথম দায়িত্ব তাকে গর্ভে ধারণ করা। বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু আল্লাহর ইচ্ছায় এক মানব শিশু তার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করবে। সুতরাং এই মহান অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মাকে পূর্ব হতেই প্রস্তুত থাকতে হবে। সে তার দেহ, মন ও আত্মাকে সুস্থ, পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখবে। শান্তিময় এবং মনোরম পরিবেশে সন্তানকে গর্ভে স্থান দিবে। কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে তাকে গর্ভে ধারণ করবে। এ সময় সন্তানের খাতিরেই মাকে নিজের স্বাস্থ্যের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একটু অসতর্ক হলেই অকালে গর্ভপাত অথবা সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। এ সময়ে মনকে পবিত্র রাখার জন্যে সৎ চিন্তা করবে। কুরআন হাদীস এবং আদর্শ মুসলিম রমণীদের জীবনী পাঠ করবে বা শুনবে। কেননা এ সময়ে মায়ের যে মনোভাব থাকবে ভবিষ্যতে সন্তানের চরিত্রে তা প্রতিফলিত হবে। মা-এর এ কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন– حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ.

"কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন।"[১৫৬]

সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব হলো সন্তান প্রসব করা। এ দায়িত্ব বড়ই কঠিন। এটা মা-এর জীবন-মরণ সমস্যা। প্রসব যাতনা এতই তীব্র যে, এজন্যে অনেক প্রসূতিকেই প্রাণ দিতে হয়। তবু মাকে অম্লান বদনে এ কষ্ট সহ্য করতে হয়। মা-এর এ কঠিন অবস্থার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

"মা কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করে।"[১৫৭]

এরপর মায়ের দায়িত্ব হলো সন্তানকে লালন-পালন করা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হৃদয়ের দরদ এবং কোমল হাতের পরশ দিয়ে অতি যত্নের সাথে সন্তানকে প্রতিপালন করবে। কোনোরূপ ঘৃণা না করে নিজ হাতে তার মলমূত্র ও আবর্জনা সাফ করবে। তারপর কমপক্ষে দুই বছর যাবত নিজের দেহ নিংড়ানো স্তন্যদান করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

"জননীগণ পূর্ণ দু' বছর পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করবেন।"[১৫৮]

এরপর মা-এর দায়িত্ব সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়স না হলে সন্তানদের লেখাপড়া করার জন্যে কোনো বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না। এ সময়টির বেশির ভাগই তারা মা-এর পাশে কাটায়। এ সময় শিশুদের মন খুব কোমল থাকে। এ অবস্থায় যে কোনো শিক্ষাই তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। মা-এর কাছে যে কথা শিখে তাই হয় সন্তানের মাতৃভাষা। তার নিকট হতে যে আচার ব্যবহার শিক্ষা করে তাই হয় তার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয়। কাজেই মা সর্বপ্রথম সন্তানকে মুখে মুখে কালিমা তাইয়্যেবা এবং দীনী ইলমের প্রাথমিক সবক দিবে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে কথাবার্তা, উঠা-বসা এবং চালচলনে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকবে।[১৫৯]

---

১৫৬. সূরা লুকমান : ১৪।
১৫৭. সূরা আল আহকাফ : ১৫।
১৫৮. সূরা আল বাকারা : ২৩৩।
১৫৯. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

তারপর দুর্ভাগ্যবশত কোনো সন্তান শৈশবে পিতৃহারা হলে তাকে লালন-পালন, ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার যাবতীয় দায়িত্ব মাকেই গ্রহণ করতে হয়। নিজের জীবনের সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে তাকে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে এর বিনিময়ে আখিরাতে মা এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। এ সম্পর্কে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

"যে বিধবা নারী রূপ-লাবণ্য এবং মান-মর্যাদা থাকার পরও তার ইয়াতীম সন্তানদেরকে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে না এবং ইয়াতীম সন্তানদেরকে লালন-পালন করতে গিয়ে কষ্ট ও পরিশ্রমের দরুন তার চেহারা বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যায়, এমনকি ইয়াতীমেরা সংসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত কষ্ট করতেই থাকে, আমি এবং সেই বিধবা রমণী কিয়ামতের দিন এরূপ পাশাপাশি থাকবো। এই কথা বলে রাসূল (স) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।"[১৬০]

সন্তানের প্রতি মা-বাবার যৌথ দায়িত্ব

সন্তানের প্রতি মা ও বাপের যৌথ দায়িত্বও রয়েছে। যেমন নাম রাখা, আকীকা করা, জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয়া, বিয়ে দেয়া প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন–

حق الولد على الوالد ثلاثة اشياء ان يحسن اسمه اذا ولد ويعلمه الكتاب اذا عقل ويزوجه اذا ادرك -

"সন্তানের প্রতি মা-বাবার কর্তব্য প্রথমত তিনটি। সন্তানের জন্মের পরই তার জন্যে সুন্দর একটি নাম রাখা। জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে বিয়ে দেয়া।"[১৬১]

সন্তানের প্রতি মা-বাবার একটি যৌথ দায়িত্ব আকীকা দেয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى عنه ويحلق راسه -

"প্রত্যেকটি সন্তান তার আকীকার নিকট বন্দী। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে।"[১৬২]

ইমাম শাওকানীর (র) মতে–

العقيقة الذبيحة التى تذبح للمولود والعق فى الاصل الشق والقطع -

"আকীকা বলা হয় সেই জন্তুটিকে, যা সদ্যজাত সন্তানের জন্যে জবাহ করা হয়। এর মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাঙা ও কেটে ফেলা।"[১৬৩]

সন্তানের প্রতি পিতামাতার আর একটি যৌথ দায়িত্ব হলো তাদেরকে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেওয়া। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।"[১৬৪]

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রা) বলেন– علموا انفسكم واهليكم الخير وادبوهم -

তোমরা নিজেরা শেখ এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে কল্যাণকর রীতি-নীতি শিক্ষা দাও। আর তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।[১৬৫]

---

১৬০. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।
১৬১. আল জামেউ লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
১৬২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
১৬৩. নায়লুল আওতার, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৪।
১৬৪. সূরা আত তাহরীম : ৬।
১৬৫. ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

আত্মীয়স্বজন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অন্যতম নিয়ামত। তাই আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা একটি মানবীয় গুণ। তাই ইসলাম পরিবারের অন্তর্গত ও বহির্ভূত, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল শ্রেণির আত্মীয়ের সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখা এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। আত্মীয়তাকে আরবি ভাষায় 'রাহীম' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা একটি গুণবাচক নাম রাহমান। রাহমান ও রাহীম এ দুটি শব্দ একই ধাতু হতে উদ্ভূত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى - فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته -

"আমি আল্লাহ এবং আমি রাহমান। আমি রাহীম বা আত্মীয়তাকে সৃষ্টি করেছি। আর আমারই নাম হতে গঠন করে আমি এর নামকরণ করেছি। কাজেই, যে ব্যক্তি এর সাথে মিলিত থাকে আমিও তার সাথে মিলিত থাকি; আর যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক কর্তন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকি।"[১৬৬]

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

خلق الله الخلق - فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمن - فقال مه - قالت ها مقام العائذ بك من القطيعة - قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك - قالت بلى يا رب - قال فذاك -

"আল্লাহ যখন সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, রাহিম তখন দাঁড়িয়ে গেল এবং করুণাময় রাহমানের কোমর ধরে থাকলো। তখন আল্লাহ বললেন, থাম। রাহিম তখন বললো, এই তো আত্মীয়তা হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। মহান আল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে, আমিও যদি তার সাথে সম্পর্ক রাখি আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে, আমিও যদি তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করি, তবে কি তুমি খুশী হবে না? তখন রাহিম বললো, হে প্রভু! আমি অবশ্যই খুশি হব। তখন আল্লাহ বললেন, তবে তা-ই হবে।"[১৬৭]

সুতরাং, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত। যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে রাসূল (স) বলেছেন–

لا يدخل الجنة قاطع -

"আত্মীয়তা কর্তনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৬৮]

কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারন করে, তবে সে সম্প্রদায় আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم -

"যে গোত্র বা জাতির মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোক থাকে, সে গোত্র বা জাতির উপর রহমত নাযিল হয় না।"[১৬৯]

আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা এবং তাদের হক আদায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কোনো অবস্থায়ই তাদেরকে কষ্ট দিবে না এবং বিরক্ত করবে না। বিপদের সময় তাদেরকে সাহায্য করবে। আত্মীয়রা ভালো

---

১৬৬. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
১৬৭. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৫।
১৬৮. প্রাগুক্ত।
১৬৯. আল আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

ব্যবহার করুক আর না-ই করুক, তাদের সাথে সর্বাবস্থায়ই উত্তম ব্যবহার করবে। যদি কোনো আত্মীয় তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করে, তবু তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সে তোমাকে বঞ্চিত করলেও তুমি তাকে দান করবে। সে তোমার প্রতি অত্যাচার করলেও তুমি প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিবে। এই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তা।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان رجلا قال يا رسول الله ان لى قرابة اصلهم ويقطعونى واحسن اليهم ويسئون الى واحلم عنهم ويجهلون على فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك

"এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কয়েকজন আত্মীয় আছেন, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি অথচ তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে; আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে; আমি তাদেরকে বরদাশত করি অথচ তারা আমার প্রতি জুলুম করে। এ কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, তুমি যেমন বললে ব্যাপারটা যদি তদ্রূপই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি তো তাদের জন্যে বিরক্তির কারণ। তবে জেনে রাখ, যতদিন পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্যে সর্বক্ষণ একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত রয়েছেন।"[১৭০]

এ সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন–

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها -

"যে ব্যক্তি উত্তম ব্যবহারকারী আত্মীয়ের সাথে মিলিত হয়, সে প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয় বরং সেই প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও আত্মীয়দের সাথে মিলিত হয়।"[১৭১]

রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেছেন–

من احب ان يبسط له فى رزقه وينسأ له فى اثره فليصل رحمه -

"যে ব্যক্তি সচ্ছল জীবিকা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে।"[১৭২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, আত্মীয়দের পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে এক আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় থাকলে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুখী হয়। একে অপরের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির কারণে তাদের উন্নতির পথ সুগম হয়। রুজি-রোজগারে বরকত হয় এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তাদের জীবন কর্মময় ও আনন্দমুখর হয়। এ কথা সত্য যে, কর্মই মানুষের জীবন। কাজেই যে জীবন কর্মময়, মৃত্যুর পরও কর্মের মধ্যে দিয়ে তা জীবিত থাকে। এভাবেই তার স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই হচ্ছে আলোচ্য হাদীসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।[১৭৩]

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। একটি সমাজে জীবন যাপন করতে প্রত্যেককেই পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেউ এ অধিকার আদায় করতে অস্বীকার বা অবহেলা করলে সে মু'মিন বলে বিবেচিত হবে না এবং জান্নাতেও তার স্থান নেই।

---

১৭০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫।
১৭১. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬।
১৭২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৫।
১৭৩. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১১০।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে বিবেচিত হবে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম যুহরী (র) লিখেছেন– নিজ গৃহের সম্মুখের দিকে চল্লিশ ঘর, পেচনের দিকে চল্লিশ ঘর, ডান দিকে চল্লিশ ঘর এবং বাম দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে বুঝতে হবে।

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– প্রতিবেশী তিন প্রকার। এক শ্রেণির প্রতিবেশীর মাত্র একটি হক আছে, অপর এক শ্রেণির প্রতিবেশীর দু'টি হক আছে এবং আর একটি শ্রেণির প্রতিবেশীর তিনটি হক আছে। যে প্রতিবেশীর তিনটি হক আছে, সে আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে এক হক, মুসলিম হওয়ার জন্যে এক হক এবং আত্মীয় হওয়ার জন্যে এক হক। যে প্রতিবেশীর দু'টি হক আছে, সে মুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে এক হক। আর যে প্রতিবেশীর মাত্র একটি হক আছে, সে অমুসলিম প্রতিবেশী। শুধু প্রতিবেশী হওয়ার জন্যেই তার একটি হক।[১৭৪]

প্রতিবেশীর হক অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কি? যদি সে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাকে সাহায্য করবে, যদি সে ধার চায়, তাকে ধার দিবে। যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তার অভাব মোচন করবে। সে পীড়িত হলে তার শুশ্রূষা করবে। তার মৃত্যু হলে তার জানাযায় শরীক হবে। তার মঙ্গল হতে তাকে উৎসাহ দিবে। তার কোনো বিপদ হলে তাকে সহানুভূতি জানাবে। তার অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যাতে তার বায়ু বন্ধ হয়। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দিবে না। তুমি যদি কোনো ফল ক্রয় কর, হাদিয়াস্বরূপ তার জন্যে কিছু পাঠিয়ে দিবে, আর যদি তা না কর, তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে। তোমার সন্তানদেরকে তা নিয়ে বাইরে যেতে দিও না। কেননা এতে তার সন্তানগণ মনে ব্যথা পাবে। রন্ধনশালার ধোঁয়া দিয়ে তাকে কষ্ট দিও না, তবে তোমার রান্নাঘরে তৈরি খাদ্য যদি প্রতিবেশীর বাড়িতে কিছু পাঠাও তাহলে ক্ষতি নেই। এরপর নবী করীম (স) বললেন, তোমরা কি প্রতিবেশীর হক অবগত আছ? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ যার প্রতি করুণা করেন, কেবল সে-ই প্রতিবেশীর হক আদায় করতে পারে।[১৭৫]

মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র) প্রতিবেশীর হক বিশ্লেষণ করে বলেন, প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দিবে। প্রয়োজন ছাড়া তার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে বিরক্ত করবে না। তার অবস্থা সম্বন্ধে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে বিব্রত করবে না। তার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। অসুখ হলে তাকে দেখতে যাবে। তার দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হবে। তার আনন্দে তার সাথে শরীক হবে। তার দোষ-ক্রটি ক্ষমা করবে। ছাদের উপর হতে তার ঘরের ভেতরের দিকে তাকাবে না। তার দেয়ালের উপর তোমার কড়িবর্গা রেখে তাকে কষ্ট দিবে না। তার আঙ্গিনাতে পানি ফেলবে না। তোমার সীমানার ভেতর দিয়ে তার বাড়ির পানি বের হওয়ার জন্যে নর্দমা তৈরী করলে তা বন্ধ করবে না। তার বাড়িতে যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ করবে না। অপর কেউ তার ঘরে কিছু নিয়ে আসলে সেদিকে তাকাবে না, তার কোনো দোষ প্রকাশ হয়ে পড়লে তুমি তা ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবে। তার কোনো সমস্যা হলে দ্রুত তা দূর করার চেষ্টা করবে। তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ির তত্ত্বাবধান করবে। তার নিন্দাবাদ শ্রবন করবে না। তার বাঁদী দাসীদের প্রতি তাকাবে না। তার সন্তানদের সাথে স্নেহের স্বরে কথা বলবে। দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা সে জানে না, তাকে তা জানিয়ে দেবে।[১৭৬]

---

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন−

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না। আর মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন অনাথ-দরিদ্র, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে রয়েছে তাদের সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্ধত গর্বকারীকে ভালোবাসেন না।"[১৭৭]

অপরদিকে রাসূল (স) বলেছেন− لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔

"যার যন্ত্রণা হতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১৭৮]

রাসূল (স) আরো বলেছেন−

والله يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن۔ قيل من يا رسول الله۔ قال الذى لا يأمن جاره بوائقه۔

"আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, যার অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।"[১৭৯]

অপর একটি হাদীসে আছে− ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه۔

"সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশেই কোনো প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতর থাকে।"[১৮০]

احسن مجاورة من جاورك تكن مسلما۔

"তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তবেই তুমি মুসলিম বলে গণ্য হবে।"[১৮১]

خير الجيران عند الله خير هم لجاره۔

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী, যে তার অন্যান্য প্রতিবেশীর কাছে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।"[১৮২]

"এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা সম্পর্কে লোকেরা বলাবলি করে যে, সে খুব বেশি নামায পড়ে, বেশি রোযা রাখে এবং বেশি দান-খয়রাত করে, কিন্তু কটু কথা বলে তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূলে করীম (স) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। এরপর লোকটি বললো, হে আল্লাহ রাসূল! অমুক আর এক মহিলা সম্পর্কে লোকেরা বলাবলি করে যে, সে খুব কম রোযা রাখে, কম দান-খয়রাত করে এবং কম নামায পড়ে। বিশেষ করে তার দান-খয়রাতের পরিমাণ খুবই কম। তবে সে কটূক্তি করে তার প্রতিবেশীদের জ্বালাতন করে না। এ কথা শুনে নবী (স) বললেন, সে বেহেশতবাসী হবে।"[১৮৩]

---

১৭৭. সূরা আন নিসা : ৩৬।
১৭৮. আল আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২।
১৭৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৯।
১৮০. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩।
১৮১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
১৮২. আল আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২২।
১৮৩. প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৬৯।

"রাসূল (স) বলেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর হক আদায় সম্পর্কে উপদেশ দিয়েই চললেন, আর থামলেন না। এমনকি আমার মনে হলো যে, শীঘ্রই হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী করার নির্দেশ দান করবেন।"[১৮৪]

قال رجل للنبى ﷺ يا رسول الله كيف لى ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعت يقولون قد اسأت فقد اسأت ـ

"এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কেমন করে জানতে পারব যে, আমি ভালো কাজ করলাম, না মন্দ কাজ করলাম? তখন নবী (স) বললেন, তুমি যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছ, তখন বুঝবে সত্যিই তুমি ভালো কাজ করেছ। আর তাদের যখন বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ তখন বুঝবে সত্যিই তুমি মন্দ কাজ করেছ।"[১৮৫]

উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না, সে মু'মিন নয়, মুসলিমও নয়। তাই সে বেহেশতে যেতে পারবে না; তার ঠিকানা হবে দোযখ।

সমাজের প্রতি নারীর কর্তব্য

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দু'টি ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণি হলো পুরুষ মানুষ আর অপর শ্রেণি মেয়ে মানুষ। এই শ্রেণি বিভাগের কারণেই তাদের কর্মক্ষেত্রও ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। পুরুষের কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে আর নারীর কর্মক্ষেত্র ঘরের ভেতরে। তাই পুরুষকে করা হয়েছে বাইরের কর্মক্ষেত্রের কর্তা আর নারীকে করা হয়েছে ঘরের ভেতরের কর্মক্ষেত্রের কর্ত্রী। এ দু'টি কর্মক্ষেত্র নিয়েই যেমন হয় দুনিয়ার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড জীবন, তেমনি নর ও নারীর সম্মিলনেই হয় মানুষ ও মানুষের সম্পূর্ণতা।

এখান থেকে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে নারীদের উপর বাইরের কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কিন্তু তাই বলে তারা যদি পর্দা রক্ষা করে নিজেদের পারিবারিক স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার পরও সামাজিক কাজ করতে সমর্থ হয়, তবে তাতে কোনো বাধা নেই আর তার নিষেধও করা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। নারীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ঘরে। তাই বলে ঘরের চার প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে এবং অবরুদ্ধ জীবন যাপন করবে, ইসলাম তা চায় না। নারীদের উপর বাইরের সামাজিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই বলে কেউ যদি ঘরের ভেতরে নিজেদের প্রাথমিক ও স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পর পর্দা রক্ষা করে ঘরের বাইরের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, ইসলাম তাতে বাধ সাধবে না। এভাবে উভয় দিকের সাথে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই ইসলামের লক্ষ্য।[১৮৬]

জিহাদে অংশগ্রহণে নারীর উৎসাহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম নারীরা নিজেদের গৃহের কর্তব্যাদি পালন করার পর বহু সামাজিক কাজেও অংশগ্রহণ করেছেন, নিচে উদাহরণস্বরূপ কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো–

---

১৮৪. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯।

১৮৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭১।

১৮৬. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩০।

ইসলাম সাধারণত মহিলাদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করেনি। তবু বহু মহিলা সাহাবী স্বেচ্ছায় জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে পুরুষ মুজাহিদদের সেবা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (র) লিখেছেন–

وقد شهد خيبر مع رسول الله نساء من نساء المسلمين -

"বহু মুসলিম নারী রাসূল (স)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[১৮৭]

রুবায় বিনতে মুআওয়ায (রা) বলেন–

كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة -

"আমরা রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে যেতাম। সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং যুদ্ধে আহত ও নিহতদের মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।"[১৮৮]

উহুদের যুদ্ধে উম্মে 'আম্মারা নাম্নী এক আনসারী মহিলা পুরুষের মত বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। রাসূল (স)-এর প্রতিরক্ষায় তিনি যে অসীম ধৈর্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তার সাহসিকতার সাক্ষ্য দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

وما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونى -

"আমি ডানে ও বামে যে দিকেই তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই দেখছিলাম যে, উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণে লড়াই করছে।"[১৮৯]

উহুদের যুদ্ধে আহত সাহাবীদের সেবার জন্যে বহুসংখ্যক নারী সাহাবী যুদ্ধের পর মদিনা হতে সেখানে গিয়েছিলেন। তাবরানী (র) বর্ণনা করেছেন–

لما كان يوم احد وانصرف المشركون خرج النساء الى الصحابة يعينهم فكانت فاطمة فى من خرج -

"উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সাহাবীদের সাহায্যের জন্যে মহিলারা বের হয়ে পড়লেন। হযরত ফাতিমা (রা)-ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন।"[১৯০]

রাসূল (স)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন নারী সাহাবী বলেন–

كنا نداوى الكلمى ونقوم على المرضى-

"আমরা আহতদের ঔষধ দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।"[১৯১]

লক্ষণীয় যে, মুসলিম নারীরা কোনো চাপে পড়ে এ সব কাজ করেননি। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে নিজেদের সেবা ও খিদমত পেশ করতেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় গিফার গোত্রের কয়েকজন মহিলা রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন–

انا نريد يا رسول الله ان نخرج معك الى وجهك هذا فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا -

১৮৭. সীরাত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।
১৮৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।
১৮৯. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০১; ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।
১৯০. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।
১৯১. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে এই সফরে আমরাও বের হতে চাই। আমরা আহতদের চিকিৎসা করব এবং মুসলিম মুজাহিদদের সাধ্যমতো সাহায্য করব।"[১৯২]

দ্বীন রক্ষায় নারীর উৎসাহ প্রদান

জিহাদের ময়দানে নারীরা যেভাবে দীনের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তরবারি ও বর্শার দ্বারা অবদান রেখেছেন, তেমনি কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমেও তারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের আবেগময় ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা বহু লোককে জীবনের সব মূল্যবান সম্পদ অকাতরে দান করতে সহজ করে দিয়েছে।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে হযরত খানসা তাঁর চারটি সন্তানকে সাথে নিয়ে শরীক হয়েছিলেন। চার সন্তানকেই একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেগময় এক ভাষণ দিলেন। এরপর কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কাজ করার জন্যে সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"[১৯৩]

মায়ের মুখে এই দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে চার ছেলেই সমর সংগীত গাইতে গাইতে নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলো। এরপর চারজনের দেহই কেবল রক্তরঞ্জিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।[১৯৪]

রাসূল (স)-এর ফুফু উরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন–

كانت تعضد النبى ﷺ بلسانها وتحض ابنها على نصرته -

"ঈমান আনার পর তিনি রাসূল (স)-কে তাঁর কথা দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করতেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্যে তিনি নিজের ছেলেকেও উৎসাহিত করতেন।"[১৯৫]

উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আহত হলে তাঁর মা উম্মে 'আম্মারা তাঁর ক্ষতস্থানে মলম লাগায়ে পট্টি বেঁধে দিলেন। তারপর ছেলেকে বিশ্রাম করার পরামর্শ দেয়ার পরিবর্তে নির্দেশ দিলেন–

انهض بنى فضارب القوم -

"প্রিয় বৎস! উঠে দাঁড়াও এবং তরবারি নিয়ে মুশরিক কওমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।"[১৯৬]

উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা শহীদের বিরুদ্ধে কবিতা পড়লে হিন্দা বিনতে আমামা সাথে সাথে কবিতার মাধ্যমেই তার জবাব দিলেন।[১৯৭]

সত্য প্রকাশে নারীর ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম রমনীরা কেবল নিজেদেরকেই ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করেনি, বরং সমাজের যেখানেই তারা কোনো বিপর্যয় ও অবক্ষয় দেখেছেন সেখানেই তার পরিবর্তন ঘটিয়ে সেস্থানে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। ইবনে আবদুল বার (র) সামরা বিনতে নাহীক সম্পর্কে লিখেছেন–

---

১৯২. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

১৯৩. সূরা আলে-ইমরান : ২০০।

১৯৪. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২৮।

১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭৯।

১৯৬. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

১৯৭. আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

كانت تمر فى الاسواق وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها ـ

"তিনি বাজারে ঘোরাফেরা করতেন। লোকদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে বাধা দিতেন। তিনি হাতে একটি চাবুক রাখতেন এবং তা দিয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের প্রহার করতেন।"[১৯৮]

মুসলিম নারীগণ সত্য প্রকাশে রাজা-বাদশাহ বা শাসক-প্রশাসক কারো পরোয়া করেননি। তাদের ঈমানী আবেগ যেভাবে প্রকাশ্য দুশমনের মোকাবেলা করেছে তেমনি ইসলামের অনুসারীদের চিন্তা ও কর্মের বিপর্যয়ও মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ন্যায় ও সত্যের বাণীকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অতি বড় বাতিল শক্তিও যেমন তাদের জন্যে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি, তেমনি অত্যাচারী ও কঠোর শাসকদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি তাদের দমাতে পারেনি।

মুসলিম জাহানের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে শূলিবিদ্ধ করার পর তাঁর মা আসমার কাছে গিয়ে বললো, আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছিল। পরিণামে আল্লাহ তাকে এই কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত আসমা (রা) বললেন–

كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ثقيف كذابان ـ الاخر منهما شر من الاول ـ وهو انت ـ

"তুমি মিথ্যা বলেছ। সে পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করত, বেশি বেশি রোযা রাখত, অধিক মাত্রায় তাহাজ্জুদ পড়ত। আল্লাহর শপথ, রাসূল (স) বলেছেন, সাকীফ গোত্রে দু'জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। এদের পরবর্তীজন পূর্ববর্তীজনের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে এবং সে অধিক অত্যাচারী হবে। আর সেই দ্বিতীয় মিথ্যাবাদী হচ্ছ তুমি।"[১৯৯]

রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ প্রদান

তৎকালীন মুসলিম নারীরা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন।

একদা হযরত উমর (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে খাওলা বিনতে ছা'লাবার সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি হযরত উমর (রা)-কে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন–

'ওহে উমর! একসময় আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছিলাম। তখন তুমি ডাণ্ডা হাতে ছোট ছোট বাচ্চাদের ধমকাতে এবং ভয় দেখিয়ে বেড়াতে। সে সময় তুমি খুব ছোট ছিলে। অল্প বয়সের কারণে লোকেরা তোমাকে উমায়ের বলে ডাকতো। এরপর তুমি যৌবনে উপনীত হলে লোকেরা তোমাকে উমর বলে ডাকতে আরম্ভ করলো। এ অবস্থায়ও খুব বেশি দিন যায়নি। এখন তুমি আমীরুল মু'মিনীন হয়েছ। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তোমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। কাজেই এখন তুমি জনসাধারণের সাথে তোমার স্বভাবগত কঠোর আচরণ করো না। বরং আল্লাহকে ভয় করে চল। মনে রেখ, যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকে সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। আর যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে সে কখনো লাগামহীন জীবন-যাপন করতে পারে না। সে বরং সবসময় নেকী করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে।'

সেই সময় হযরত উমর (রা)-এর সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। তিনি খাওলাকে বললেন, তুমি তো দেখছি আমীরুল মু'মিনীনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করলে। হযরত উমর (রা) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান না, তিনি খাওলা বিনতে ছা'লাবা।[২০০]

---

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬৩।
১৯৯. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১।
২০০. আল ইসতি'আব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩১।

একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে লিখেছিলেন যে, আমাকে অল্প কথায় এমন কিছু উপদেশ দিন যা আমি সবসময় সামনে রেখে চলতে পারি। হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর এই বাণীটি লিখে পাঠালেন–

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس -

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ক্ষতি হতে রক্ষা করেন, মানুষ তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও মানুষের সন্তুষ্ট কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। সে তখন মানুষের হাতের পুতুল হয়ে যায়।"[২০১]

একদা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) বললেন, মহরানার পরিমাণ কম করে নির্ধারণ করো। এক মহিলা সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে বললেন, এ কথা বলার অধিকার তোমার নেই। কারণ কুরআনে আছে, "তোমরা যদি মহরানা হিসেবে স্ত্রীদেরকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থও ফেরত নিবে না।" কাজেই এ থেকে জানা যায় যে, মহরানার পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত উমর (রা) তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, একজন মহিলা উমরের বিরুদ্ধে বিতর্কে বিজয়ী হলেন।[২০২]

সৃষ্টজীবের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য

এই জগতে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। খলীফা হিসেবে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য অপরিসীম। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-গুল্ম, তরু-লতা, এমনকি নির্জীব পদার্থের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। কাজেই মানুষ কেবল মানুষের সেবা-যত্ন করলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তার সেবা-যত্নের বাহুকে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও সম্প্রসারিত করতে হবে। তবেই সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য পূর্ণতা পাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– الخلق عيال الله - فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله -

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে, সেই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম সৃষ্টি বলে গণ্য।"[২০৩]

রাসূল (স) আরো বলেছেন–

الراحمون يرحمهم الرحمن - ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء -

"রহমত প্রদর্শনকারী বান্দাদের প্রতি করুণাময় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অতএব, তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও, তাহলে ঊর্ধ্বজগতের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।"[২০৪]

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন–

غفر لامرأة مسيئة مرت بكلب على راس بئر يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فاوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفرلها بذلك -

"একদা একজন পতিতা এক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পেল যে, একটি কূপের পাশে একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে মরার মত হয়ে পড়ে আছে। এতে ঐ পতিতার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হলো। কিন্তু কূপ

২০১. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১।
২০২. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।
২০৩. শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।
২০৪. সুনান আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

হতে পানি তোলার জন্যে সেখানে কোনো বালতি ও রশি ছিল না। উপায়ন্তর না দেখে সে তখন নিজের পায়ের চামড়ার মোজা খুলে তাতে নিজের চাদর বেঁধে কূপ হতে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। কুকুরটির জীবন রক্ষা পেল। এই নেক কাজটির জন্যেই আল্লাহ তায়ালা পতিতার জীবনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।[২০৫]

একদা একজন সাহাবী একটি পাখীর ছানা হাতে নিয়ে রাসূল (স)-এর এর কাছে এসেছিল। ছানাকে দেখতে পেয়ে পাখীটি চারদিকে ঘুরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ঐ সাহাবীকে বললেন, যাও ছানাটি যেখানে ছিল সেখানে রেখে আস।

কোনো এক নবী (আ)-কে একটি পিপীলিকায় কামড় দিয়েছিল। তিনি তখন আদেশ দিয়ে পিপীলিকাদের আবাসস্থানটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তায়ালা ওহীযোগে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করলো আর তার জন্য তুমি তাদের পুরো আস্তানা পুড়িয়ে দিলে?

এমনকি অচেতন পদার্থের প্রতিও সদয় ব্যবহার করা উচিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক পদার্থের উপর 'রহমত' কথাটি অঙ্কিত করেছেন। উদ্দেশ্যে এই যে, মানুষ প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।[২০৬]

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

عرضت على النار فرايت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا-

"আমার সামনে জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি তাতে দেখতে পেলাম যে, বনী ইসরাঈলের এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে শাস্তিভোগ করছে। সে তার একটা পোষা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল এবং তাকে কিছু খেতে দিত না। আবার তাকে ছেড়েও দিত না যাতে সে পোকামাকড় খেতে পারে। এ অবস্থায় বিড়ালটি মারা গিয়েছিল।"[২০৭]

উপর্যুক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, অধিকার ও দায়িত্বের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ। যেখানে অধিকার আছে সেখানেই দায়িত্ব আছে। আর যেখানে দায়িত্ব আছে সেখানেই অধিকার রয়েছে। দায়িত্ব ছাড়া অধিকার আর অধিকার ছাড়া দায়িত্বের কথা চিন্তাই করা যায় না। কাজেই নারীর যেরূপ অধিকার আছে তেমনি তার দায়িত্ব আছে। ইসলাম নারীর অধিকার বর্ণনার সাথে সাথে তার দায়িত্বের কথাও বর্ণনা করেছে। এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন নারী জাতিকে তাদের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, নারীর যেটা অধিকার, পুরুষের সেটা দায়িত্ব। আর পুরুষের যেটা অধিকার, নারীর সেটা দায়িত্ব। সুতরাং উভয়েই যখন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে, তখনই সুখময় পরিবার এবং শান্তিময় সমাজ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

---

২০৫. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০৬।

২০৬. আখলাকে ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৮।

২০৭. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে খুযাইমা, (বৈরূত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সমাজ সেবায় মুসলিম নারীদের অবদান ও আত্মত্যাগ

ইসলামের সূচনা যুগে যে কয়জন ভাগ্যবতী মহিলা ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের নির্যাতন ভোগ করার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-এর মা হযরত সুমাইয়া আবু হুযাইফা ইবনে মুগীরার ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম কবুল করলে তাঁর মুনীব তার প্রতি রাগান্বিত হয়। ইসলাম বর্জন করার জন্যে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু কিছুতেই তিনি ইসলাম বর্জন করতে সম্মত হননি। নরপিশাচ আবু জাহল বল্লম নিক্ষেপ করে তাঁকে শহিদ করে দেয়। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সবপ্রথম মহিলা শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[২০৮]

রাসূলে করীম (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। আবু সুফিয়ান মেয়েকে দেখার জন্যে মদিনাতে রাসূল (স)-এর বাড়িতে আসেন। ঘরে নবী করীম (স)-এর বিছানা পাতা ছিল। আবু সুফিয়ান সেই বিছানার উপর বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবীবা (রা) তা গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফিয়ান মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে এই বিছানার উপর বসার উপযুক্ত মনে কর না? মেয়ে উত্তর দিলেন, এটা তো আল্লাহর রাসূলের বিছানা। একজন মুশরিককে এর উপর বসতে দিয়ে আমি এর পবিত্রতা নষ্ট করতে প্রস্তুত নই।[২০৯]

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ইসলাম কবুল করার পূর্বে তাঁর বোন হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ইসলাম কবুল করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উমর (রা) তাকে বেদম প্রহার করতে থাকেন। নির্দয় আঘাতে তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তিনি একবিন্দুও বিচলিত হননি। বরং এ নির্যাতনের জবাবে সেদিন তিনি বলেছিলেন–

يا ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنعه۔ فانی قد اسلمت۔

"হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার। তবে জেনে রাখ যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিছুতেই আমি তা পরিত্যাগ করব না।"[২১০]

তখন হযরত উমর (রা) তাঁর বোন ফাতিমার কাছ থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে দেখতে চাইলে তিনি বলেন–

يا ابن الخطاب انت لا تغسل من الجنابة وهذا لايمسه الا المطهرون.

"হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি তো জানাবাতের গোসল কর না। আর এটা এমনি একখানি গ্রন্থ যা একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিরা ব্যতীত আর কেউ স্পর্শই করতে পারে না।"[২১১]

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি যারা অপবাদ আরোপ করে, তাদের একজন ছিল মিসতাহ ইবনে উসামা। মায়ের ঈমানী দাবি পুত্রের এই ভ্রান্ত আচরণ মেনে নেয়নি। তিনি সর্বদা তার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ইবনে সাদ লিখেছেন–

كانت من اشد الناس على مسطح حين تكلم مع اهل الافك فى عائشة۔

---

২০৮. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।
২০৯. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।
২১০. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯।
২১১. আল মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

"মিসতাহ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সাথে জড়িয়ে পড়লে তার মা অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক কঠোরতা দেখিয়েছেন।"[২১২]

এক সময় হযরত আসমা (রা)-এর মুশরিক মা ফাতেমা বিনতে আবদুল উযযা মক্কা থেকে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে মদিনায় তাঁর বাড়িতে আসলেন। হযরত আসমা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, তিনি তাঁর মুশরিক মাকে তাঁর ঘরে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারেন কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তা করতে পার।[২১৩]

জিহাদে নারীর অবদান

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও হেফাজতের দায়িত্ব ইসলামী শরীয়ত নারীদের উপর সোপর্দ করেনি। তবুও দীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার মানসে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে এনে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড় করে দিত। পুরুষদের পাশাপাশি তারাও তখন কুফরের ঝাণ্ডাকে পদানত করার কাজে যোগ দিত।

হযরত উম্মে আম্মারা

মহিলা সাহাবী উম্মে আম্মারা উহুদের যুদ্ধে যোগদান করে পুরুষদের মতোই অতুলনীয় বীরত্ব, দুর্দমনীয় সাহসিকতা এবং অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন। রাসূল (স)-এর প্রতিরক্ষায় তিনি যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

وما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا راها تقاتل دونى -

"ডানে এবং বামে যেদিকেই আমি তাকাচ্ছিলাম, সেদিকেই আমি দেখছিলাম উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করছে।"

তাঁর দৃঢ়তার প্রশংসা করে রাসূল (স) আরো বলেছেন–

لقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان -

"আজ নুসাইবা বিনতে কা'ব উম্মে আম্মারা যে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তা অমুক অমুক পুরুষ যোদ্ধাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।"

তিনি উহুদ ছাড়াও খায়বর, হুনায়েন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাঁর একখানা হাতই শহীদ হয়ে যায়। এছাড়াও তাঁর দেহে তরবারি ও বর্শার বারোটি আঘাতের ক্ষত দেখা গিয়েছিল।[২১৪]

হযরত হাবীব ইবনে সালমা

রোমানদের সাথে জিহাদে হাবীব ইবনে সালমা (রা) অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ চলাকালে একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ হয় শত্রুদের সাথে সংগ্রামে ব্যস্ত অথবা জান্নাতে। তাঁর স্ত্রীও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বললেন, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, আশা করি আমিও আপনার সাথেই থাকব।[২১৫]

---

২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
২১৩. আত তাবাকাত, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।
২১৪. ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২০।
২১৫. আবু উসমান আমর ইবনুল বাহর আল জাহিয, আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরুত, দারুল ফিকর, তা. বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০।

হযরত উম্মে হাকীম

সৈন্যদের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ হয়, তাতে হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল-এর স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম (রা)-ও অংশগ্রহণ করেন। আজনাদায়েনের যুদ্ধে ইকরামা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এর কয়েকদিন পূর্বে মুরজে সিফার নামক স্থানে খালিদ ইবনে সাঈদ এর সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের দ্বিতীয় দিনে রোমানদের সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। নববধূর সাজে সজ্জিতা উম্মে হাকীম তাঁবুর একটি মোটা দণ্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একাই শত্রুসেনাদের সাতজনকে হত্যা করেন।[২১৬]

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) নাম্নী এক মহিলা সাহাবীর হাতে নয়জন রোমান সৈন্য নিহত হয়।[২১৭]

হযরত সাফিয়্যা (রা)

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম (স) নিরাপত্তার জন্যে মেয়েদেরকে একটি দুর্গের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। এরপর সুযোগ বুঝে এক ইহুদি দুর্গের প্রাচীরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (স)-এর ফুফু হযরত সাফিয়া (রা) অগ্রসর হয়ে ঐ ইহুদির মাথা কেটে দুর্গের পাদদেশে নিক্ষেপ করলেন। এ দেখে অন্যান্য ইহুদিরা বিস্মিত ও ভীত হয়ে দূরে চলে গেল।[২১৮]

হযরত উম্মে সুলায়েম (রা)

হযরত আনাস (রা)-এর মা উম্মে সুলায়েম (রা) উহুদ ও হুনায়নের যুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেন। রাসূল (স) তাঁকে এভাবে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কোনো মুশরিক আমার কাছে আসার দুঃসাহস দেখালে ছুরি দিয়ে আমি তার পেট চিরে দিব।[২১৯]

হযরত উম্মে হারেস (রা)

হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করছিল, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বীরযোদ্ধার সাথে উম্মে হারেস নাম্নী আনসার বংশের এক মহিলা সাহাবী অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পর্বতের মতো অটল থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।[২২০]

ইসলামের শত্রুদের ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যাপারে এমনিভাবে মুসলিম নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হয়েছেন। যেখানে তাঁরা নিজেদের হাতে অস্ত্রধারণ করেননি, সেখানে পুরুষদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। তাঁরা পুরুষদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে সাহস ও হিম্মত যুগিয়েছেন। তাঁরা জিহাদে আহত সৈনিকদের সেবা দিয়েছেন। মুজাহিদরা যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেলে তাদের তুলে নেয়ার কাজ করেছেন। তাঁরা মুজাহিদদের জন্যে খাবার তৈরি করে পৌঁছে দিতেন। পিপাসায় কাতর হলে তাঁদের পানি পান করাতেন। রাসূল (স)-এর সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক নারী সাহাবী বলেছেন–

كنا نداوى الكلمى ونقوم علي المرضى-

আমরা আহতদের জখম ব্যাণ্ডেজ করতাম এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।[২২১]

২১৬. আল ইসতিয়াব ফী আসামাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩২।
২১৭. আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৫।
২১৮. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০।
২১৯. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।
২২০. ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯; আল ইসতিয়াব ফী আসমাঈল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২৮।
২২১. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

রুবাই বিনতে মুআওয়ায

তিনি বর্ণনা করেছেন–

كنا نغزوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى الوم ونخدمهم ونرد القتلى والجر حى الى المدينة۔

"আমরা রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে যেতাম। সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং যুদ্ধে নিহত ও আহতদের মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।"[২২২]

হযরত উম্মে আতীয়া (রা)

তিনি বলেন–

غزوت مع رسول الله صلعم سبع غزوات اخلفهم فى رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوى الجرحى واقوم على المرضى۔

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। সেখানে আমি মুজাহিদদের সামানের তত্ত্বাবধান করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ঔষধপত্র দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা করতাম।"[২২৩]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন : খায়বরের যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে বহুসংখ্যক মহিলা সাহাবী যোগদান করেছিলেন। হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী, আম্মা এবং আরো পাঁচজন মহিলাও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁরা কি জন্যে এসেছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন–

يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به فى سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام وونسق السويق۔

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এজন্যে এসেছি যে, আমরা কবিতা পাঠ করব এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে প্রেরণা যুগিয়ে সাহায্য করব। আর আমাদের সাথে আহতদের চিকিৎসার জন্যে ঔষধপত্র রয়েছে। তীরন্দাজদের হাতে আমরা তীর তুলে দেব এবং মুজাহিদদের জন্যে চাতু বানাব।"[২২৪]

উহুদের যুদ্ধে অনেক সাহাবী আহত হয়েছিলেন। তাঁদের খেদমতের জন্যে মদিনা হতে অনেক মহিলা সাহাবী উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। তাবরানী বর্ণনা করেছেন–

لما كان يوم احد وانصرف المشركون خرجت النساء الى الصحابة يعنهم فكانت فاطمة فى من خرج۔

"উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সাহাবীদের সাহায্যের জন্যে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ল। হযরত ফাতেমা (রা)-ও তাদের সাথে ছিলেন।"[২২৫]

উম্মে সালিত (রা) নাম্নী এক আনসারী মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেন–

انها كانت تزفو لنا القرب يوم احد۔

"উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আমাদের জন্যে মশক ভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছিলেন।"[২২৬]

---

২২২. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪।
২২৩. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬।
২২৪. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
২২৫. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।
২২৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

সেদিন হুমনা বিনতে জাহাশও এ কাজ করেছেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন–

قد كانت حضرت احدا تسقى العطشى وتداوى الجرحى -

"তিনি উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি পিপাসার্তদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করতেন।"[২২৭]

ইবনে সা'দ উম্মে আয়মান সম্পর্কে বলেন–

وقد حضرت ام ايمن احدا وكانت تسقى الماء وتداوى الجرحى وشهدت خيبر مع رسول الله صلعم -

"উহুদ যুদ্ধে উম্মে আয়মান অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুজাহিদদের পানি পান করাতেন, আহতদের ঔষধপত্র দিতেন। তিনি রাসূল (স)-এর সাথে খায়বরেও শরীক হয়েছিলেন।[২২৮]

প্রতিরক্ষায় উৎসাহ দান

দীন ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজে মুসলিম মহিলাগণ যেমন তীর, বর্শা এবং তরবারি দ্বারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন, তেমনি কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমেও তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের আবেগময় এবং উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা ও ভাষণে বহুসংখ্যক লোক আল্লাহর দীনের জন্যে জান, মাল এবং যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রাসূল (স)-এর ফুফু আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা) সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার (র) বলেন–

فكانت بعد الإسلام تعضد النبى صلعم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بامره -

"ইসলাম কবুল করার পর তিনি তাঁর বাকশক্তি দ্বারা রাসূল (স)-কে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং তাঁর ছেলেকেও তিনি রাসূল (স)-কে সহায়তা করার জন্যে এবং তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহ প্রদান করতেন।"[২২৯]

তাঁর ছেলে তুলাইব (রা) মক্কার প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন রাসূল (স) তুলাইবসহ আরো কয়েকজন সাহাবী নিয়ে নামায পড়তেছিলেন। এমন সময় আবু জাহলসহ কয়েকজন মুশরিক সর্দার হঠাৎ তাঁদের আক্রমণ করে। সাহাবীরাও তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। তুলাইব (রা) অগ্রসর হয়েই আবু জাহলকে আহত করে ফেলেন। তাই মুশরিকরা তাঁকে ধরে নিয়ে বেদম মারধর করে। তখন এক ব্যক্তি তাঁর মা আরওয়াকে খবর দেয় যে, দেখ তোমার নির্বোধ ছেলে মুহাম্মদ (স)-এর পাল্লায় পড়ে কি নির্যাতন ভোগ করছে। এ কথা শুনে আরওয়া জবাব দেন–

خير ايام طليب يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله تعالى -

"তুলাইব যেদিন তার মামাতো ভাইয়ের প্রতিরক্ষার জন্যে দাঁড়ায়, সেটিই তার জীবনের সর্বোত্তম দিন। কারণ তিনি তো আল্লাহর নিকট থেকে সত্য দিন নিয়ে এসেছেন।"[২৩০]

আসল কথা হচ্ছে মহিলারা কোনো বাহ্যিক চাপে পড়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তাঁরা কোনোরূপ বৈষয়িক প্রলোভনে পড়েও করেননি। বরং তারা দীন ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সাহচর্যকে নিজেদের জন্যে মহা মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানজনক এবং আখিরাতে অশেষ কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কাজে যোগদান করতেন। এ কারণেই খায়বর যুদ্ধে যাত্রাকালে গিফার গোত্রের কয়েকজন মহিলা রাসূল (স)-এর কাছে এসে আরজ করলেন–

---

২২৭. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

২২৯. আল ইসতিয়াব ফী আসমাঈল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭৯।

২৩০. আল মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২।

انا نريد يا رسول الله ان نخرج معك الى وجهك هذا فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا-

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে চাই। আমরা সেখানে আহতদের ঔষধপত্র দিব এবং মুজাহিদদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে পারব।"[২৩১]

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) উহুদের যুদ্ধে আহত হলে তাঁর মা তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে বললেন–

انهض بنى فضارب القوم-

"স্নেহের বৎস আমার! উঠ এবং এই মুশরিক কওমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।[২৩২]

হযরত খানসা (রা) তাঁর চারটি সন্তানকে সাথে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁর চার পুত্রকে একত্র করে বললেন–

তোমরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং কারো জোর-জবরদস্তি ছাড়াই হিজরত করে মদিনায় এসেছ। আল্লাহর কসম, তোমাদের মা এক তোমাদের পিতাও এক। তোমাদের মা তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তোমরা এমনি এক পবিত্র মায়ের গর্ভজাত সন্তান। অতএব, তোমাদের কাজ-কর্মও তেমনি উত্তম ও উন্নতমানের হওয়া উচিত। তোমরা জান, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিনিময়ে মহান আল্লাহ কি পুরস্কার দিবেন। ভালো করে বুঝে নাও, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর চেয়ে চিরস্থায়ী আখিরাত অনেক উত্তম। আল্লাহ বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ঈমানদারগণ, বাতিলের মোকাবিলায় তোমরা ধৈর্যধারণ কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, কর্তব্য পালনে দৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"[২৩৩]

সুতরাং যুদ্ধ শুরু হলেই তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়। নির্ভয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। তুমুল লড়াইয়ের সময় তোমাদের লক্ষ্য হবে শত্রুদের নেতা ও সেনাপতি। এভাবে তোমরা গনীতমও লাভ করবে আর জান্নাত লাভের মর্যাদাও পাবে।

মায়ের আবেগময়ী উপদেশ পেয়ে সকাল বেলাই চার ভাই তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরপর তাঁদের রক্তরঞ্জিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।[২৩৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) যুদ্ধকালীন এক সংকটময় মুহূর্তে তাঁর মায়ের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তাঁর মা বললেন, বৎস! তুমি যদি ন্যায় ও সত্যের অনুসারী হয়ে থাক, তাহলে এজন্যে জীবন দেওয়া উত্তম কাজ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মায়ের এ ইচ্ছা ও আবেগ সমর্থন করলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করলেন।[২৩৫]

উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা মুসলিম শহীদদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করে কুৎসা রটাতে শুরু করলে হযরত আসমা (রা)-এর কন্যা হিন্দা কবিতার ভাষায়ই তার কঠোর জবাব দিয়েছিলেন।[২৩৬]

---

২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
২৩২. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।
২৩৩. সূরা আলে ইমরান : ২০০।
২৩৪. আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত : মাকতাবুল মা'আরিফ, ১৯৭৭), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০।
২৩৫. প্রাগুক্ত।
২৩৬. আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১।

সমাজের কল্যাণে সত্য প্রকাশ

রাসূল (স)-এর জামানায় স্ত্রীলোকেরা শুধু নিজেদেরকেই ন্যায় ও সত্যের উপর দৃঢ় রাখার চেষ্টা করেননি। বরং তারা সমাজের যেখানেই কোনো বিপর্যয় ও অবক্ষয় দেখেছেন, সেখানেই তার পরিবর্তন ঘটিয়ে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সামরা বিনতে নাহীক নাম্নী এক নারী সাহাবী সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার (র) বলেছেন–

كانت تمر فى الاسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها ـ

"তিনি বাজারে ঘোরাফেরা করতেন, লোকদের ভালো কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে বাধা দিতেন। তাঁর হাতে একটি চাবুক থাকত। তা দিয়ে তিনি মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের প্রহার করতেন।"[২৩৭]

সুমাইয়্যা একজন ক্রীতদাসী। জাহেলী যুগে তার মুনীব তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর জালিম ও স্বেচ্ছাচারী গভর্নর যিয়াদ ছিল তারই গর্ভজাত সন্তান। বেশ্যার সন্তান বলে তার কোনো পিতৃপরিচয় ছিল না। একদিন হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সামনে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, জাহেলী যুগে সুমাইয়্যার সাথে একবার হযরত আবু সুফিয়ান (রা)-এর যৌনমিলন হলে এই সন্তান জন্মলাভ করেছিল। এই সাক্ষ্যির ভিত্তিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাকে আবু সুফিয়ানের সন্তান এবং নিজের ভাই বলে গ্রহণ করেন। এতে যিয়াদ অত্যন্ত খুশী হয়। তার ইচ্ছা হয় যে, মুসলিম উম্মাহর মনীষীদের কাছে তার স্বীকৃতি হোক। এই উদ্দেশ্যে সে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখে। পত্রের শিরোনাম ছিল, "আবু সুফিয়ানের পুত্র যিয়াদের পক্ষ হতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নামে।" হযরত আয়েশা (রা) ইসলামবিরোধী এই কাজটি সমর্থন করলেন না। তিনি হযরত মুয়াবিয়ার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখালেন না এবং কঠোর ও অত্যাচারী গর্ভনর যিয়াদেরও পরোয়া করলেন না। তিনি পত্র-উত্তরে শিরোনাম লিখলেন– "উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার পক্ষ থেকে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান যিয়াদের নামে।"[২৩৮]

মুসলিম মহিলারা এ ব্যাপারে রাজা ও প্রজা বা শাসক ও শাসিত কারো পরোয়া করতেন না। স্বৈরাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে শূলে চড়িয়ে শহীদ করে। তারপর হাজ্জাজ এই শহীদ সাহাবীর মা হযরত আসমা (রা)-এর কাছে গিয়ে বলে– আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছিল। তাই তাকে এই কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আসমা (রা) তাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন–

كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما ـ والله لقد اخبرنا رسول الله صلعم ان سيخرج من ثقيف كذابان الاخر منهما شر من الاول وهو مبير ـ فاما الكذاب فقد رأيناه واما المبير فأنت هو.

"তুমি মিথ্যা বলেছ, আমার ছেলে বেদীন ছিল না। সে তার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করত, বেশি বেশি রোযা রাখত এবং অধিক মাত্রায় তাহাজ্জুদ নামায পড়ত। আল্লাহর শপথ, রাসূলে করীম (স) আমাদের বলেছিলেন, সাকীফ গোত্রে দুইজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তাদের পরবর্তীজন পূর্ববর্তীজনের চেয়ে অধিক অত্যাচারী হবে। কেননা সে অধিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এদের পূর্ববর্তীজন ছিল মুসাইলামা কায্‌যাব যাকে আমরা দেখেছি আর পরবর্তীজন হলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তুমি।"[২৩৯]

---

২৩৭. আল ইসতিয়াব ফী আসমাঈল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬৩।

২৩৮. আত তাবাকাত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১; আল্লামা ইবনুল আসীর, আত তারীখুল কামিল, (বৈরুত : দারু ইহইয়াতু তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

২৩৯. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১।

শাসকদের প্রতি উপদেশ ও পরামর্শ

বিদূষী মুসলিম নারীরা শাসক শ্রেণির লোকদের প্রতি প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন। তাঁরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এবং নিঃস্বার্থভাবে এ কাজ করতেন। সাধারণ জনতা তো বটেই রাষ্ট্রের প্রশাসকরাও তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ নিতেন। তাঁদের সমালোচনাকে তারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এ দ্বারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতেন।

একদা হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা) নাম্নী এক নারী সাহাবী হযরত উমর (রা)-কে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন–

"হে উমর, আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছি। তুমি ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখাতে। তখন তুমি খুব ছোট। তাই সবাই তোমাকে উমায়ের বলে ডাকত। এরপর যৌবনে পদার্পন করলে লোকেরা তোমাকে উমর বলতে আরম্ভ করল। এখন তুমি আমীরুর মু'মিনীন। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তোমাকে কোথা থেকে কোথায় এনেছেন। জনসাধারণের সাথে কঠোর ব্যবহার কর না। আল্লাহকে ভয় কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাবকে ভয় করে, সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। আর যার মৃত্যুর ভয় আছে, সে বেপরোয়া জীবন-যাপন করতে পারে না। সে বরং সবসময় নেক আমল করার সুযোগ খোঁজে।"

সেই সময় জারুদ আবদী হযরত উমর (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি খাওলাকে বললেন, তুমি তো দেখছি আমীরুল মু'মিনীনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ। হযরত উমর (রা) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে বলতে দাও। তুমি জান না, ইনি হলেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা।[২৪০]

একদা হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন, যা আমি চিরদিন সামনে রেখে চলতে পারি। হযরত আয়েশা (রা) তখন তাকে রাসূল (স)-এর বাণীটি লিখে পাঠালেন–

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الى الناس-

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট, মানুষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। মানুষ তখন তার সাথে যেমন খুশী তেমন ব্যবহার করে থাকে।"[২৪১]

একদা হযরত উমর (রা) বললেন, মোহরানার পরিমাণ কম করে নির্ধারণ কর। সঙ্গে সঙ্গে এক মহিলা প্রতিবাদ করে বললেন, আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যদি স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে প্রচুর পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাক, তা থেকে তোমরা সামান্য পরিমাণও ফেরত নিও না।" কাজেই এর বিপরীত কথা বলার অধিকার আপনার নেই। হযরত উমর (রা) নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, একজন মহিলা উমরের সাথে বিতর্ক করল এবং জয়লাভ করল।[২৪২]

---

২৪০. আল ইসতিয়াব ফী আসমাঈল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩১।

২৪১. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৯; মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিব্বান, (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১।

২৪২. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

মুসলিম মহিলারা দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। একবার একজন মহিলা হযরত উমর (রা)-এর নিকট জনৈক সরকারী কর্মচারীর জুলুমের অভিযোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করার ফরমান পাঠিয়েছিলেন।[২৪৩]

হজ্জের সময় একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি মুয়াবিয়া (রা)-কে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন−

يا معاوية قتلت حجر واصحابه وفعلت الذى فعلت - اما خشيت ان اخبأ لك رجلا يقتلك -

"মুয়াবিয়া, তুমি হাজর ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করেছ এবং যা করতে চেয়েছিলে তা করেছ। তোমার কি এ ভয় হলো না যে, তোমাকে গোপনে হত্যা করার জন্যে আমিও কোনো লোক নিয়োগ করতে পারি?"[২৪৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা ও ঘটনাবলি হতে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ মুসলিম নারীরা পর্যন্ত ইসলামী জীবন-বিধানের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের চিন্তায় কত উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা ইসলামী জীবনদর্শন এবং এর মূল্যবোধের উন্নতির জন্যে কত সচেতন ছিলেন। তাঁরা ইসলামের ন্যায় ও সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধির ব্যাপারে কত সজাগ ছিলেন।

সামাজিক কল্যাণে নারীর পরামর্শ

তৎকালীন মুসলিম সমাজের মহিলারা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন সমাজের কল্যাণ তাদের নিজেদের কল্যাণ আর সমাজের ক্ষতি তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। সমাজের প্রভৃতি উন্নতি-অবনতি এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের সাথে মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের কোনো ক্ষতি হলে তা থেকে নারীরা যেমন বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি সমাজের কোনো কল্যাণ সাধিত হলে তার সুফল তারা সমভাবেই ভোগ করে। এমতাবস্থায় সমাজের ভালো-মন্দ যে কোনো কাজ থেকে নারীদের দূরে রাখা যায় না।

বিয়ে-শাদী, খোলা-তালাক প্রভৃতি নারীদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, অন্য কেউ নিজের সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। এ সব বিষয়ে সব কিছুই করতে হবে তাদের মত, সম্মতি এবং পরামর্শের উপর ভিত্তি করে। এ সম্পর্কে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন−

لاتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن -

"একবার বিবাহিতা নারীকে বৈধব্য বা তালাকপ্রাপ্তির পর তার পরামর্শ ব্যতীত পুনরায় বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না।"[২৪৫]

অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন− لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن.

"ইয়াতীম মেয়েদের সাথে পরামর্শ না করে তাদের বিয়ে দিও না।"

রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেছেন− استشيروا النساء فى بناتهن -

"মহিলাদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।"[২৪৬]

সুতরাং জীবনের যেসব ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, সে সব ব্যাপারে তো তাদের মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মহিলাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল রাসূল (স)-এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি এবং স্থায়ী রীতি। এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন−

---

২৪৩. নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
২৪৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।
২৪৫. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১।
২৪৬. সুনান দারে কুতনী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

كان النبى صلعم يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالتى يأخذبه-

"রাসূল (স) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোনো কোনো সময় তারা এমন পরামর্শ দিত যা তিনি গ্রহণ করতেন।"[২৪৭]

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযা নামায পড়া হয়, ইসলামে প্রাথমিক পর্যায়ে সেভাবে পড়া হতো না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খ্রীস্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখতে পান। তিনি এ নিয়মে জানাযা পড়ার পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[২৪৮]

নারীদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নেয়া হতো। তাতে কোনো দিকই বাদ পড়েনি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল যে, এই বছর মুসলমানরা উমরাহ না করেই ফিরে যাবে। তাই রাসূল (স) সাহাবীদেরকে হুদাইবিয়াতেই ইহরাম খুলে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। সন্ধির এই শর্তে সাহাবীগণ খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা রাসূল (স)-এর আদেশ পালণে ইতস্তত করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) আফসোস করে ঘটনাটি হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট বললেন। তিনি সাহাবীদের মানসিকতা লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে রাসূলে (স)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কাউকে কিছু না বলে যা কিছু করার নিজেই করতে আরম্ভ করুন। তরপর দেখবেন তারা সবাই আপনার অনুসরণ করতে থাকবে। রাসূল (স) তা-ই করলেন। সাহাবীরা সবাই তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। কাজেই উম্মে সালামা (রা)-এর উপস্থিত বুদ্ধি অচলাবস্থার অবসান হলো।[২৪৯]

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর পরামর্শ দান

রাসূল (স)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইবনে শিরীন হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন–

ان كان عمر ليستشير فى الامر حتى ان كان ليستشير المرأة فريما ابصر فى قولها او الشىء يستحسنه فيأخذه-

"যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে হযরত উমর (রা) জ্ঞানী লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। এমনকি নারীদের সাথেও পরামর্শ করতেন। সেই পরামর্শে কোনো কল্যাণকর দিক দেখতে পেলে অথবা তাতে কোনো ভালো জিনিস থাকলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।"[২৫০]

হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) বলেছেন–

اسلمت الشفاء قبل الهجرة فهى من المهاجرات وبايعت النبى صلعم وكانت من عقلاء النساء وفضلاتهن وكان عمر يقدمها فى الراى ويرضيها ويفضلها-

"শিফা (রা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রাসূল (স)-এর নিকট বায়আতও করেছিলেন। তিনি বিবেক-বুদ্ধি ও মর্যাদার অধিকারিণী নারীদের অন্তর্ভুক্ত

২৪৭. ইয়ূনুল আখবার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

২৪৮. আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

২৪৯. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুশ শুরূত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০; আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী, আররাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ : খাদিজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন : ১৯ বেকটিড রোড, ফরেষ্ট গেইট, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ৩৮১।

২৫০. আস সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

ছিলেন। মতামত ও পরামর্শ গ্রহনের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং অন্যদের তুলনায় বেশী মর্যাদা দিতেন।"[২৫১]

হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও একই নীতি অনুসরণের বিবরণ লক্ষ করা যায়। এমনকি খলিফা নির্বাচনেও পুরুষদের ন্যায় নারীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত উসমানের পর কাকে খলিফা বানানো হবে এই মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং স্বীয় গোত্রের নেতা আহনাফ এ ব্যাপারে মতামত ও পরামর্শের জন্যে হযরত তালহা (রা) হযরত যাবায়ের (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যান। তাঁরা তিনজনেই হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাইয়াত হন।[২৫২]

এক কথায়, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইসলাম নর এবং নারীকে সম অধিকার প্রদান করেছে।[২৫৩]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান

এ পর্যায়ে নারীদের এমন কিছু ভূমিকার অবতারণা করা হবে যা থেকে আপনা আপনিই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীরা মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হতে এবং বহুবিধ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গ

হাদীস শরীফে আছে– "হযরত সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে এক বাদশাহর দরবারে এক বৃদ্ধ যাদুকর এসে বাদশাহকে বলল, আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, কাজেই আমাকে একটি ছেলে এনে দিন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখিয়ে যেতে পারি। বাদশাহ তাকে একটি ছেলে এনে দিল, যাকে সে যাদুবিদ্যা শিখাতে পারে।

ছেলেটির আসা যাওয়ার পথে একজন পাদ্রী থাকত। ছেলেটি পাদ্রীর নিকট বসত এবং তার কথা শুনত। পাদ্রীর কথাগুলো তার খুব ভালো লাগত। তাই সে প্রতিদিন যাদুকরের ওখানে যাওয়ার সময় পাদ্রীর নিকট গিয়ে বসে কিছু সময় কাটাত। একদিন ছেলেটি যাদুকরের কাছে গেলে (বিলম্বের অজুহাতে) সে তাকে প্রহার করল। ছেলেটি এ ব্যাপারে পাদ্রীর কাছে অভিযোগ করলে সে বলল, এবার যাদুকরের প্রহারের আশঙ্কা থাকলে তাকে বলবে, বাড়ি থেকে আসতে বিলম্ব হয়েছে। আর বাড়ির লোকজনের প্রহারের আশঙ্কা থাকলে তাদেরকে বলবে, যাদুকর আমাকে বিলম্বে ছুটি দিয়েছে। এভাবে তার দিন কাটছিল। সহসা একদিন পথে সে বিরাটকায় একটি জন্তু দেখতে পেল, যা মানুষের চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। তখন ছেলেটি মনে মনে বলল আজকে পরখ করব যাদুকর উত্তম না পাদ্রী উত্তম। তারপর সে একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে বলল; হে আল্লাহ! যাদুকরের মর্যাদার চাইতে পাদ্রীর মর্যাদা যদি তোমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় হয় তাহলে আমি যেন এ জন্তুটিকে হত্যা করতে পারি, যাতে লোকজন চলাচল করতে পারে। এ বলে সে পাথর নিক্ষেপ করে জন্তুটি মেরে ফেলল। এতে লোকজনের চলাচলের পথ সুগম হলো। তারপর সে পাদ্রীর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, বৎস! আজ থেকে তুমি আমার চেয়েও উত্তম। আর অতি সত্বর তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সে অবস্থায় তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না।

এক আল্লাহর বিশ্বাসী এই ছেলেটি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতে পারত এবং মানুষের যে কোনো রোগ নিরাময় করতে পারত। বাদশাহর এক অন্ধ সভাসদ একথা জানতে পেরে প্রচুর পরিমাণ উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এসে বলল, এ যা কিছু দেখছ এসব তোমার জন্যেই নিয়ে এসেছি, যদি তুমি আমাকে আরোগ্য

---

২৫১. আল ইসতিয়াব ফী ইসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬৮-৬৯।

২৫২. প্রাগুক্ত, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

২৫৩. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Lahore : The Ahmadiyyah anjuman Isha'at Islam, 1950. p. 643.

করতে পার। সে বলল, আমি কাউকে আরোগ্য করি না। বরং একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য করেন। কাজেই তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তাহলে আমি তোমার জন্যে তাঁর কাছে দোয়া করব, তাহলে তিনি তোমায় আরোগ্য দান করবেন। এরপর সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল এবং আল্লাহ তার রোগ নিরাময় করে দিলেন। তারপর সে নিত্যদিনের মত বাদশাহর দরবারে এসে বসলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার দৃষ্টি শক্তি কে ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার রব। বাদশাহ বলল, আমি ছাড়া তোমার অন্য রবও আছে? সে বলল, আমার ও আপনার রব তো আল্লাহ। একথায় বাদশাহ তাকে বন্দি করে শাস্তি দিতে লাগল, যতক্ষণ না সে বালকটির সন্ধান দিল। তখন সেই বালকটিকে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হলো। বাদশাহ তাকে বলল, বৎস আমি তোমার যাদু সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তুমি নাকি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত কর। আরো কত কি কর। সে বলল, আমি কাউকে রোগমুক্ত করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই রোগমুক্ত করেন। একথা বলায় বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে লাগল, যতক্ষণ না সে পাদ্রীর সন্ধান বলে দিল। এরপর পাদ্রীকে হাজির করে তাকে বলা হলো, তুমি তোমার দীন পরিত্যাগ কর। কিন্তু সে তা অস্বীকার করায় বাদশাহ করাত নিয়ে আসতে বলল। তার মাথার মধ্যখানে করাত রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো। এরপর বাদশাহর সভাসদকে হাজির করে তাকে বলা হল, তোমার দীন থেকে ফিরে এসো। কিন্তু সে তা অস্বীকার করায় তাকেও করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল।

এরপর সেই ছেলেটিকে হাজির করে তাকে বলা হলো, তোমার দীন পরিত্যাগ কর। কিন্তু সেও তা অস্বীকার করায় বাদশাহ নিজের কতিপয় অনুচরের হাতে তাকে সমর্পণ করে বলল, একে অমুক পর্বতে নিয়ে যাবে এবং একে সহ পর্বতশীর্ষে আরোহন করবে। ততক্ষণ সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো কথা অন্যথায় তাকে সেখান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। তারা ছেলেটিকে সাথে নিয়ে পর্বতশীর্ষে আরোহন করলে সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার মর্জিতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। তখন পাহাড়টি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল এবং তারা সকলে নিচে পড়ে গেল। এরপর ছেলেটি বাদশাহর কাছে আসলে বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সঙ্গীরা কি করল? সে বলল, তাদের শায়েস্তা করার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। এবার বাদশাহ আরেক দল অনুচরের হাতে তাকে সঁপে দিয়ে বলল, তোমরা একে ছোট নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। ততক্ষণে সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে তাহলে ভালো কথা অন্যথায় তাকে সেখানে নিক্ষেপ করে আসবে। তারপর তারা তাকে নিয়ে গেলে সে বলল اللهم اكفينهم بما شئت "হে আল্লাহ! যদি তোমার মর্জি হয় তাহলে তাদের অনিষ্টতা হতে আমাকে রক্ষা কর।" তখন তাদের নিয়ে নৌকা উল্টে গেলে তারা সাগরে ডুবে গেল এবং সে বাদশার কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সঙ্গীদের কি হলো? সে বলল, তাদের শায়েস্তা করার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। সে আরো বলল, আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমার কথামতো কাজ করবেন। বাদশাহ বলল, তোমার কথাটি কি? সে বলল, আপনি লোকজনকে একটি প্রান্তরে জড়ো করে আমাকে শূলে চড়াবেন, তারপর আমার থলে থেকে একটি তীর বের করে নেবেন। তা ধনুকে পুরে باسم الله رب الغلام এ ছেলেটির রব আল্লাহর নাম বলে আমার দিকে নিক্ষেপ করবেন। আপনি এভাবে করলে আমাকে হত্যা করতে পারবেন।

ছেলেটির কথামতো বাদশাহ খোলা প্রান্তরে লোকজন জড়ো করল। ছেলেটিকে শূলে চড়িয়ে তার থলে হতে একটি তীর নিয়ে নিল। তারপর "ছেলেটির রব আল্লাহর নামে" বলে তা ধনুকে পুরে তাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে তা তার কপালের পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হলো। ছেলেটি তীরবিদ্ধ স্থানে হাত রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

তখন উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল : أمنا برب الغلام "আমরা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।" এ কথা তারা তিনবার বলল। এরপর বাদশাহকে সেখানে এনে বলা হলো আপনি যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন আল্লাহর কসম তা সংঘটিত হয়েছে। সব লোক (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে। তখন বাদশাহ গলি সমূহের সংযোগ স্থলে একটি গর্ত খনন করার আদেশ দিল। গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হলো। এবার সে বলল, যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এ গর্তে নিক্ষেপ করা হবে অথবা তাকে বলা হবে, "তুমি এতে প্রবেশ কর।"

বাদশাহর লোকজন তাই করল। এক পর্যায়ে এক মহিলার পালা এল। তার সাথে একটি ছেলে ছিল। মহিলাটি গর্তে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল। তখন ছেলেটি তাকে বলল, "মা! ধৈর্য ধরুন, কেননা আপনি সত্যের উপরে আছেন।" (মুসলিম)[২৫৪]

রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারিনী মহিলাটি এভাবে আল্লাহর সত্য দীনকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁরই পথে আত্মোৎসর্গ করলেন।

রোগ-ব্যাধিতে নারীর ধৈর্য

আতা ইবনে রিবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) একদা আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দেব? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটি কে দেখ। একবার সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে আরজ করল, আমার মৃগীরোগ আছে। আমি আমার অজ্ঞাতে শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কা করি। কাজেই আপনি আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে একটু দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্য ধরতে পার। এতে তোমার জন্যে জান্নাত অবধারিত। আর তুমি চাইলে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়াও করতে পার। সে বলল, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে আরো বলল, আমি শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। সুতরাং আপনি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন, যাতে আমার সতর খুলে না যায়? তিনি তার জন্যে সেই দোয়াই করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৫]

ইবাদতে নারীর একাগ্রতা

"হাদীস শরীফে আছে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, অমুক, সে তার সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করছে। [মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, তারা মনে করেছিল, সে মহিলা রাত্রে নিদ্রা যায় না।] রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, রাখতো, সাধ্যানুযায়ী কাজ করাই তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাদেরকে বিরক্ত করেন না যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা বিরক্তি উৎপাদন কর।"[২৫৬]

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুই খামের মাঝখানে একটি রশি বাঁধা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রশি? সকলে বলল এটা যয়নাবের রশি। সালাত আদায়ের মাঝে ক্লান্তি এসে গেলে সে তাতে ঝুল খায়। তিনি বললেন, না এটা খুলে ফেল। আমাদের উচিত ক্লান্তিহীন সময়টুকুতে সালাত আদায় করা। আর ক্লান্তি এসে গেলেই বসে পড়া উচিত।"[২৫৭]

---

২৫৪. সহীহ আল মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, ২২৯ পৃ.।
২৫৫. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, ২১৮ পৃ.।
২৫৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ খণ্ড, পৃ. ১০৯।
২৫৭. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ২৭৮ পৃ.। সহী মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২ খন্ড, ১৮৯ পৃ.।

"উকবা ইবনে আমের (রা) তিনি বলেন, আমার বোন বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যাওয়ার মানত করলেন। এরপর আমাকে বললেন এ ব্যাপারে নবী (স) এর নিকট থেকে সমাধান চেয়ে নিতে। তাই আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে যেন কিছু পথ পায়ে হাঁটে ও কিছু পথ (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করে।"[২৫৮]

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে আরজ করল, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল কিন্তু সে তো মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর। কেননা তার ঋণ পরিশোধ অগ্রগণ্য।"[২৫৯]

উপর্যুক্ত হাদীসমূহে নারীদের বিভিন্ন ইবাদতে প্রবৃত্ত হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটা তো প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স) এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি নিষেধ করেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ও আবু দারদা (রা) প্রমুখের এবং তাদের মতো অন্যান্য পুরুষদের ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় মেয়েরা কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াই এ ধরনের কাজে সাড়া দিয়েছিলেন, যেমনটি সাড়া দিয়েছিলেন পুরুষরা। আল্লাহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

সমাজ সেবায় নারীর দান-সদকাহ

"ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঈদুল ফিতরে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তিনি পুরুষদের সারি ভেদ করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের পর্যন্ত পৌঁছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। রাবী বলেন .... তাদের অনেকেই দান করল। এরপর বিলাল (রা) তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এসে দেখ, আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক! এ মহিলারা বিলালের চাদরের উপর তাদের আংটি ও বাজুবন্দ নিক্ষেপ করেছে।"[২৬০]

"হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বের হয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত ও সালাম শেষ করে তিনি নামাযের স্থানে বসে থাকা লোকদের কাছে এগিয়ে আসতেন। প্রয়োজনীয় কোনো কথা স্মরণ হলে বলতেন। কোনো দরকারী বিষয় থাকলে আদশে করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা সাদকাহ করো। তোমরা সাদকাহ করো। সাদকাহ করো!! আর সাদকাহ করতেন বেশির ভাগ মহিলাই।"[২৬১]

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) সাদকার ক্ষেত্রে বলেছেন, ঐ সকল মহিলার অগ্রগামিতা, সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের অলংকারাদি দান করা ইত্যাদি থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দীনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল সুউচ্চ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতিও তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[২৬২]

---

২৫৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৪ খণ্ড, ৪১৯ পৃ.। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, ৭৯ পৃ.।
২৫৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, ৩৯৪ পৃ.।
২৬০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ১২০ পৃ.। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃ.।
২৬১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ২০ পৃ.।
২৬২. ফতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ১২১ পৃ.।

পিতামাতার প্রতি নারীর সদ্ব্যবহার

“আবদুল্লাহ ইবনে বুরাদাহ (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা এসে তাঁকে বলল, আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, এখন তিনি মারা গেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার দানের প্রতিদান অবধারিত। আর উত্তরাধিকার হিসেবে তুমি তা ফেরত পাবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর এক মাসের রোযা বাকি আছে, আমি কি তা আদায় করব? তিনি বললেন, তা আদায় কর। সে বলল, তিনি কখনো হজ্জ করেননি, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব, তিনি বললেন, হ্যাঁ তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ কর।’[২৬৩]

“হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমার মা হজ্জ করবেন বলে মানত করেছিলেন কিন্তু তা পালন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর। তোমার কি মনে হয়, যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত তাহলে তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে না? কাজেই আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধ কর। কেননা আল্লাহর প্রাপ্যই অধিকতর পরিশোধযোগ্য।”[২৬৪]

“ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মানতের রোযা রাখার পূর্বেই মারা গেছেন, এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করে দিলে তা কি পরিশোধ হতো? সে বলল হ্যাঁ, তাতো হতো। তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে রোযাও রাখা।”[২৬৫]

আল্লাহর প্রতি নারীর তাওয়াক্কুল

“হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক খনন কালে খুঁড়তে খুঁড়তে একবার অত্যন্ত শক্ত একটি পাথর বাঁধল। তখন সকলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, খন্দকের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন একটি পাথর বেধেছে। তিনি বললেন, আমি আসছি। এ বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। সে সময় তিন দিন থেকে আমরা সকলে অভুক্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) কোদাল হাতে নিয়ে শক্ত পাথরটির উপর আঘাত করলে তা ধুলা বালিতে পরিণত হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিন। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (স)-কে যেমন ক্ষুধার্ত দেখলাম তাতে আর ধৈর্য ধরা যায় না। তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু গম ও একটি বকরী আছে। আমি বকরীটি জবাই করলাম, আর আমার স্ত্রী গম পিষল। এভাবে (সবকিছু প্রস্তুত করে) একটি হাঁড়িতে গোশত রেখে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলাম। তখন খাসির টুকরা করা হচ্ছিল আর গোশতের হাঁড়িটি ছিল উনুনে। তা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমার বাড়িতে সামান্য কিছু খাদ্য আছে, আপনি এবং আরো দু’একজন লোক চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ আছে? আমি তা বললাম। তিনি বললেন, তা অনেক ও পবিত্র। তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল আমি না আসা পর্যন্ত সে যেন গোশতের হাঁড়ি ও রুটি চুলা থেকে না নামায়। তারপর তিনি বললেন, সকলে উঠে এস। মুহাজির ও আনসারগণ উঠে রওয়ানা হলেন। জাবের (রা) স্ত্রীর কাছে গিয়ে

---

২৬৩. সহী মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড ১৫৬ পৃ.।

২৬৪. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ৪ খণ্ড, ৪৩৬ পৃ.।

২৬৫. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, ৯৮ পৃ.। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৩ খণ্ড, ১৫৬ পৃ.।

বললেন, কি মুসিবত! রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজির ও আনসার সকলকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন। সে বলল, তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন তোমরা সকলে প্রবেশ কর কিন্তু ভিড় করো না।"[২৬৬]

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) বলেন, [জাবের (রা)-এর বক্তব্য, "সে বলল, তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা সকলে প্রবেশ কর।"] এখানে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং আর এক বর্ণনাকারী ইউনুস ইবনে বুকাইরের বর্ণনায় (মাগাযী অধ্যায়ের বর্ধিতাংশ) এতদসম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা রয়েছে। জাবের (রা) বললেন, আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম, আল্লাহই তা জানতেন। আমি বললাম, সামান্য এক 'সা' গম এবং একটি বকরী থেকে অনেক লোক এসে পড়েছে। এরপর স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, এ যে, শুনেছ, রাসূলুল্লাহ (স) খন্দক খননকারী সকলকেই নিয়ে তোমার নিকট এসেছেন! সে বলল, কেন? তিনি তোমার নিকট খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেননি? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আমাদের সামর্থ্যের কথা আমরা তাঁকে জানিয়েছি। এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) ভালো জানেন। তার একথায় আমার দুশ্চিন্তা দূর হলো। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এতে মহিলাটির পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬৭]

বিপদে নারীর ধৈর্যের পরিচয়

"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা শহীদ হলেন। সে ছিল ছোট কিশোর। তার মা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারেসা আমার হৃদয় কতটা দখল করেছিল তা আপনি জানেন। তার স্থান যদি জান্নাতে হয় তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাইতে থাকব। আর যদি অন্যরকম হয়, তাহলে বলুন আমি কি করব? অপর এক বর্ণনায় আছে, এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হলে, আমি কেঁদে শেষ হয়ে যাব।"[২৬৮] তিনি বললেন, দূর! অথবা বললেন, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? জান্নাত কি মাত্র একটি? জান্নাত তো অনেক। আর হারেসা "ফিরদাউস নামক জান্নাতে রয়েছে।"[২৬৯]

নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রমের হেফাযত

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ... একদা তিন ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ল। তারা একটা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। এ সময় পর্বত হতে একটি প্রকাণ্ড পাথর ধ্বসে সেই গুহার মুখে পড়ল। তিনি বলেন, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের কৃত সর্বোত্তম আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করব। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতামাতা ছিল। আমি প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে মেষ-বকরী চরাতাম। তারপর ফিরে এসে তাদের দুধ দুইতাম। এরপর সে দুধ নিয়ে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হতাম এবং তারা তা পান করতেন। তাদের পান করার পরে আমার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনকে পান করতে দিতাম। ঘটনাচক্রে একদিন আমার বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখলাম তাঁরা দু'জনই ঘুমিয়ে

২৬৬. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।
২৬৭. ফতহুল বারী : প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, ৪০১ পৃ.।
২৬৮. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ ৬ খণ্ড, ৩৬৬ পৃ.।
২৬৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, ৩০৬ পৃ.।

পড়েছেন। সে বলল, কিন্তু আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইলাম না। এদিকে ছোট ছেলেমেয়েগুলো ক্ষুধার যাতনায় আমার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এমনি করে রাত গড়িয়ে সকাল হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়েই এমনটি করেছিলাম তাহলে পাথরটি এ পরিমাণ সরিয়ে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আল্লাহ পাথরটি সরিয়ে দিলেন।

আর একজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি আমার চাচাতো বোনকে এত অধিক ভালোবাসতাম যতটা একজন পুরুষ কোনো নারীকে ভালোবাসতে পারে। (সহী মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃত জানাল। ইতিমধ্যে কোনো এক বছর দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে সে আমার কাছে এল।)[২৭০] সে বলল, তুমি আমাকে একশ দীনার না দেয়া পর্যন্ত তোমার কামনা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। এরপর আমি তা সংগ্রহের চেষ্টায় লেগে গেলাম। পরিশেষে তা সংগ্রহ করেও ফেললাম। এরপর যখন আমার বাসনা পূরণ করতে তার দু'পায়ের মাঝে বসেছি এমন সময় সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং অধিকার ব্যতীত আমার কুমারীত্ব নষ্ট করোনা। তখন আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়লাম। তুমি যদি মনে কর আমি অমনটা করেছিলাম কেবল তোমার সন্তুষ্টি কামনার্থে, তাহলে পাথরটিকে আর একটু সরিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আল্লাহ পাথরটির দুই তৃতীয়াংশ সরিয়ে দিলেন।

অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি এক "ফরক" (এক ফরক ১৬ পাউন্ড ওজনের সমান এবং তা আমাদের দেশের বর্তমান ওজনে হয় প্রায় ৭ কেজি।) খাদ্যের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। শেষে আমি তাকে উক্ত মজুরি পরিশোধ করতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। অগত্যা আমি সে 'ফরক' চাষাবাদে বিনিয়োগ করলাম। এক সময় তা দিয়ে রাখালসহ একটি গাভী ক্রয় করলাম। এরপর সেই ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য পরিশোধ কর। আমি বললাম ঐ যে গাভীটি রাখালসহ দেখতে পাচ্ছ, ওখানে যাও, কেননা ওগুলো তোমার। সে বলল, তুমি আমার সাথে বিদ্রুপ করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে বিদ্রুপ করছি না। কেননা ওগুলো আসলেই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর, আমি তোমার সন্তুষ্টির আশায় তা করেছিলাম, তাহলে পাথরের বাকীটুকুও সরিয়ে দাও। এরপর আল্লাহ তাদের পথ সম্পূর্ণ রূপে খুলে দিলেন।"[২৭১]

সত্য প্রকাশ করে নারীর অকপটে দোষ স্বীকার

"হযরত ইবনে আবি মুলাইকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা দু'জন নারী একটি ঘরে বসে চামড়া সেলাই করছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুটিরে লোকজন কথাবার্তা বলছিল। তারপর উক্ত মহিলা দু'জনের একজন বেরিয়ে এল। তার হাতে সুঁই ফুটে গিয়েছিল। সে অপর মহিলাকে এজন্য দায়ী করল। এরপর ব্যাপারটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষকে তার দাবি অনুযায়ী প্রদান করা হলে প্রতিটি গোত্রের রক্ত ও সম্পদ শেষ হয়ে যেত।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কাজেই তোমরা সে মহিলাকে উপদেশ দাও এবং তাকে এ আয়াত পড়ে শোনাও إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্যতম কিছু ক্রয় করে, এরপর তারা তাকে উপদেশ দিল। তখন সে অপরাধ স্বীকার করল।"[২৭২]

---

২৭০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৮ খণ্ড, ৮৯ পৃ.।

২৭১. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, ৩১৩ পৃ.। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, ৮৯ পৃ.।

২৭২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৯ খণ্ড, ২৮০ পৃ.।

"হযরত আবু হুরাইরাহ এবং যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি আল্লাহর বিধান মোতাবেক আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন কি? তারপর তার বিবাদী পক্ষের লোকটি উঠে দাঁড়াল। সে ছিল তার (বাদীর) জ্ঞানী। সে বলল, আমি সত্য বলছি আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করুন এবং হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি বল! তখন সে বলল, আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে মজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। তারপর আমি তার ফিদিয়া স্বরূপ একশ বকরী দান করেছি এবং একটি গোলাম আজাদ করেছি। এ সম্পর্কে বিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো একশ বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন এবং এ মহিলার শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে দেব। তোমার প্রদত্ত ফিদিয়া ও একশ বকরী এবং গোলামটি তুমি ফেরত পাবে। তোমার ছেলের শাস্তি হলো একশ বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন।"[২৭৩]

পাথর নিক্ষেপের শাস্তি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর তওবা

"হযরত 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, তাই আমাকে দণ্ডিত করুন। রাসূল (স) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং সে সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে আমার এখানে এসো। সে তাই করল। মহিলাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হলো। তারপর রাসূল (স)-এর আদেশক্রমে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো এবং তার জানাযা পড়া হলো। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি এ যিনাকারী মহিলার জানাযা পড়লেন? তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা মদিনার সত্তর জন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তাদের ক্ষমার জন্যে তা যথেষ্ট হতো। সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম তওবা কি তুমি করেছ।"[২৭৪]

"হযরত বুরাইদাহ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মায়েয ইবনে মালেক আসলামী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি যিনা করেছি। এখন আমার বাসনা হলো আপনি আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন পুনরায় সে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো তাকে ফেরত পাঠিয়ে তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, তোমরা কি তাকে অপ্রকৃতস্থ মনে করো? তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছো? তারা বলল, আমাদের জানা মতে, সে তো তোমাদের ভালো লোকদের অন্তর্গত একজন বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি। এরপর তৃতীয় দিন সে পুনরায় এলে তিনি আবার তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানালো যে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি এবং তার কিছু হয়নি। চতুর্থবার সে এলে, তার জন্যে একটি গর্ত খোঁড়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।

২৭৩. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১৫ খণ্ড, ২০৩ পৃ.। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, ১২১ পৃ.।
২৭৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, ১২০ পৃ.।

“রাবী বলেন, তারপর গামেদিয়াহ নাম্নী এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন সে আবার এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন? সম্ভবত আপনি মায়েযকে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর শপথ, আমি গর্ভবতী। তিনি বলেন, তাহলে আর নয়। এখনই চলে যাও। সন্তান প্রসবের পর এসো। সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে তাকে একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, এই দেখুন আমি তাকে প্রসব করেছি। তিনি বললেন, চলে যাও, তার দুধ ছাড়ানোর পর এসো। শিশুটির দুধ ছাড়ানো হলে সে তাকে নিয়ে এলো। তখন শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। সে এসে বলল, দেখুন হে আল্লাহর নবী! সেই সন্তান এখন দুধ ছেড়েছে। এখন খাদ্যও খেতে পারে। তারপর তিনি ছেলেটিকে জনৈক মুসলমানের হাতে সমর্পণ করলেন এবং তাঁর নির্দেশ মহিলাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে ফেলা হলো। এরপর তাঁর আদেশে লোকজন মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। খালিদ বিন অলিদ (রা) একখণ্ড পাথর নিয়ে এসে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলেন। এতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে লাগল। তিনি মহিলাকে গালাগালি করলেন। নবী (স) তা শুনে বললেন, থাম খালেদ, যার হাতে আমার প্রাণ নিবন্ধ তাঁর শপথ! এ মহিলা এমনভাবে তওবা করেছে যেভাবে তওবা করলে অন্যায়ভাবে কর উসূলকারীকেও ক্ষমা করে দেয়া হতো। তারপর তাঁর আদেশক্রমে মহিলার জানাযা পড়া হলো এবং তার লাশ দাফন করা হলো।”[২৭৫]

উপর্যুক্ত কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, চির অবহেলিত, নির্যাতিত, মর্যাদা ও অধিকার বঞ্চিত নারী জাতিকে একমাত্র ইসলামই পূর্ণ মর্যাদা সম্মান, ও অধিকার দান করেছে। স্ত্রী, কন্যা, মা, গৃহকর্ত্রী এবং সমাজ সদস্যা হিসেবে তাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের সম অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। নারীদের সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়েছে। নর-নারীর সম্পর্ক, সমতা এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করে পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিরাপত্তাহীনতা এবং পরাধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করে নারীদের জন্যে নিরাপদ ও স্বাধীন জীবন যাপনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছেদের নিয়ম-কানুন এবং পর্দার বিধান প্রবর্তন করে নারীর মান-সম্মান এবং শালীনতা সুনিশ্চিত করেছে। বস্তুত নারী জাতির যা কিছু প্রয়োজন, ইসলাম তা সবই পূরণ করে দিয়েছে।

---

২৭৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৫ খন্ড, ১২০ পৃ.।

অভিসন্দর্ভ-সারসংক্ষেপ

ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা শিরোনামে গবেষণালব্ধ এ অভিসন্দর্ভের সূচনাপর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মে নারী-জীবনের নানামুখী অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো প্রধান প্রধান ধর্মে নারীদের সার্বিক অবস্থাদি বর্ণনা করার পাশাপাশি সমসাময়িক পৃথিবীর নারীসমাজের অবস্থারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে বিভিন্নভাবে মাতৃজাতির প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, নিপীড়ন ও নির্যাতনেরই করুণ চিত্র দেখা যায়।

বেহেশত থেকে মানবজাতির বহিষ্কৃত হওয়ার মূল কারণ হিসেবে হাওয়া (আ)-কে চিহ্নিত করে ইয়াহুদী ধর্মে নারীজাতিকে মানবের জন্য অভিশাপ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। একই কারণ দেখিয়ে, খ্রিস্ট ধর্মে নারীকে শয়তানের দরজা বলে আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে– পুরুষের সেবারত থাকাই নারীর একমাত্র কর্তব্য। এ ছাড়াও খ্রিস্ট ধর্মে বিবাহিত জীবনকে অপ্রয়োজনীয় পাপাচার বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হিন্দু ধর্মে নারীর কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পিতৃসম্পদে নারীর কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। ধর্ম-কর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের কোনো অধিকার ছিল না। বেদপাঠ, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি ছিল নারীর জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। স্বামী যত বড় অন্যায় ও অবিচারকারীই হোক না কেন, বিবাহ হওয়ার পর তার কাছ থেকে নির্যাতিতা স্ত্রীর মুক্তিলাভের কোনো পথই উন্মুক্ত ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর আর কোথাও বিবাহের সুযোগ ছিল না। স্ত্রী যত অল্প বয়সীই হোক না কেন, পুনরায় বিবাহের কথা মুখে আনাও মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত হতো।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী সাক্ষাৎকে বিপদ উল্লেখ করে যথাসম্ভব নারী-সঙ্গকে বর্জন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নারী সংসর্গকে পবিত্রতা ও মোক্ষ লাভের অন্তরায় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়েই নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ধর্মের নামে গোঁড়ামির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় অবস্থায় জীবন-যাপন করছিল। তৎকালে আরব দেশে নারীদের সামগ্রিক অবস্থা ছিল আরো করুণ। কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করাকে তারা দোষের কাজ বলে মনে করত না। পুরুষরা তাদের ইচ্ছামতো অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করত। স্ত্রীদের কিছুই করার থাকত না। স্বামীর সকল অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হতো। স্বামী, পিতা, ভাই কিংবা পুত্র– কারো সম্পত্তিতে তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু করলেন, তখন তাদের সম্মুখে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতি-নীতিই প্রচলিত ছিল, যা মানবাত্মাকে স্বভাব-বিরুদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীতে এ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। অবশ্য নারীমুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তারা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিপক্ষে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এর পরিণাম এত বিপদসঙ্কুল ও আতঙ্কজনক হয়েছে যে, এর বর্ণনা দিতেও গা শিউরে উঠে। এর কুফল দর্শনে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও আজ শঙ্কিত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন এবং প্রমাদ গুণছেন। এছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা ও

চালচলনে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হওয়ার প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নারী তার আসল নারীত্বেরই বিনাশ সাধন করে ফেলেছে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আলেক্সিস ক্যারল তাঁর `Man the unknown` গ্রন্থে লিখেছেন– নারী ও পুরুষের মধ্যকার এ সব মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করার কারণেই নারী-স্বাধীনতার পতাকাবাহীরা দাবি করতে পেরেছে যে, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সমান হতে হবে। অথচ বাস্তবে এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নারীদেহের প্রতিটি কোষে তার নারীত্বের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, বিশেষ করে তার স্নায়বিক অবস্থা সম্পর্কে।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, নারী কখনো পুরুষ হতে পারে না এবং পুরুষও কখনো নারী হতে পারে না। উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী। এজন্য প্রকৃতি নারীকে যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছে তদনুযায়ী তার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাদের এক শ্রেণির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ আছে, যা অন্য শ্রেণির মধ্যে নেই। স্বভাবতই তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতির ধর্ম অনুযায়ী চললে ফল হবে এই যে, প্রত্যেক শ্রেণি তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং স্বীয় কর্মে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পুরো সুযোগ লাভ করবে। নারীর ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা মূলত প্রকৃতিকে পরিবর্তনের চেষ্টারই নামান্তর হবে। আর প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা অসম্ভব এবং এর পরিণাম হলো আত্মঘাতী।

ইসলামই সর্বপ্রথম আমাদের সামনে এ সূত্রটি পেশ করেছে যে, প্রকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা এবং বেঁচে থাকার বিষয়টি দুটি বিপরীতমুখী সত্তা অর্থাৎ নর ও নারীর সাহায্যে টিকে আছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রকৃতি এ দুটি শ্রেণির যাকে যে ধরনের কাজে লাগাতে চায়, তাকে ঠিক সেই ধরনের যোগ্যতাও দিয়েছেন। তাই নর ও নারীর সত্যিকার পূর্ণতা হলো প্রকৃতির ইচ্ছা পূরণে নিজেদের সবটুকু যোগ্যতা ব্যয় করা।

ইসলাম নারীর ভাগ্যকে পুরুষের করুণার ওপর ছেড়ে দেয়নি। পুরুষ যদি আল্লাহর ভয়ে নারীর প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করা থেকে বিরত নাও থাকে, তথাপি নারীকে ক্ষতি বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ, ইসলাম আইনের দিক দিয়েও নারীর সার্বিক সুযোগ-সুবিধাকে সংরক্ষণ করেছে। কাজেই প্রকৃতিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সে কখনও মজলুম হবে না কিংবা দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার শিকারও হবে না। ইসলামী আইনে সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের ন্যায় নারীর সব অধিকার সুনিশ্চিত।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দিকে পৃথিবীর সর্বত্র যখন নারী উপেক্ষিত ও নির্যাতিতা ছিল, সেই সময় আবির্ভূত হন বিশ্ব-শান্তির মূর্তপ্রতীক হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানব-সমাজের জন্য অহিতকর যাবতীয় রীতিনীতি ও কুসংস্কার দূরীভূত করে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধন। তিনি দেখতে পেলেন, নারীজাতি চরম অবহেলিতা, নিপীড়িতা। তাদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে ওহী পাঠালেন। আল্লাহ পাকের ঐশী নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্ভুল হিদায়াত ও দিক্‌নির্দেশনার ফলে নারীরা শুধু নির্যাতন থেকেই মুক্তিই পেল না, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকারও লাভ করল এবং মর্যাদার চরম শিখরে উন্নীত হলো।

মহান আল্লাহর নির্দেশে কন্যা-সন্তানকে হত্যা করা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। বলা হলো, যে পিতা কন্যা-সন্তানকে জীবিত কবর দেবে না, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করবে না এবং পুত্র-সন্তানকে কন্যা-সন্তানের ওপর প্রাধান্য দেবে না, তার স্থান হবে জান্নাত। স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশ হলো, নর ও নারী একে অপরের অংশবিশেষ। নারী নরের ভূষণ আর নর নারীর ভূষণ। উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সমান সমান। মায়ের সম্মান ও মর্যাদাকে সবার উপর স্থান দিয়ে ইসলামের ঘোষণা হলো, জননীর পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। আরও বলা হলো, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের সদাচরণ করার অধিকার বাবার তুলনায় মায়ের জন্য তিনগুণ বেশি।

অর্থ-সম্পদ থেকে চিরবঞ্চিত নারীর জন্য পিতামাতা, স্বামী, সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সম্পদে অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। সর্বাবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীও সম্পদের অধিকার লাভ করে থাকে। ইসলাম বিয়েশাদির ব্যাপারে মেয়েদেরকে তাদের নিজস্ব মতামত দানের একচ্ছত্র অধিকার দিয়েছে।

বহু-বিবাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একজন পুরুষ একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে প্রয়োজনে ন্যায়বিচারের শর্তসাপেক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না।

ইসলাম ঘোষণা করেছে, বিয়ের সময় স্ত্রীকে সাধ্যানুযায়ী মহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক এবং স্ত্রীই মহরের একমাত্র মালিক। এতে আর কারও কোনো অধিকার নেই। এছাড়াও ইসলাম বৈধব্য, তালাক কিংবা খোলা তালাকের কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন নারীকে পুনরায় বিবাহ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

নারীর খোরাক, পোশাক, বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা পুরুষের দায়িত্ব। এসব ব্যাপারে কন্যার দায়িত্ব পিতার ওপর, স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর ওপর, মায়ের দায়িত্ব ছেলের উপর এবং বোনের দায়িত্ব ভাইয়ের ওপর অর্পিত হয়েছে।

ইসলামে নারীর জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ঘরে-বাইরে সর্বক্ষেত্রেই তার কর্ম করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তবে তার সাধারণ কর্মক্ষেত্র হলো গৃহ। গৃহের ভেতর অবস্থান করে সংসারের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পাদন করাই নারীর প্রধান দায়িত্ব। প্রয়োজনবোধে তার বাইরে যাওয়ারও অনুমতি আছে। কিন্তু শালীনতা বজায় রাখার জন্য পর্দারক্ষা করে বাইরে যেতে হবে। নারীকে রুজি-রোজগার করে অর্থোপার্জনের অধিকারও দিয়েছে ইসলাম। উপার্জিত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদে তার পূর্ণ মালিকানা স্বীকৃত। তার এ সম্পদে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ দানে ইসলাম নারীকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের অধিকার রয়েছে। নারীদের কল্যাণ ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারী প্রতিনিধিকেও ইসলাম সমর্থন করে। এছাড়া ইসলাম নারীকে প্রয়োজনীয় সর্ববিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের অধিকার দিয়েছে। অনেক মহিলা সাহাবী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অনেকে শিক্ষিকার দায়িত্বও পালন করতেন।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও দেশে উপেক্ষিতা, অবহেলিতা, নির্যাতিতা এবং অধিকার-বঞ্চিতা নারীরা একমাত্র ইসলামেই তাদের মুক্তির সন্ধান দেখতে পাবে। ইসলাম নারীর মান-মর্যাদা

সুনিশ্চিত করেছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকসহ জীবনের সকল পর্যায়ে নারীর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম। শৈশবে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

নারীদের স্বাধীনতা, সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষাসহ সার্বিকভাবে সুস্থ ধারার জীবন গঠনের জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরিবেশের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। রাসূলে করীম (স) মহিলাদের পৃথকভাবে শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ আদর্শের ভিত্তিতেই আমাদের সমাজে নারীশিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সহশিক্ষা-ব্যবস্থা নারী-পুরুষ কারো জন্যই হিতকর নয়। তাই পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত সর্বস্তরে স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিক্ষার সর্বস্তরে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার আবশ্যিক পাঠ্যসূচি থাকতে হবে।

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী নারীর মর্যাদা উদ্ধার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নারীদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্র ঘর থেকে বের করে এনে পুরুষের কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ তাদের জন্য সঠিক কোনো স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে তাদের সমস্যার কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়নি। বরং তাদের সমস্যাবলি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। তাদের মান-ইজ্জত এখন ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। এমনকি তাদের জীবনও মারাত্মকভাবে হুমকিতে পড়েছে।

নারী-সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। নারীদের মর্যাদা সংরক্ষণে এবং অধিকার উদ্ধারের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা পেশ করেছে, তার কোনো বিকল্প নেই।

এ অভিসন্দর্ভে নারীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত নীতিমালা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানব-সমাজ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত হলে নারীজাতির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে। সারা বিশ্ব ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে– এটাই প্রত্যাশা।

গ্রন্থপঞ্জি

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
	আল কুরআন ও তাফসীরুল কুরআন	
০১	ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর	তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০১৩)
০২	আবু বকর আল জাসসাস, আহকামুল কুরআন	(লাহোর : সুহায়েল একাডেমী, ১৯৯১)
০৩	কাজী নাসীরুদ্দীন আবু সাঈদ উমর আল বায়জাবী	আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, (ভারত : দারুল ফিরাস লিন নাশর, তা.বি.)
০৪	মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী	তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, (লাহোর : মাকতাবাতু উসমানিয়া, ১৯৮২)
০৫	আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী	আল বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.)
০৬	আবুল হাসান আলী ইবনে হাবীব আল মাওয়ারদী	আন নুকাত ওয়াল উয়ুনু-তাফসীরুল মাওয়ারদী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.)
০৭	শাইখ মুহাম্মদ আলী আস সাবূনী	সাফওয়াতুত তাফাসীর, (সৌদিআরব : দারুস সাবূনী, ২০০৩)
০৮	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয	তাইসীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, (ঢাকা : দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭)
০৯	হযরত ইবনে আব্বাস (রা)	তানবীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাস, (করাচী : খাদীমী কুতুবখানা, তা.বি.)
১০	সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ	ফী যিলালিল কুরআন, অনুবাদ : হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ, (লন্ডন : আল কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮)
১১	শিহাবুদ্দীন আল আলূসী	রূহুল মায়ানী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০)
১২	আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাসেমী	মাহাসিনুত তাবীল, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০)
১৩	মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আল মাযহারী	আত তাফসীরুল মাযহারী, (পাকিস্তান : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৪১২ হি.)
১৪	মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী	তাফসীরে উসমানী, অনুবাদ মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬)
১৫	ইমাম আবুস সউদ মুহাম্মদ আল আমাদী	তাফসীরে আবিস-সউদ, (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.)
১৬	ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী	তাফসীরুস্ সমরকন্দী বাহরুল উলূম, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা. বি.)
১৭	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী	আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, (মিশর : দারুল কুতুব, ২০১১)
১৮	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	তাফসীরে মাজেদী, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪)
১৯	আবু জাফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী	জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআন, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ২০০০)
২০	ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী	আত তাফসীরুল কাবীর (মাফাতীহুল গাইবি), (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হি.)
২১	আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ আল খাযেন	তাফসীরুল খাযেন, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪)
২২	আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর জারুল্লাহ আয যামাখশারী	তাফসীরে কাশশাফ, (আল কাশশাফ আন হাকায়েকে গাওয়ামিযিত তানযীল), (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.)
২৩	আবু বকর ইবনুল আরাবী	আহকামুল কুরআন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
২৪	শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	তাফসীরুল মানার, (মিশর : আল হাইআতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৩)
২৫	শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আল আলুসী	তাফসীরে রূহুল মায়ানী, (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৯)
২৬	সাইয়্যেদ কুতুব	তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, (মিশর : দারুশ শারূক, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৮)
২৭	শাইখ মুহাম্মদ আলী আস সাবূনী	রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, (মিশর : আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৭)
২৮	আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ আসীরুদ্দীন আল আন্দালূসী	তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪২০ হি.)
২৯	তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন	অনুঃ মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০)
	আল হাদীস ও শরহুল হাদীস	
৩০	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী	সহীহ আল বুখারী, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.)
৩১	শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ	মিশকাতুল মাসাবীহ, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.)
৩২	আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস	সুনান আবু দাউদ, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.)
৩৩	আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ দারেমী	সুনানুদ দারেমী, (করাচী : কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.)
৩৪	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী	জামিউত তিরমিযী, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি.)
৩৫	আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী	আল মুসতাদরাক, (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.)
৩৬	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	সহীহ মুসলিম, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি)
৩৭	আহমাদ ইবনুল হুসাইন আবু বকর আল বায়হাকী	আস সুনানুল কুবরা, (মক্কা : মাকতাবাতু দারুল বায)
৩৮	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল কাযবীনী	সুনান ইবনে মাজাহ, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ তা.বি.)
৩৯	মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী	সুনান আত তিরমিযী, (বৈরূত : দারুল গারব আল ইসলামী, ১৯৯৮)
৪০	মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান	সহীহ ইবনে হিব্বান, (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩)
৪১	মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাকেম	আল মুসতাদরাক, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বর্ধিত সংস্করণ, ২০১০)
৪২	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল কাযবীনী	সুনান ইবনে মাজাহ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০১০)
৪৩	আহমদ ইবনে হোসাইন আল বাইহাকী	শুআবুল ঈমান, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০)
৪৪	খলীল আহমদ সাহারানপুরী	বযলুল মজহুদ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪)
৪৫	আবু সুলাইমান হামদ আল খাত্তাবী	মালিমুস সুনান, (মিশর : আল মাতবাআতুল ইলমিয়্যাহ, ২০১০)
৪৬	মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী	নাইলুল আওতার, (মিশর : দারুল হাদীস, ১৯৯৩)
৪৭	নাসিরুদ্দীন আলবানী	আসসিল সিলাতুদ দায়ীফা ওয়াল মাউযুআ, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৯৯২)
৪৮	ইমাম আলী ইবনে উমার আদ দারে কুতনী	সুনান দারে কুতনী, (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩)
৪৯	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবু ইবনে সাদ	আত তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির, ২০১০)
৫০	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল	মুসনাদ, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১)
৫১	আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা	সহীহ ইবনে খুযাইমা, (মিসর : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ২০০৩)
৫২	হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী	ফাতহুল বারী, (মিশর : দারুল হাদীস, ১৯৯৮)
৫৩	আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাঈ	সুনান নাসায়ী, (মিশর : দারুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২০১১)
৫৪	ইমাম মালেক ইবনে আনাস	মুয়াত্তা মালেক, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৫)
৫৫	মুহাম্মদ ইবনে আবী শায়বাহ	আল-মুছান্নাফ, (রিয়াদ : মাকতাবাতু আর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.)
৫৬	শরফুল হক সিদ্দীকী আল আযীম আবাদী	আউনুল মাবুদ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
৫৭	আবু ইয়ালা আহমদ আল মুসিলী	আল-মুসনাদ, (দামেস্ক : দারুল মামূন লিততুরাস, ১৯৮৪)
৫৮	মুহাম্মদ ইবনে আলী আবু আব্দুল্লাহ আল হাকীম	নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল, (বৈরুত : দারুল মিল, ১৯৯২)
	আরবি ও উর্দূ গ্রন্থ	
৫৯	আল মুসতাশার হাসান আল হাফনাভী	মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম, (মিশর : দারুল বাশীর তা. বি)
৬০	আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ	আল মারআতু ফিল কুরআন, (মিশর : দারুল হিলাল, ১৯৭১)
৬১	মুহাম্মদ খায়রাত	মারকাযুল মারআতি ফিল ইসলাম, (মিশর : দারুল মাআরিফ, ১৯৭৫)
৬২	আল্লামা শাইখ নিযাম	আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯)
৬৩	তাওফীক আলী ওয়াহবা	হুকূকুল ইনসান বাইনাল ইসলাম ওয়ান নাযমিল আলমিয়্যাহ, (আল মাজলিসুল 'আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯২)
৬৪	আবদুল্লাহ আল বাস্সাম	তাইসীরুল আল্লাম শরহু উমদাতিল আহকাম, (মিশর : মাকতাবাতুত তাবেয়ীন, ১০ম প্রকাশ ২০০৬)
৬৫	ড. আহমদ ওমর হাশিম	আল ইসলামু ওয়া ইকরারুল আমনি, (মিশর : ইসলামী গবেষণা সংস্থা)
৬৬	ড. আমীন রাশেদ	দিফাউন আনিল ইসলাম দাফউ শুবুহাতিন ওয়া দাহদু মুফতারায়াতিন, (মিশর : দারুন নাহদা, ১৯৮৭)
৬৭	ইবনে কুতাইবা	ইয়ূনুল আখবার, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৯৬)
৬৮	আল্লামা ইবনে আবদুল বার	আল ইসতিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, (বৈরূত : দারুল জাইল, ২০১০)
৬৯	মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয যাহাবী	তাযকিরাতুল হুফফাজ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, ২০১০)
৭০	আহমদ ইবনে হাজার আল আসকালানী	আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১০)
৭১	আবু সুজা আদ-দায়লামী	আল-ফিরদাউস, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৮৬)
৭২	ইবনে আবদি রাব্বিহি	আল-ইকদুল ফরীদ, (মিশর : মাতবায়াতু লাজনাতিত তালীক, ১৯৬৫)
৭৩	আবদুল হাই আল হাম্বলী	শাজারাতুয যাহাব, (বৈরুত : আল মাকতাবাতুত তিজারী, তা. বি.)
৭৪	ইবনে হাজার আল আসকালানী	তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.)
৭৫	ইমাম নবুভী	তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, (মিশর : ইদারাতুত তারআতিল মুনীরিয়াহ, তা. বি.)
৭৬	ইবনুল হাজ্জ	আল মাদখাল, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.)
৭৭	ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া	ইলামুল মুয়াককিয়ীন, (কুর্দ : মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হি:)
৭৮	ইমাম বুখারী	আল আদাবুল মুফরাদ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৪)
৭৯	আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী	তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, (বৈরুত : দারুস সাওদায়েস, তা.বি.)
৮০	ইবনে হিশাম	আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ, (মিশর : দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৯০)
৮১	ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া	যাদুল মা'আদ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, তা. বি.)
৮২	আল্লামা ইবনুল আসীর	উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.)
৮৩	আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাল্লিকান বারসাকী	ওয়াফায়াতুল আইয়ান, (মিশর : আল মাতবাআতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি:)
৮৪	ফাতিমা রেজা মুনাসিরা	আসারু মুশকিলাতাইল ইখতিলাতি ওয়াল মিনহাজিত তালিমিয়্যিাহ আলা তালীমিল ফাতাতিল মুসলিমাতি ফিল জামিয়াতিল উরদুনিয়্যাহ, (মুলতাকা আহলিল হাদীস, নভেম্বর ২০১১)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
৮৫	শায়খ আহমদ মুহাম্মদ জামাল (র)	মাকানাকে তুহমাদী, (মিসর : দারু ইহয়াউল উলূম, জানুয়ারি ১৯৮৬)
৮৬	শায়খ আলী ত্বানত্বাভী	যিকরায়াত (সৌদি আরব : দারুল মানারাহ, ১৯৮২)
৮৭	মুহাম্মদ সাঈদ মাবিদ	ইলা গাইরিল মুহাজ্জাবাতি আওয়ালান, (রিয়াদ : মাকতাবুর রাইয়ান, ২০০০)
৮৮	ড. মুহাম্মদ ইবনে আলী আলবার	আমালুল মারআতি ফিল মীযান, (মিসর : দারুল হাদীস, ২০০৫)
৮৯	হাফেজ আবদুল আযীয আল মুনযেরী	আততারগীব ওয়াত তারহীব, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৪ হি.)
৯০	নোমান ইবনে আব্দুর রাজ্জাক	আন নিযামুস সিয়াসী ফিল ইসলাম, (মিশর : আল মাকতাবাতুল ওয়াকফিয়্যাহ, ২০১১)
৯১	ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শাউনিল ইসলামিয়্যাহ	আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, (কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩)
৯২	ইবনু কুতাইবা আদ দিনওয়ারী	উয়ূনুল আখবার, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮)
৯৩	ইবনে রুশদ আল হাফীদ	বিদায়াতুল মুজতাহিদ, (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৪)
৯৪	ড. ইমাম মুহাম্মদ উমারা ইয়াসীন	হারাকাতু তাহরীরিল মারআতি ফী মীযানিল ইসলাম, (রিয়াদ : দারুল কিবলাতাইন, ২০০৩)
৯৫	কাসেম আমিন	তাহরীরুল মারআহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৬)
৯৬	শায়খ আবদুল মুনসিফ মাহমুদ	দাহয়ু শুবহাতিন ওয়ামুফতারায়াতি হাওলাল ইসলাম, (মিশর : মাজমাউ বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ)
৯৭	অধ্যাপক আদেল আহমদ মারকেস	আযযাওয়াজু ওয়া তাতাওয়ারুল মুজতামায়ি, (মিশর : দারুল কিতাবিল আল আরাবী তা.বি.)
৯৮	আবদুন নাসের আল আত্তার	তাআদ্দুদিয যাওজাত, (মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ)
৯৯	ড. মুস্তফা আস সিবাঈ	আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন। (মিশর : দারুল ইসলাম, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০)
১০০	মুহাম্মদ আতিয়্যাহ আল ইবরাশ	আযমাতুর রাসূল (স)। (মিশর : দারুস সালাম, ১৯৮৮)
১০১	শাইখ মুহাম্মদ আল আবাসিরী খলীফা	আল মারআতু ওয়াত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়াহ (কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮৪)
১০২	ড. তাওফীক আল আত্তার	তায়াদ্দুদিয যাওজাত মিনান নাওয়াহী আদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল ইজতিমাইয়্যাহ ওয়াল কানূনিয়্যাহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ, ১৯৮৫)
১০৩	শেখ মোহাম্মদ আবু যোহরা	আল উসরাহ ওয়াতানযীমুল নছল (বৈরূত : দারুল ফিকর আল আরাবী, ১৯৮৫)
১০৪	মুহাম্মদ শালাবী	মাআ রাঈদিল ফিকরিল ইসলামী (মিশর : দারুল ওহী, ১৯৮২)
১০৫	ড. আবদুন নাসের তাওফীক আল আত্তার	আল উসরাতু ওয়াকানূনুল আহওয়ালিশ শাখছিয়্যাহ, (মিশর : আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাতুল হাদীসাহ, ১৯৮৫)
১০৬	সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রেজা	হুকূকুন নিসা ফিল ইসলাম, (মিশর : মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী, ১৯৭৮)
১০৭	ড. আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফী	আল উসরাতু ওয়াল মুজতামাউ। (মিশর : দারু নাহদা অষ্টম প্রকাশ, ১৯৮৩)
১০৮	মাহমুদ মুহাম্মদ আল জাওহারী ও মুহাম্মদ আবদুল হাকীম	আল আখাওয়াতুল মুসলিমাতু ওয়াবিনাউল উসরাতিল কানূনিয়্যাহ। (মিশর : দারুদ দাওয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০)
১০৯	ইমাম আবুল হোসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বাগদাদী আল কুদূরী	মুখতাসারুল কুদূরী, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
১১০	মুহাম্মদ ইবনু রিয়াদ	আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, (বৈরূত : আলামুল কুতুব, ২০০৩)
১১১	মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর আদ দিমাশ্কী	রাদ্দুল মুহতার, (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৫)
১১২	মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সারাখসী	আল মাবসূত, (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৯৯৩)
১১৩	শামসুদ্দীন আর রামালী	নিহায়াতুল মুহতাজ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৪)
১১৪	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আশ শারবীনী	মুগনিউল মুহতাজ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪)
১১৫	আল ইমাম আলা উদ্দীন আবু বকর আল কাসানী	বাদাইউস সানাইউ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০১০)
১১৬	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ	আল-হত্তাব, মাওয়াহিবুল জালীল, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯২)
১১৭	মুওয়াফফেকুদ্দীন ইবনে কুদামাহ	আল-মুগনী, (মিশর : মাকতাবাতুল কাহিরা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮)
১১৮	ফতওয়া বোর্ড	ফাতওয়া, (রিয়াদ : আল-লাজনাতুত দাইমা লিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪২২ হি.)
১১৯	আশরাফ আলী থানবী	বেহেশতী জেওর, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৫)
১২০	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী	জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, (মিশর : দারুস সালাম তৃতীয় প্রকাশ, ২০০২)
২২১	আবু জাফর মুহাম্মদ আল উকায়লী	আদ-দুয়াফাউল কাবীর, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪)
১২২	মুহাম্মদ রাওয়াস কালআ জী	ফিকহু উমার (রা) (মিশর : দারুন নাফায়েস, ১৯৮৯)
১২৩	মুহাম্মদ ইবনু মুফলিহ	আল-ফুরূ, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩)
১২৪	আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন আন নবুভী	আল-মাজমু, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০১০)
১২৫	আলা উদ্দীন আলী আল মুত্তাকী আল হিন্দী	কানযুল উম্মাল, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৯৮১)
১২৬	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সানআনী কাহলানী	সুবুলুস সালাম, (মিশর : মাতবাআতু মুসতাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হি.)
১২৭	শামসুদ্দীন আয যাহাবী	মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১২৮	ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী	সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২৯	আবু উসমান আমর ইবনুল বাহর আল জাহি	আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরুত, দারুল ফিকর, তা. বি)
১৩০	আবুল ফিদা হাফেজ ইবনে কাসীর	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত : মাকতাবুল মা'আরিফ, ১৯৭৭)
১৩১	আল্লামা ইবনুল আসীর	আত তারীখুল কামিল, (বৈরুত : দারু ইহইয়াতু তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৪)
১৩২	মুহাম্মদ ইজ্জাহ দারুজা	আল মারআতু ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, (বৈরূত : আল মাকতাবাতুল ফিকরিয়্যাহ ১৯৮০)
	বাংলা গ্রন্থ	
১৩৩	ড. মাহবুবা রহমান	কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০)
১৩৪	সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমর	ইসলামী সমাজে নারী, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৮)
১৩৫	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা	নারীর অধিকার ও মর্যাদা, (ঢাকা : আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫)
১৩৬	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)
১৩৭	মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী	মহানবী (স)-এর পরিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, (ঢাকা : ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
১৩৮	আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী	ইসলাম আওর আওরাত, (লাহোর : ইদারায়ে ইসলামিয়া তা. বি.)
১৩৯	আবদুল খালেক	নারী, (ঢাকা : দ্বীনী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯)
১৪০	ড. আশ শাইখ মুসতাফা আস্ সিবায়ী	আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন, অনুবাদ : আকরাম ফারুক, ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮)
১৪১	গাজী শামছুর রহমান	হিন্দু আইনের ভাষ্য, (ঢাকা : পল্লব পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, মার্চ, ১৯৮৯)
১৪২	মাওলানা ইসহাক ওবায়দী	যুগে যুগে নারী, (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬)
১৪৩	মুফতী আবদুল্লাহ ফারুক	ইসলামে রমণীর মান, (যশোর : আল ফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮)
১৪৪	আল্লামা মালিক রাম	আওরাত আওর ইসলামী তা'লীম, অনুবাদ : মাহমূদা বেগম নেকু, নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)
১৪৫	মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, (ঢাকা : আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫)
১৪৬	আল্লামা শিবলী নোমানী	সীরাতুন নবী, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৫)
১৪৭	মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	নারী, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪)
১৪৮	মাহবুবা বেগম	নারীর ভূষণ (ঢাকা : আল-কুরআন গবেষণা সেন্টার, জুলাই, ১৯৯৯)
১৪৯	শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই	নারী অধিকার, (ঢাকা : মাহবুব প্রকাশনী, জানুয়ারী, ২০০০)
১৫০	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	হাদীস শরীফ, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)
১৫১	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	আখলাকে ইসলাম, (ঢাকা : পুস্তক ঘর, ১৯৬৭)
১৫২	মাওলানা এ. কে এম. সিরাজুল ইসলাম	ইসলামের নারী ও মানবাধিকার, (ঢাকা : মা প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯১।
১৫৩	মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী	উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ব, (ঢাকা : আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.)
১৫৪	নিয়ায ফতেহপুরী	আস সাহাবীয়াত, অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মহিলা সাহাবী, (ঢাকা : আল ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫)
১৫৫	মাওলানা সাঈদ আনসারী ও মাওলানা আবদুস সালাম নদভী	হায়াতুস সাহাবীয়াত, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল ওয়াহাব, মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ, (ঢাকা : নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, চকবাজার, তা. বি.)
১৫৬	আব্দুল হালীম আবু শুককাহ	তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ, অনুদিত (ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৫)
১৫৭	মোসাম্মত কবিতা সুলতানা	ধন্য আমি নারী, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫)
১৫৮	শিকদার আবুল বাশার	আপটুডেট সাইন্স নলেজ কুইজ, (ঢাকা : অনুভব প্রকাশনী, জুলাই, ১৯৯৫)
১৫৯	মো: কামরুজ্জামান শিবলী	ইসলাম ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর কর্মক্ষেত্রে, (চট্টগ্রাম : মাসিক মঈনুল ইসলাম, সংখ্যা ১২, মে, ২০১৭)
১৬০	মুহাম্মদ জামালুদ্দীন	মুসলিম নারীর পোষাক ও কর্ম, (ঢাকা : এশা রাহনুমা সাইন্স ল্যাবরেটারী, ১৯৯৮)
১৬১	অ্যাডভোকেট সাঈদুল হক সাঈদ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (ঢাকা : হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটি, সেপ্টেম্বর, ২০০৯)।
১৬২	ওয়েস্টার মার্ক	কিসসাতুয যিওয়াজ, অনুবাদ : আবদুল মুনয়িম আয যিয়াদী, (মিশর : ১৯৭৯)
১৬৩	মাওলানা আশরাফ আলী থানবী	ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম, (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০)
১৬৪	আবুল হাসান আলী আল হায়সামী	মাজমাউয যাওয়াইদ, (মিশর : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৯৯৪)

ক্রম.	লেখকের নাম	গ্রন্থ ও প্রকাশক
১৬৫	মাওলানা মুফতী রূহুল আমীন যশোরী	নারী জন্মের আনন্দ, (ঢাকা : আল হিদায়াত ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮)
১৬৬	অনুবাদ : আবদুল কাদির	হুসনে মুআশারাত, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫)
১৬৭	মাওলানা মুহাম্মদ তাহের	রমণীর মান, (ঢাকা : আল কাউছার প্রকাশনী, তা. বি.)
১৬৮	আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী	আররাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ : খাদিজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন : ১৯ বেকটিড রোড, ফরেষ্ট গেইট, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯)
	ইংরেজি গ্রন্থ	
১৬৯	Deborah E. Sawyer,	Women and Religion in the First Christian Centuries, (New York : Routledge Publishing Company, 1996)
১৭০	Prof. Sukumari Bhattacharya,	Women and Society in Ancient India, (Kolkata : Basumati Corporation Ltd, 1994)
১৭১	Banarjee, Dr. Manabendu,	(eds.) Manu samhita, 1st Edition, (Kolkata : Swadesh Publishing Ltd. 2004),
১৭২	Sukumari Bhattacharya	Women and Society in Ancient India. (Basumati corporation, 1994)
১৭৩	A.S. Altekar.	The Position of women in Hindu Civilization. (Motilal Banarsidass Publishars Pvt. Ltd, 1959)
১৭৪	As of 2008, Named Countributors	The Encyclopedia Britannica, 11th ed. 1911, Vol, 28,
১৭৫	In Mace, David and Vera,	Marriage : East and West, Dolphin Books, Double day and Co. Inc. N. Y, 1960
১৭৬	Mcguire,	Meredith B Religion the Social Context, (Wadsworth Publishing Company, 1997)
১৭৭	Nazhat Afza and Khurshid Ahmaed.	The position of Women in Islam. (Kuwait : Aslamic Book publishers, 1982)
১৭৮	Masumeh Raghibi Byat,	Women Victim or Victor, Dhaka : A B. Publications, 1995.
১৭৯	Maulana Muhammad Ali,	The Religion of Islam, Lahore : The Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam, 1950
১৮০	Allama Abdullah Yusuf Ali,	The Holy Quran, U.S.A : Amanf Corp, 1983.
১৮১	Zakia A. Siddiquee and Anwar Jahan Juberi,	Muslim Women, New Delhi : M. D. Publication, 1993.
১৮২	Abul Hamudah,	The Family Structure of Islam, India : American Trust Publications, 1977
১৮৩	Tanzilur Rahman,	A Code of Muslim Personal Law, Karachi : Hamdard Academy, 1978
১৮৪	Asaf A. A. Fayezi,	Outlines of Muhammadan Law, Second Edition, London : Oxford University Press, 1955
১৮৫	Jamal A. Badwi,	Woman in Islam, (London : Islamic Council of Europe, 1976)
১৮৬	Arthur Zefri,	The Family in Islam, (New York : Harfar and Row, 1959),
১৮৭	Muhammad Shabbir Khan,	Status of Woman in Islam, New Delhi : A. P. H. Publishing Corporation, 1996
১৮৮	Maulana Muhammad Ali,	The Religion of Islam, Lahore : The Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam, 1950.